॥ মহাজীবন ॥

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর সেবক-শিষ্য
স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের জীবন কথা

শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
রেলস্টেশন ও গ্রাম : বেলানগর
পোঃ অভয়নগর
জিলা : হাওড়া

প্রথম প্রকাশ :—

১লা মাঘ, ১৩৭২ সাল।

প্রকাশক :—
শ্রীরঞ্জিৎ রায় চৌধুরী
শ্রীহরিপদ সাহা
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বেলানগর
পোঃ—অভয়নগর—হাওড়া।

মুদ্রক :—
শ্রীবীরেন্দ্রমোহন বসাক
শ্রীদুর্গা প্রিন্টিং হাউস
১০, ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

ছবি মুদ্রক :—
শ্রীনিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
মোহন প্রেস
২, ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট মুদ্রক :—
শ্রীহরিপদ সাহা
কলোপ্রিন্ট
৯৫, বৈঠকখানা রোড, কলি ৯

ব্লক :—
শ্রীসুশীল সরকার
এস্ বি এ্যাণ্ড কো'
৭এ, এস্প্লানেড ইস্ট, কলিকাতা-১

প্রচ্ছদপট অঙ্কন :
চিত্রকুমার
১২ বি, গড়পার রোড
কলিকাতা ৯

বাঁধিয়েছেন :—
শ্রীনীরেন্দ্র নারায়ণ সাহা
এন, এস, বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৮০।২, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯

কাগজ সরবরাহক :—
মেসার্স বসকো
৫৭, সূর্যসেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

আমাব পবমাবাধ্য পবমগুরু শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহাবাজজীর শ্রীপাদপদ্মে তাঁহাবই হাতে গড়া পবম স্নেহেব যোগ্য শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীব—

'মহাজীবন"

পবম ভক্তিভবে উৎসর্গ কবিলাম। ইতি—

কৃপাভিক্ষু

শ্রীভুপতিমোহন মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

আমি মহারাজের (স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের) মন্ত্রশিষ্য নই, আমি তাঁর মন্ত্রমুগ্ধ সন্তান। আমি তাঁকে 'প্রকৃত মানুষ' ব'লে জেনেছি,—জেনেছি তাঁর অপূর্ব শক্তির কথা।

আমি রাজনীতি করি, রাজনীতি ভালোবাসি, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন, অনলস কর্মধারা, মায়ের মত স্নেহ, পিতার মত কর্তব্যপরায়ণতা এবং ছোট-বড় প্রত্যেকের সঙ্গে অভেদ আচরণ, দয়া, ত্যাগ,—এমনটি আমি আর দেখিনি। দিনের পর দিন এই আনন্দময় মহান্ পুরুষটির সঙ্গলাভ, কাযকলাপ কেউ নিরীক্ষণ না করলে আপনারা বুঝতে পারবেন না যে একটি দেহধারী মানুষের পক্ষে কি করে এ সম্ভব হয়। কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গ লাভ করবার সৌভাগ্য করেছি।—আমি দেখেছি তাঁর মধ্যে প্রকৃত মহামানবের রূপ। বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েছি। এই স্বর্গীয় স্বভাবযুক্ত মহামানবের অপূর্ব কর্মধারার অজস্র বর্ণনা দেওয়া অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব নয়। তাঁর স্মৃতিশক্তি ও জ্ঞানের কথা আলোচনা করতে গেলে একটি বিরাট মহাভারত কথামালার রচনা হবে। এই মহামানবটির গুণ, অলৌকিক শক্তি ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার তুলনা হয় না। আমি রাজনীতিক্ষেত্রে অনেক মানুষ দেখেছি,—অনেকের সাথে মিশেছি, কিন্তু এই সরল শিশুটির মত এই মানুষটির অক্লান্ত মানবসেবা আর দেখিনি। আজ স্বামী বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ে,—"জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" মহারাজের (স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের) মধ্যে এই গুণটি বর্তমান।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী মেজর জেনারেল শাহ্ নাওয়াজ খান্ কিছুদিন পূর্বে হরিদ্বারের নিকট আইথালে উদ্বাস্তুদের জন্য একটি হিন্দু মন্দির নির্মাণ করেছেন। ঐ মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন সম্পর্কে তিনি আমাকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমি আমার মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন ভারতের দু'জন শ্রেষ্ঠ মানুষের দ্বারা করাতে চাই। এঁদের মধ্যে একজনের নাম আমি জানি, তিনি স্বর্গতা শ্রদ্ধেয়া বেলা বহিনের শ্রীশ্রীগুরুদেব স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ পুরী মহারাজ। আর একজনের নাম অনেক ভেবেও আমি খুঁজে পাই নি এখনও। সমস্ত

মানুষের মধ্যে "মানুষ",—"শ্রেষ্ঠ মানুষ" স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের পর আর একজনের কথা যদি তোমার জানা থাকে, আমায় জানিও।"

আমিও অনেক ভেবে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর পাশে "শ্রেষ্ঠ মানুষ" হিসাবে দাঁড়াতে পারেন, এমন একজনের কথা সেদিন মনে করতে পারিনি।

আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজের একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনকাহিনী রচনা করেছেন দেখে আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি। আরও শুনেছি যে, মহারাজজী স্বয়ং এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করে মুদ্রণের অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং গ্রন্থখানি সম্পর্কে এ কথা বিশেষ জোরের সঙ্গে বলা যেতে পারে যে, এতে যা বর্ণিত হয়েছে তার একবিন্দু মিথ্যা নয়!

জগতের মহাপুরুষদের মহাজীবনের একটা বিরাট অংশ থাকে অলিখিত,—লোকচক্ষুর অন্তরালে সংগুপ্ত। গ্রন্থখানির লেখক স্নেহাস্পদ শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায় বিশেষ নিষ্ঠাসহকারে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের জীবনের বহু অপ্রকাশিত ঘটনা আজ লোকসমক্ষে প্রকাশ করায়, সমাজের এক মহাকল্যাণ করলেন বলে আমি মনে করি।

পুস্তকখানির ভাষা সুখপাঠ্য ও সাবলীল। আমি এর বহুল প্রচার কামনা করি।

জয়, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী কি জয়! ইতি—

শ্রীহরিদাস মিত্র
১৪, আশু বিশ্বাস রোড
ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫

গ্রন্থকারের নিবেদন

পিতা-পিতামহের ঐশ্বর্য এবং গৌরবের কথা কাহার না জানিতে আগ্রহ হয়? এই আগ্রহাতিশয্যেই, শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয়ে স্থানলাভের পর তাঁহার সাধক জীবনের কথা জানিবার জন্য তাঁহাকে এবং পরমারাধ্যা ঠাকুমাকে (শ্রীশ্রীগুরুদেবের জননী, পরম শ্রদ্ধেয়া দক্ষিণাকালী দেবী) মধ্যে মধ্যে নানা-প্রকার প্রশ্ন করিতাম। তাঁহারাও সস্নেহে আমার মনোভিলাষ পূর্ণ করিতেন। এই প্রকারে শ্রীশ্রীগুরুদেবের মহাজীবনেব অনেক ঘটনা আমার জ্ঞানগোচর হয় এবং ক্রমে ক্রমে পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীগুরুদেবেব একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনকাহিনী রচনা করিবার আকাঙ্ক্ষা আমাব মনে জন্মে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীগুরুদেবকে একদিন আমি আমার এই ইচ্ছার কথা প্রকাশ করি। প্রথমে তিনি এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। আমিও নাছোড়বান্দা। পরিচিত, অপবিচিত শত শত গুরুভ্রাতাভগ্নীদের পক্ষ হইতে আমি তাঁহার নিকট বারংবার আব্দার কবিতে থাকি। পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীগুরুদেব শেষপর্যন্ত আমাকে এই কাযে সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন।

পরমারাধ্যা ঠাকুমা তখন লোকান্তরিতা। শ্রীশ্রীগুরুদেবের শৈশবকালের বহু ঘটনা তাঁহার নিকট শুনিলেও ঘটনাগুলির ধারাবাহিকতা সম্পর্কে আমার কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তখন পরমশ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা পিসিমাতার (শ্রীশ্রীগুরুদেবের ভগ্নী, কণকলতা দেবী) শরণাপন্ন হইলাম। শ্রীশ্রীগুরুদেবের বংশ-পবিচয় এবং তাঁহার শৈশবকালেব ঘটনাবলী তিনি আমাকে ধারাবাহিক-ভাবে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীশ্রীগুরুদেবও আমাকে তাঁহার ব্যক্তিগত ডায়েরি, চিঠিপত্র প্রভৃতি দেখিতে দিয়া এবং তাঁহার জীবনের বিভিন্ন কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করিয়া আমার কার্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন।

"মহাজীবন" লিখিতে বসিয়া দেখিলাম, উহা যত সহজ মনে করিয়াছিলাম তত সহজ নহে,—বিশেষতঃ আমার ন্যায় জ্ঞানবিচারহীন ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে। দেখিয়াছি জীবনী লিখিতে যাইয়া অনেকে শিব গড়িতে বাঁদর গড়েন, আবার অনেকে বাঁদরের গলায় মুক্তাহার পরাইয়া দেন। আমারও প্রতি পদে ভয় হইতে লাগিল, পাছে আমি অজ্ঞানতাবশতঃ শ্রীশ্রীগুরুদেবকে বিকৃতভাবে অঙ্কিত করি! এইজন্য আমি তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যখন যাহা শুনিতাম, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পাঠ করিয়া শুনাইতাম। তিনিও কৃপা করিয়া প্রয়োজনবোধে উহা স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিতেন। তথাপি আমার মনে হয়, তাঁহার

ন্যায় ভক্তিমান কর্মযোগী বিরাট পুরুষকে আমি যথাযথরূপে অঙ্কন করিতে পারি নাই,—আমার অজ্ঞানতা ও অক্ষমতার জন্য তাঁহাকে আমি খর্বই করিয়া ফেলিয়াছি। এইজন্য আমি অসীম কৃপাময় শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট পুনঃ পুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করি।

যাহা হউক, বৎসরাধিককালের পরিশ্রমে পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ হইল। ঠাকুমা, পিসিমা এবং সর্বোপরি শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট এই বিষয়ে আমার ঋণ অপরিসীম,—অপরিশোধনীয়। আমার বিভিন্ন গুরুভ্রাতা এবং গুরুভগ্নী, বিশেষতঃ ব্রহ্মচারী স্বরূপচৈতন্য ও ব্রহ্মচারিণী স্বতপাদিদি আমাকে পাণ্ডুলিপি রচনায় নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের সমবেত সাহায্য ব্যতীত আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে ইহা সম্পন্ন হইতে আরও বিলম্ব হইত,—আদৌ সম্পন্ন হইত কিনা তাহাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

সর্বশেষে গুরুভ্রাতা শ্রীযুত রণজিৎ রায় চৌধুরী এবং শ্রীহরিপদ সাহা পুস্তকখানির মুদ্রনকার্যের যাবতীয় দায়িত্বভার তাঁহাদের স্কন্ধে বহন করাতেই পুস্তকখানি যথাসময়ে প্রকাশিত হইতে পারিল। ইঁহাদের সকলের নিকট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমি আমার অশেষ ঋণের কথা স্বীকার করিতেছি।

আজ এই পরম শুভক্ষণে পরমারাধ্যা ঠাকুমার কথাই বারংবার আমার মনে পড়িতেছে। এই পুস্তকখানি দেখিলে তাঁহার আজ কত আহ্লাদই না হইত। তাঁহার বিদেহ আত্মা আজ শ্রীরামকৃষ্ণলোক হইতে আমাদের এই মহাদুর্দিনে আমাদিগকে আশীর্বাদ করুণ, ইহাই সতত প্রার্থনা করি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থখানি পাঠে যদি কেহ কিঞ্চিৎ উপকৃত হইয়া থাকেন তবেই আমি আমার সকল শ্রম সার্থক মনে করিব। শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ, জগজ্জননী সারদামণি এবং পরম গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর মঙ্গল আশীর্বাদ সকলের শিরে বর্ষিত হউক, ইহাই সর্বান্তঃকরণে সতত প্রার্থনা। জয় গুরুদেব। জয় রামকৃষ্ণ।

প্রকাশকের নিবেদন

ভূপতিদা (আলোচ্য গ্রন্থের লেখক শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়) আকস্মিকভাবে হুগলীর আরামবাগ মহকুমায় চন্দ্রবান উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্য গ্রহণপূর্বক কলিকাতা ত্যাগ করায় "মহাজীবন" গ্রন্থখানির প্রকাশনার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে আমাদের স্কন্ধে পতিত হয়। শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় পুস্তকখানি তাঁহারই জন্মদিনে প্রকাশ করিতে পারায় আমরা বিশেষ আনন্দ বোধ করিতেছি। অত্যল্প সময়ের মধ্যে এই বৃহৎ পুস্তক প্রকাশনে আমাদের কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়াছে,- ইহা অনস্বীকার্য। বিশেষতঃ গ্রন্থমধ্যে কয়েকটি মুদ্রণদোষও রহিয়াছে।

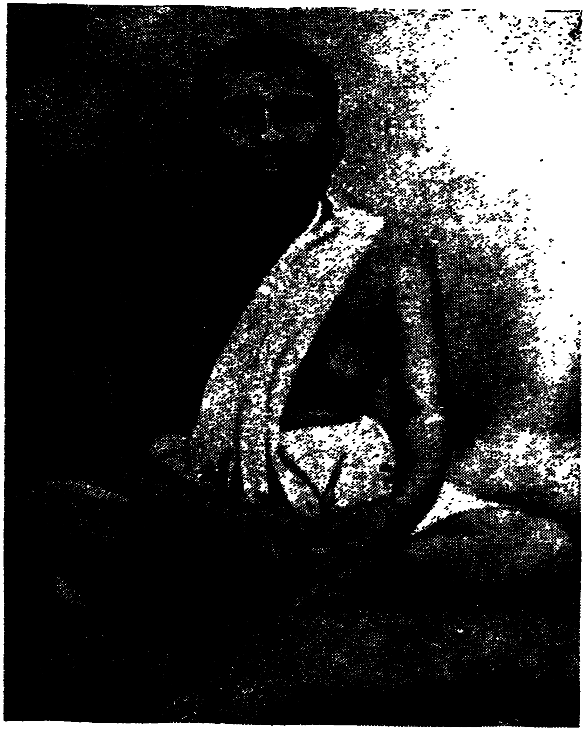
আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেবের অসীম কৃপায়, তাঁহার সন্তান আমরা, সকলেই সাংসারিক জীবনে শান্তিলাভ করিয়াছি। এক্ষণে যাহারা এই মহাপুরুষের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে আসিতে পারিতেছেন না, তাহারা ইঁহার "মহাজীবন" পাঠে যদি কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করেন, সেই উদ্দেশ্যেই গ্রন্থখানি প্রকাশ করা হইল। একজন পাঠকও যদি এই গ্রন্থপাঠে কথঞ্চিৎ আনন্দ ও শান্তি লাভ করেন, তবেই আমাদের সকল শ্রম সার্থক মনে করিব।

আশা করি সহৃদয় পাঠক পুস্তকখানির ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

পরিশেষে গ্রন্থখানি প্রকাশনায় শ্রীদুর্গা প্রিন্টিং হাউসের মালিক শ্রীবীরেন্দ্র মোহন বসাক ও তাহার কর্মচারীবৃন্দ, মোহন প্রেসের মালিক শ্রীনিরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় ও কর্মচারীবৃন্দ, এস্ বি এণ্ড কোম্পানীর মালিক শ্রীসুশীল সরকার ও কর্মচারীবৃন্দ এবং এন, এস্, বাইণ্ডিং ওয়ার্কস-এর মালিক শ্রীনীরেন্দ্রনারায়ণ সাহা ও কর্মচারীবৃন্দ যে প্রকারে আমাদের সহিত সহযোগিতা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

সকলের শিরে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাশীর্বাদ বর্ষিত হউক,—ইহাই একান্ত প্রার্থনা। ইতি—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম	বিনীত
বেলানগর	শ্রীরণজিৎ রায়চৌধুরী
পোঃ অভয়নগর, জিঃ হাওড়া	শ্রীহরিপদ সাহা



ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।



শ্রীশ্রীসারদা দেবী।



ভগবান শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব (গান্ধর্ব-শিল্প)



পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ।



পবিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ।



প্রণামরত

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ।

(লণ্ডনে)



পিতা শ্রীসীতানাথ বস



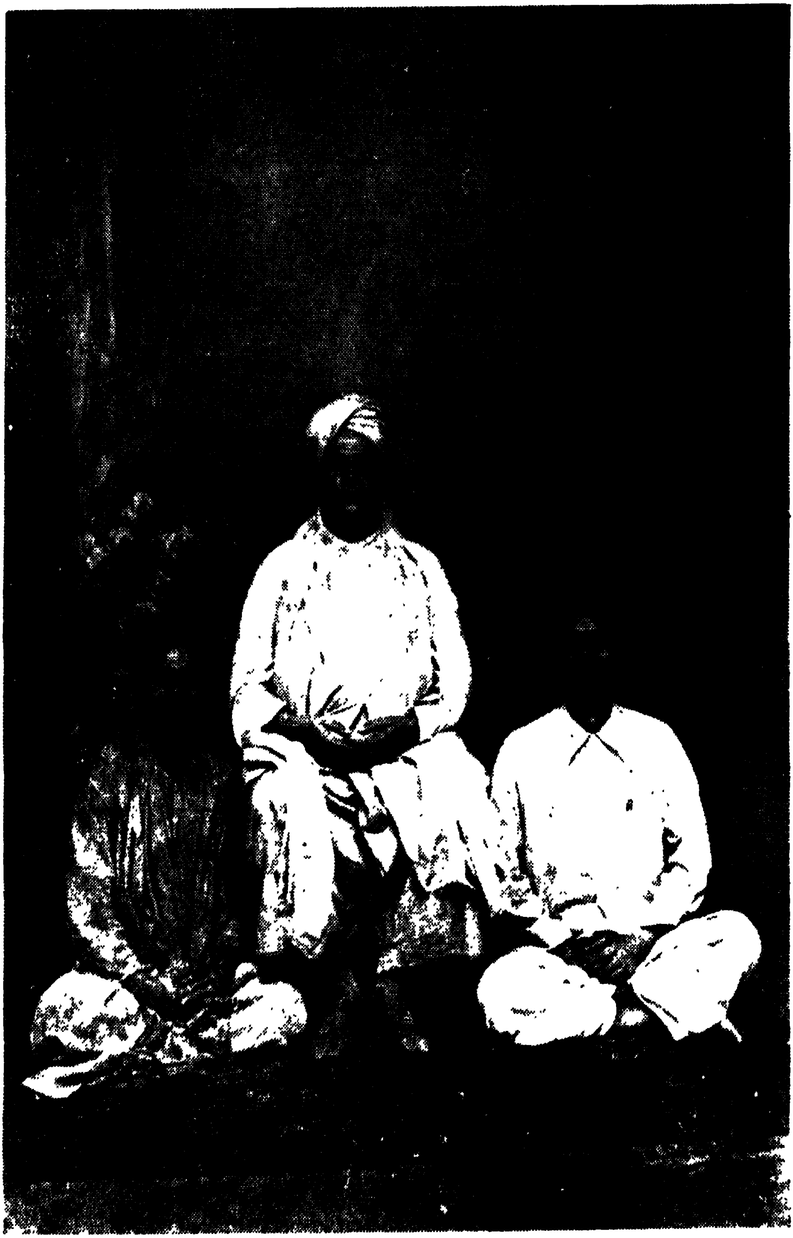
জননী শ্রীযুক্তা দক্ষিণাকালী দেবী



দার্জিলিং শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে ইটালির কন্‌সাল জেনারেল ও ভক্তবৃন্দের সহিত
শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ



দার্জিলিং—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে ব্রেজিল-এর কনসাল জেনারেল ও ভক্তবৃন্দের সহিত
শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ



শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের সহিত
শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত ও শিষ্য।



শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে দুর্গাপূজারত



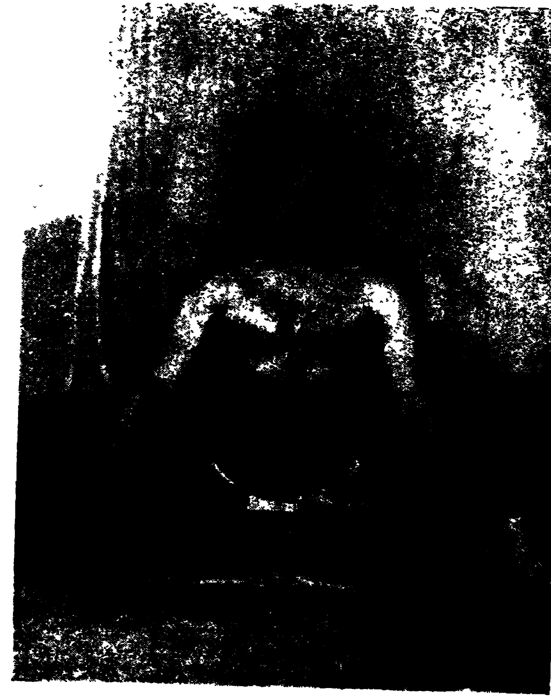
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে ভগিনী সাবিত্রী কর্তৃক গৃহীত চিত্র



বেদান্তমঠে সেবকশিষ্য



যোগাসনে



স্বস্তিক আসনে (ত্রাটক)



বর্দ্ধমানে



বেলানগব আশ্রমে



হরিদ্বারে



কন্যাকুমারিকায় বিবেকানন্দ শিলায় বিবেকানন্দ মন্দিরে



জামসেদপুরে



দুর্গাপুরে

১

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "গুরু কে?"

পরমহংসদেব তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "গুরু হচ্ছেন ঘটক। ভক্ত-ভগবানের মিলন ঘটিয়ে দেন।"

ব্রহ্মের যে সকল শক্তি এই বিশ্বজগৎকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তন্মধ্যে গুরুশক্তি অন্যতম। ধর্মগ্লানি উপস্থিত হইলে ভগবান যখন এই মর্ত্যভূমিতে অবতাররূপে অবতীর্ণ হন তখন তাঁহার মধ্যে গুরুশক্তিও কার্য করে। অবতারের এই গুরুশক্তি কালক্রমে তাঁহার সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহার ধর্মসংস্থাপনের কার্যে সহায়তা করিয়া থাকে।

অবতারশ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কার্যে সহায়তার জন্য তাঁহার লীলাসহচর এবং পার্ষদবর্গ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার লীলাবসানের পরে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী, শ্রীশ্রীগৌরী মা প্রভৃতির মধ্যে এই গুরুশক্তিই বিকশিত হইয়া পরমহংসদেবের আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করিতে লাগিল। কালক্রমে ইঁহারাও নিত্যধামে গমন করিলেন। ইঁহাদের গুরুশক্তি তখন ইঁহাদের সন্তানগণের মধ্যে সঞ্চারিত হইল।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের গুরুশক্তি যাঁহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইল, তাঁহাদের অন্যতম হইতেছেন আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব

শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজ। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীতে ইনি রবি মহারাজ নামে বিশেষ পরিচিত এবং সুপ্রসিদ্ধ। বর্তমান পুস্তকখানিতে এই মহাপুরুষের মানবলীলার কাহিনীই অতি সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জিলায় ভাঙ্গা থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম হইতেছে পুটিয়া। এই পুটিয়া গ্রামেই ১৩১২ সালের (ইং ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দ) ১লা মাঘ, রবিবার মহেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কন্যা দক্ষিণা-কালীর গর্ভে তাঁহার এক দৌহিত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। রবিবার দিবস রবির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, এইজন্য শিশুর নামকরণ হইল "রবি"। জাতকের রাশ্যাশ্রিত নাম রাখা হইল "মণীন্দ্রনাথ"।

রবির জন্ম হইয়াছিল তাহার মাতুলালয়ে। মাতামহ মহেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় কার্যোপলক্ষে কলিকাতা অবস্থান করিতেন। কলিকাতায় বড়বাজার অঞ্চলে তাঁহার বোর্ডিং ছিল। ব্যবসায়ী হইলেও মহেশচন্দ্র অতিশয় ধর্মপ্রাণ ছিলেন। প্রত্যহ কিছু সময় তিনি নিয়মিতভাবে ধ্যানজপে মগ্ন থাকিতেন। দানে তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত, অতিথিসেবা ছিল তাঁহার নিত্যব্রত।

মহেশচন্দ্র দেশের বাড়ীতে (ফরিদপুরের পুটিয়া গ্রামে) প্রতি-বৎসর দুর্গোৎসব করিতেন। এতদুপলক্ষে শরৎকালে শারদীয়া পূজার পূর্বে কর্মস্থল কলিকাতা হইতে তিনি সপরিবারে দেশে যাইতেন। সেই সময় মহামায়ার পূজার জন্য বড় বড় দুই জালা গঙ্গাজলও তিনি তাঁহার সঙ্গে লইয়া যাইতেন। দুর্গাপূজা উপলক্ষে সমস্ত গ্রামবাসীকে তিনি পনের কুড়ি দিন পর্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষ সহকারে খাওয়াইতেন।

রবির পিতামহের নাম নন্দকুমার বসু। নন্দকুমারের পৈতৃক নিবাস ছিল ফরিদপুর জিলারই ছাগলদি গ্রামে। নন্দকুমার ছিলেন অত্যন্ত সরল এবং অমায়িক। তিনি সামান্য লেখাপড়া জানিলেও

কৃত্তিবাসের সমগ্র রামায়ণখানি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। নন্দকুমার দেশেই থাকিতেন। দেশে তাঁহার জমিজমা ছিল।

নন্দকুমারের দুই পুত্র এবং এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ-পুত্রের নাম সীতানাথ বসু এবং কনিষ্ঠ পুত্রের নাম পূর্ণচন্দ্র বসু। সীতানাথ কলিকাতায় ন্যাড়া গির্জার বাজারে তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা কৈলাসচন্দ্র বসুর চাউলের কারবারে কাজ করিতেন। দেশের সহিত সীতানাথের যোগাযোগ ছিল না। তিনি স্বপ্নে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। সেনহাটি গোয়ালপাড়ার সাধক প্রহ্লাদ গোস্বামী মহাশয় সীতানাথের গুরু ছিলেন। এই মহাসাধক মৃত্যুর পূর্বে এক বৎসরকাল কেবলমাত্র বেলপাতার রস ছাড়া অন্য কোন আহার্য গ্রহণ করেন নাই।

সীতানাথ প্রত্যহ নিয়মিতভাবে নিষ্ঠার সহিত সন্ধ্যাপূজা করিতেন। গীতাচণ্ডী ছিল তাঁহার নিত্য-পাঠ্য গ্রন্থ। অবসর সময়ে তিনি ধর্মালোচনায় মগ্ন থাকিতেন। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন। গেরুয়া ধারণপূর্বক সংসার ত্যাগ না করিলেও সীতানাথ ছিলেন সন্ন্যাসীর মতই উদাসীন। সংসারে তাঁহার কিছুমাত্র আসক্তি ছিল না।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা শুনিয়া সীতানাথ একবার তাঁহাকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বর গিয়াছিলেন। জহুরীর জহর চিনিতে বিলম্ব হয় না। পরমহংসদেব সীতানাথকে একপলক দেখিয়াই তাঁহার স্বরূপটি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সীতানাথকে উপদেশ দিলেন, "জরৎকার মুনির কাহিনী জান? সেই জরৎকার মুনির মতই সংসারে থাকবে। সংসারে থেকেই ধর্মকর্ম করবে।"

পরমহংসদেবের এই উপদেশ অনুসারে সীতানাথ সংসারে থাকিয়াও ঋষির ন্যায় জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল।

কলিকাতার চিকিৎসক ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষ সীতানাথকে শেষ জীবনে চিকিৎসা করিতেন। মুমূর্ষু সীতানাথকে তিনি বলিতেন, "আপনার আবার ভয় কি? পরমপুরুষ পরমহংসদেবকে আপনি দর্শন করেছেন।"

সীতানাথও মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, দক্ষিণেশ্বরে পতিতপাবন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিয়া তাঁহাব মানবজীবন ধন্য হইয়াছে।

এই সীতানাথের সহিতই মহেশচন্দ্র মিত্রের কন্যা দক্ষিণাকালীর বিবাহ হইয়াছিল।

পবমহংসদেব বলিতেন, "এক হাত ভগবানে রেখে আরেক হাতে সংসার করবে।" দক্ষিণাকালীর জীবনে এই বাণী সর্বতোভাবে রূপায়িত হইয়াছিল। তিনি ছিলেন অতীব ধর্মশীলা। সন্ধ্যাপূজা এবং মালাজপ না করিয়া তিনি কোন দিন জল গ্রহণ করিতেন না। যৌথপরিবারের আদর্শ গৃহিণী ছিলেন তিনি। উদারতা, সহিষ্ণুতা, স্নেহ-মমতা প্রভৃতি যে সকল গুণে সংসার সুখ ও শান্তিপূর্ণ হয়, দক্ষিণাকালীর চরিত্রে সেই সকল গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। বিশেষ লেখাপড়া না জানিলেও পরবর্তীকালে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত কথাবার্তা বলিতে তিনি কখনও অসুবিধা বোধ করেন নাই। কাহার সহিত কি ভাবে চলিতে হইবে এবং কি ভাবে কথা বলিতে হইবে, স্বীয় স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে তিনি তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেন।

দক্ষিণাকালী ছিলেন প্রচ্ছন্ন সাধিকা। তাঁহার সহজ, সরল এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপনের মধ্যে তাঁহার এই সাধিকা-স্বরূপটিকে কেহ বুঝিতে পারে নাই। পরমহংসদেব বলিয়াছেন, "যত হয় গুপ্ত তত হয় পোক্ত।" দক্ষিণাকালীর দেহত্যাগকালে সহসা তাঁহার এই সাধিকা-স্বরূপটি সকলের কাছে ধরা পড়ে। সন্ন্যাসী-পুত্রের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া তিনি সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন।

দেহত্যাগের কিছুক্ষণ পূর্বে তাঁহারই ইঙ্গিতে ঘরের আসন হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী প্রভৃতির প্রতিকৃতি তাঁহার হাতে তুলিয়া দেওয়া হইল। কম্পিত করে ভক্তিভরে একে একে তিনি সকলকে প্রণাম করিলেন। অতঃপর মহাযাত্রার পূর্বক্ষণে "এ জীবনের খেলা শেষ হল।...জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ" বলিয়া করযোড়ে প্রণাম করিতে করিতে মহাযোগিনীর মত তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ যথার্থই বলিয়াছিলেন, "সাধন কর, ভজন কর, মরতে জানলে হয়।" মৃত্যু যে এত সুন্দর হইতে পারে ইহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না।

সীতানাথ ও দক্ষিণাকালীর ঘরে দুই কন্যা এবং এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পুত্রের নাম রবি এবং কন্যা দুইটির নাম কনকলতা ও সুভাষিণী। কনকলতা সর্বজ্যেষ্ঠা এবং রবি সর্বকনিষ্ঠ। রবির যখন মাত্র দশ মাস বয়স তখন তিন বৎসর বয়সে সুভাষিণীর মৃত্যু হয়।

সীতানাথের একমাত্র সহোদর পূর্ণচন্দ্র বসুও কলিকাতায় বসবাস করিতেন। তিনি একজন ভাল জ্যোতিষী ছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র রবির জন্মগ্রহণের পর জাতকের কোষ্ঠিবিচার করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "এই শিশু কালে একজন মহাপুরুষ হবে। এ আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।"

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর গুপ্তচর বিভাগের বিশিষ্ট কর্মী হরিদাস মিত্র তখন ব্রিটিশ সরকারের হস্তে ধৃত হইয়া মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্ণচন্দ্র সেই সময় হরিদাস মিত্রের সহধর্মিণী বেলার কোষ্ঠি বিচার করিয়া বলিয়াছিলেন, "বেলার বৈধব্য দোষ নেই। হরিদাসের ফাঁসির হুকুম অবশ্যই রদ হবে। তবে তেত্রিশ বৎসর বয়সে বেলার মৃত্যুযোগ দেখা যায়।" পূর্ণচন্দ্রের এই ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল।

সীমার মধ্যে অসীম যেখানে আপন সুর বাজায়, উদার উন্মুক্ত সেই পল্লীপ্রকৃতির মধ্যে শিশু রবি মানুষ হইতে লাগিলেন। বাল্যকালে রবি অত্যন্ত দুরন্ত ও দুর্দান্ত প্রকৃতির ছিলেন। মাথাভর্তি তাঁহার জট। হাতে একখানি দা' লইয়া সারাদিন তিনি জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ান। ভয়-ডর বলিয়া তাঁহার কিছু ছিল না। বাগানে বাগানে রাজ্যের ডালপালা কাটিয়া তিনি স্তূপীকৃত করিতেন। কেহ যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, "বোসমশাই, আপনি কি করেন?" "আমি জঙ্গল সাফ করি,"—শিশু হাসিয়া জবাব দিতেন। আবার যদি কেহ আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "রবি, তুমি বড় হয়ে কি করবে?" শিশুরবি বিজ্ঞের মত গম্ভীরভাবে উত্তর দিতেন, "আমি লেখাপড়া করব। আমি দারোগা হব।" পল্লী অঞ্চলে দারোগার যে দোর্দণ্ড প্রতাপ, শিশুরবির মনে বোধ হয় তাহা রেখাপাত করিয়াছিল। শিশুরবির এই দুরন্তপনায় অস্থির ও অতিষ্ঠ হইয়া তাহার মাতামহী গ্রামের বয়স্ক লোকদিগকে মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিতেন, "আমার এই পাগলাটা কি মানুষ হবে?"

শিশুরবির দুই একটি দুরন্তপনার ঘটনা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

রবির বয়স তখন তিন বৎসর। তাঁহাদের গ্রামের বাড়ীতে একটি মাটির ঘরে সাপের গর্ত ছিল। একদিন ঐ ঘরে রবি একা; সেখানে তখন অপর কেহ ছিল না। একটা সাপ ঐ মাটির গর্ত হইতে বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতেছিল। দুরন্ত রবি ইহা দেখিয়া কোথা হইতে একখানি লাঠি সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং সাপটির গর্তে ঐ লাঠি ঢুকাইয়া সাপটিকে খোঁচা মারিতে লাগিলেন। সাপ মাথা বাহির করে, আর ভয়-ডরহীন দুর্দান্ত রবিও উহার গর্তে লাঠি ঢুকাইয়া দেন। অবশেষে রবির খুল্লতাত পূর্ণচন্দ্র বসু ঘরে ঢুকিয়া ইহা দেখিতে পান এবং তাড়াতাড়ি রবিকে সেইস্থান হইতে সরাইয়া আনেন।

আরেকবার এক দুর্ঘটনায় তাঁহার গায়ে আগুন লাগিয়া যায়। শিশুরবি দেখিয়াছিলেন যে, গ্রামের মেয়েরা তাহাদের কাপড়ের আঁচল দিয়া প্রদীপের শিখা নির্বাপিত করে। দুরন্ত রবি একদিন তাহাদের দেখাদেখি ঐরূপ করিতে গেলে তাঁহার কাপড়ে আগুন লাগিয়া যায়। তেলেব প্রদীপের তেল কাপড়ে লাগিয়া যাওয়ায় ঐ আগুন আরও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। পাড়ার লোক ছুটিয়া আসিয়া আগুনের কবল হইতে শিশুরবিকে রক্ষা করে। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে রবির দক্ষিণ উরু পুড়িয়া যায়। সেই পোড়া দাগ অদ্যাবধি তাঁহার দেহে বিদ্যমান রহিয়াছে।

চৈত্রমাসে দেশে অনেকে নীল পূজা করিত। এতদুপলক্ষে রাত্রিতে 'কালীর থালার নাচ' হইত। শিশুরবি ঐ নাচ দেখিতে খুব ভালবাসিতেন এবং নিজেও ঐরূপ নাচিয়া নাচিয়া সকলকে দেখাইতেন।

শৈশব হইতেই রবির গান শুনিবার ও গান শিখিবার বিশেষ ঝোঁক ছিল। কিন্তু অল্প বয়সে সাধারণ লোকের কাছে সাধারণ গান শিখিলে চরিত্র-দোষ হয়, এইরূপ একটা কথা শুনিয়া কিশোর-রবি আর কোনদিন গান শিখেন নাই। এই কারণেই পরবর্তী-কালে ছাত্র-জীবনে রবি কখনও সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতিও দেখেন নাই। তবে যাত্রাগান শুনিবার প্রতি ঝোঁক তাঁহার বরাবরই ছিল এবং এখনও আছে। পৌরাণিক যাত্রা, বিশেষতঃ যে সকল পালায় "কৃষ্ণ", "মহাদেব" প্রভৃতি চরিত্র থাকিত, সেই সকল যাত্রা-পালা তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। কৈশোরে এবং যৌবনে পর পর দশরাত্রি জাগিয়াও তিনি যাত্রাগান শুনিয়াছেন। যাত্রাগান তাঁহার এমনই প্রিয়!

শিশুরবির অপর একটি সংস্কার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি তিন বৎসর বয়সেই বাজার করিতে শিখিয়াছেন। ঐ বয়সেই মাছের ডুলা লইয়া তিনি বাজারে যাইতেন। বাজারের জিনিসগুলি

আওড়াইতে আওড়াইতে তিনি বাড়ী হইতে বাজারে যাইতেন এবং অপরের সাহায্য ছাড়াই রীতিমত দরদস্তুর করিয়া, জিনিসের ওজন বুঝিয়া, ঠিকমত দাম দিয়া, নিজে জিনিস কিনিয়া উহা বাড়ী লইয়া আসিতেন। এই কার্যে শিশুরবি বিশেষ আনন্দও লাভ করিতেন। বাজার করিবার ঝোঁক তাঁহার বরাবরই ছিল। এখনও তিনি বাজার করিতে ভালবাসেন।

এখানে একটি কথা বলিবার আছে। মনে হয় এই বাজার করিবার সংস্কার হেতুই তাঁহাকে সাধক জীবনে গুরুনির্বাচন করিতে বেগ পাইতে হয় নাই। বাজারের কোন্ জিনিসটি ভাল, কোন্ জিনিসটি মন্দ, ইহা যেমন শিশুকালেই তিনি বিচার করিতে শিখিয়াছিলেন, মনে হয় সেইরূপ সাধক জীবনে কে ভণ্ড সাধু, কে যথার্থ সাধু, তাহা বিচার করিতে তাঁহার সহজাত এই সংস্কারই তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছে।

যথাসময়ে শিশুরবিকে পুটিয়া গ্রাম সংলগ্ন আবহুল্লাবাদ গ্রামে পুরাণ চৌধুরী বাড়ীতে হালদার মহাশয়ের পাঠশালায় ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। হুরন্ত রবির কিন্তু লেখাপড়ায় তেমন মন ছিল না। ইতিহাস এবং ভূগোল ছিল তাহার প্রিয় পাঠ্যবিষয়।

রবির বয়স যখন সাত-আট বৎসর তখন সীতানাথ তাঁহার পরিবারকে পুটিয়া গ্রাম হইতে কলিকাতায় আনাইয়া লইলেন। রবিও তাঁহার মায়ের সহিত কলিকাতায় আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে লাগিলেন।

২

দেশের বাড়ী ছাড়িয়া সাত-আট বৎসর বয়সে রবি কলিকাতায় আসিলেন। এখানে বাড়ীর কাছে, বৌবাজার অঞ্চলে জেলেপাড়ায় এক পাঠশালায় তাঁহাকে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। পাঠশালাটি রমানাথ কবিরাজ লেনের গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাসের বাড়ীতে অবস্থিত ছিল।

উক্ত পাঠশালার পড়া শেষ হইলে রবিকে মির্জাপুর স্ট্রীটস্থ জুবিলী ইন্‌স্টিটিউসনে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়ে তিনি ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই বিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়াশুনার পর রবি মির্জাপুর স্ট্রীটস্থ কটন ইন্‌স্টিটিউসনে ভর্তি হন। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। চরিত্রবান্ আদর্শ-বাদী তরুণ রবি তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন।

কটন স্কুলে রবি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। দেশ তখন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে উত্তাল। দুর্বার গতিতে এই আন্দোলন দেশের সুদূর পল্লী অঞ্চলেও ছড়াইয়া পড়িতেছিল। স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করিয়া তরুণ ছাত্র-সম্প্রদায় দলে দলে এই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িল। গাঁজা-মদের দোকানে, বিলাতী পণ্যের দোকানে, স্কুল-কলেজে তাহারা পিকেটিং করিতে লাগিল। তরুণ রবিও এই সময় গৃহকোণে নিঃশব্দে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। দেশের বিভিন্ন নেতার বক্তৃতা শুনিবার জন্য তিনি বিভিন্ন সভাসমিতিতে যোগদান করিতে লাগিলেন।

একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রগণ পিকেটিং করে এবং অপরাহ্ণে কলেজ স্কোয়ারে একটি সভার অধিবেশন হয়। রবি এই পিকেটিং ও সভার একজন পাণ্ডা ছিলেন। সভা পণ্ড করিবার জন্য পুলিশ এই সভায় লাঠি চালাইয়াছিল। রবির মাথাতেও পুলিশের লাঠির আঘাত লাগে। আহত রবিকে পুলিশ ভ্যানে করিয়া থানায় লইয়া যাওয়া হয়। একদিন হাজত বাসের পর তিনি বিচারে মুক্তি লাভ করেন। হাজতে রবিকে মুড়ি খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। রবি উহা না খাইয়া জামার পকেটে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। পরদিবস বিদ্যালয়ে যাইয়া সহপাঠী ও বন্ধুদের মধ্যে তিনি এই মুড়ি বিলাইয়া দেন। রবির 'দেশমাতৃকার পূজার প্রসাদ' মনে করিয়া সকলে মিলিয়া আনন্দসহকারে এই মুড়ি আহার করিয়াছিলেন।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।" কিশোর বয়সেই রবি উপনিষদের এই অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়েব পড়া-শুনা অপেক্ষাও স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁহার মন অধিক আকৃষ্ট হইল। স্বাস্থ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বিদ্যাচর্চার সঙ্গে সঙ্গে কুস্তীচর্চাও চলিল। এই সময় রবি বাঞ্ছারাম অক্রুর দত্ত লেন, গোকুল বড়াল স্ট্রীট, লালবাজার থানা প্রভৃতি স্থানের আখড়ায় রীতিমত কুস্তীচর্চা করিতে লাগিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই কুস্তী-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কুস্তীতে পুলিশ চ্যাম্পিয়ান ছট্টু পাঁড়ে, মানিক পালোয়ান, গোবরবাবু প্রভৃতির নিকট রবি কুস্তী শিক্ষা করেন। একদা কুস্তীগীর ছোট গামার গুরু আসিয়া কিছুদিন কলিকাতায় বসবাস করেন। তাঁহার নিকটও রবি সেই সময় কুস্তী শিক্ষা করিয়াছিলেন। অল্প বয়সেই রবি পাটনার এক উঠতি বয়সের পালোয়ানকে কুস্তীতে হারাইয়া দিয়া সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন।

"হয় সাধু হব, না হয় দিগ্বিজয়ী পালোয়ান হব"—এই-ই ছিল

রবির তখনকার জীবনের লক্ষ্য। আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীরা যে বয়সে "জীবনের লক্ষ্য" কথাটির অর্থই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, রবি কিন্তু সেই কিশোর বয়সেই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। চরিত্রবান্ না হইলে যথার্থ সাধু বা কুস্তীগীব হওয়া যায় না, এই জন্যই কিশোর বয়স হইতেই তিনি তাঁহার চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা সম্পর্কে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। পান, বিড়ি, সিগারেট, চা, তামাক, নস্য প্রভৃতি মাদক দ্রব্য তিনি জীবনে কখনও স্পর্শ করেন নাই। সিনেমা, থিয়েটাব প্রভৃতি অধিকাংশ সময়ে তরুণদেব চবিত্রকে কলুষিত করে বলিয়া, তিনি কখনও সিনেমা, থিয়েটার দেখিতেন না। আধুনিক সঙ্গীত আমাদের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে না বলিয়া, গান শুনিতে ভাল বাসিলেও ববি কিন্তু কখনও সঙ্গীত শিক্ষা করেন নাই। চরিত্রকে নির্মল ও পবিত্র রাখিতে হইলে ছাত্রজীবনে স্বাস্থ্যচর্চা কবা উচিত,—এইরূপ মনে করিয়াই রবি তাঁহার ছাত্র-জীবনে পড়াশুনা অপেক্ষাও কুস্তীর প্রতি বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন।

আখড়ায় কুস্তীচর্চার পব সকলে চলিয়া গেলে রবি ল্যাঙ্গট পরিয়াই প্রত্যহ কিছু সময় মা সরস্বতী এবং মহাবীরের ধ্যান করিতেন। তাঁহার সর্বসময়ের একমাত্র প্রার্থনা ছিল ঃ

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি,
বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি,
বলমসি বলং ময়ি ধেহি,
ওজোঽস্যোজো ময়ি ধেহি,
মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি,
সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি।

তুমি তেজ, আমাতে তেজ স্থাপন কর; তুমি বীর্য, আমাতে বীর্য স্থাপন কর; তুমি বল, আমাতে বল স্থাপন কর; তুমি শক্তি,

আমাতে শক্তি স্থাপন কর ; তুমি মানসিক তেজ, আমাতে মানসিক তেজ স্থাপন কর ; তুমি প্রভাব, আমাতে প্রভাব স্থাপন কর।

সংসারের নানা প্রলোভনের মধ্যেও রবি তাঁহার মনের সঙ্কল্পকে অবিচলিত রাখিতেন। "আমি চরিত্রবান হব, ভবিষ্যতে বড় পালোয়ান হয়ে দঙ্গল লড়ব, আর না হয় সাধু হব"—এই ছিল তাঁহার মনের সঙ্কল্প।

বার বৎসর বয়সেই রবি বিভিন্ন যোগশাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল যোগশাস্ত্রে বর্ণিত আসন অভ্যাস করিতেন। কখনও কখনও এক আসনে বসিয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিতেন। বহু বৎসর পরে ফরিদপুরে এক যোগীর নিকট তিনি এই সকল আসন যথার্থ কিনা তাহা দেখাইয়া লইয়াছিলেন। এই সময় তিনি অল্প অল্প প্রাণায়ামও অভ্যাস করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীকে গুরুপদে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতেও তিনি প্রাণায়াম সম্পর্কে সবিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল প্রাণায়াম তিনি অদ্যাবধি করিয়া আসিতেছেন।

পূর্বে রবির দেশপ্রেম সম্পর্কে সামান্য ইঙ্গিত করা হইয়াছে। শৈশবেই তাঁহার মনে স্বদেশপ্রেমের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। ইতিহাসে শিবাজী, রাণা প্রতাপ প্রভৃতি দেশপ্রেমিক নৃপতিদের কাহিনী পাঠ করিয়া শৈশবেই তিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি খাদিবস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। এখনও তিনি এই খাদিবস্ত্রই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বাল্যে ইতিহাস পাঠেই রবি সর্বপ্রথম বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনী সম্পর্কে জানিতে পারিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের ত্যাগ-তপস্যা, জীবপ্রেম রবিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। তদবধি বুদ্ধদেব কিশোর রবির হৃদয়-সিংহাসনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ

বেদান্ত মঠে তিনিই (রবিই) উদ্যোগী হইয়া বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসব প্রবর্তন করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তৎপ্রতিষ্ঠিত বেলানগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমেও প্রতিবৎসর ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসব পালিত হইয়া আসিতেছে। বুদ্ধদেব অদ্যাবধি তাঁহার প্রাণপেক্ষা প্রিয়।

একমাত্র পুত্র কিশোর রবির এই প্রকার মতিগতি দেখিয়া পিতা সীতানাথ বসু কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। পুত্রকে তিনি সতত উৎসাহিত করিয়া বলিতেন, "যদি সাধু হবি তো বড় সাধু হবি।" পিতৃদেবই কিশোর রবিকে অবসর সময়ে রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী বর্ণনা করিয়া শুনাইতেন। পরবর্তী জীবনে রবি তাঁহার এই ঋষিতুল্য পিতার নিকটই রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাসাধকদের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের অহিংসা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং পরে সর্বভূতে ঈশ্বর বিরাজিত, সুতরাং জীবহত্যা মহাপাপ, এইরূপ উপলব্ধি করিয়াই দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক কিশোর রবি চিরতরে আমিষ খাদ্য ত্যাগ করেন। ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন পূর্বক পবিত্র জীবন-যাপনে নিরামিষ খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন পুস্তক পাঠ করিয়া রবি আশ্বস্ত হইলেন। মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি আহার না করিলে পালোয়ান হওয়া যাইবে না এবং শেষ পর্যন্ত স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবে—এইরূপ যুক্তিকে তিনি আর তখন কোন আমল দিলেন না। আমিষ খাদ্যের প্রতি তাঁহার যে সামান্য দুর্বলতা ছিল, ঐ সকল পুস্তক পাঠে তাহাও দূর হইল।

রবি কিছুকাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি মির্জাপুর স্ট্রীটস্থ সেন্ট্রাল হোমিওপ্যাথিক কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। কলিকাতার তৎকালীন স্বনামখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ বি. ব্যানার্জি, ডাঃ প্রমোদচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতির নিকটও রবি হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

৩

সীতানাথ তখন কলিকাতাব বৌবাজার অঞ্চলে গোপীনাথ বসু লেনে এক বাড়ীতে থাকিতেন। এইস্থানে অবস্থানকালে নিকটবর্তী চৈতন্য সেন লেনে ফরিদপুরের বিখ্যাত সাধক প্রভু জগদ্বন্ধুর কতিপয় শিষ্যের সহিত রবির পরিচয় হয়। ইঁহাদের সংস্পর্শে আসিবার ফলে রবির মনে ঈশ্বর লাভেব আকাঙ্ক্ষা ক্রমে ক্রমে তীব্রতর হইতে থাকে। তাঁহার মনে সংসারের প্রতি আসক্তি উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতে লাগিল। বাড়ীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল। প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়াই রবি চৈতন্য সেন লেনস্থ প্রভু জগদ্বন্ধুব আঙ্গিনায় চলিয়া আসেন, সারাদিন সেখানেই অতিবাহিত করেন, গভীর রাত্রে আবার স্বগৃহে ফিরিয়া যান। এইরূপ প্রত্যহ।

মাতা দক্ষিণাকালী পুত্রের এইপ্রকার মতিগতি দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি রবিকে তাঁহার সাংসারিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রবি কিন্তু তখন তাঁহার জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। দক্ষিণাকালীকে প্রবোধ দিয়া তিনি বলেন, “আমি আর বিয়ে করে সংসারী হব না। তোমাদের বৃদ্ধ বয়সে দিদির ছেলেরাই দেখাশোনা করবে।” রবির জ্যেষ্ঠা ভগ্নী কনকলতার স্বামী তখন কলিকাতাতেই ব্যবসা করিতেন।

পিতা সীতানাথ কিন্তু একমাত্র পুত্র রবিকে এই জন্য কিছুই

বলিতেন না। মনে হয়, সীতানাথ তাঁহার সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবনের পবিত্র ও মহৎ চিত্রখানি সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি সংসার প্রতিপালনের জন্য যতটুকু না করিলে নয়, ঠিক ততটুকু করিয়াই দিনের অবশিষ্টাংশ সময় জপধ্যান ও শাস্ত্রপাঠে অতিবাহিত করিতেন। প্রতি একাদশী তিথিতে তিনি নারায়ণ পূজা করিতেন এবং মাসের মধ্যে প্রায় পনের দিন নানা উপলক্ষে উপবাস করিতেন। তিনি জীবনে সর্বদা সত্য ও ন্যায় পথে চলিতেন বলিয়াই পুত্রকেও তাঁহার ধর্মজীবনে কখনও বাধা দেন নাই। দক্ষিণাকালী মধ্যে মধ্যে সীতানাথের নিকট রবির মতিগতি ও কাজকর্ম সম্পর্কে নালিশ করিলে সীতানাথ ধীরে সুস্থে অল্পকথায় দক্ষিণাকালীকে বলিতেন, "তোমার ছেলেতো আর গুণ্ডা বদমাস, চোর ডাকাতের দলে যেয়ে মিশছে না! ও যে-পথে যেতে চাইছে, সেইতো আসল পথ। আমি বাপ হয়ে ওকে এ কাজে বাধা দিই কি করে! ও যা করছে, করুক।" এমনই ছিল সীতানাথের সংসার অনাসক্তি, এমনই ছিল সীতানাথের ঈশ্বরনির্ভরতা, এমনই ছিল সীতানাথের জ্ঞান-বিচার! নিজে যে পথের পথিক, পুত্রকে তিনি সেই পথ ত্যাগ করিতে বলিবেন কোন্ মুখে! ধন্য পিতা, ধন্য তাঁহার পুত্র!

রবির এই উচ্চ আদর্শ এবং নির্মল চরিত্রের জন্য দক্ষিণাকালীর গুরু, প্রহ্লাদ গোস্বামীর পুত্র যতীন্দ্রমোহন গোস্বামী রবিকে খুব স্নেহ করিতেন। তিনি কলিকাতায় সীতানাথের গৃহে আগমন করিলে রবিকে নানা প্রকার ধর্মকথা শুনাইতেন এবং বিবিধ উপদেশ দান করিতেন। যতীন্দ্রমোহন গোস্বামী একজন বৈষ্ণব সাধক ছিলেন।

রবিদের বাড়ীর নিকট মলঙ্গা লেনে শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে এক গৃহস্থ বাস করিতেন। এই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে একদা কাশী হইতে এক উচ্চ তান্ত্রিক সাধক আসিয়া কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি যতদিন সেখানে ছিলেন, রবি

প্রায়ই তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন। রবির উচ্চ আধার দেখিয়া তিনি তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন।

১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ। শীতকাল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম পার্ষদ এবং লীলাসহচর শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজী তখন আমেরিকায় বেদান্ত-ধর্ম প্রচারান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। বৌবাজার অঞ্চলেই ইডেন হস্‌পিট্যাল রোডের একটি বাড়ীতে অবস্থানপূর্বক তিনি কলিকাতায় শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণের বাণী ও বেদান্ত প্রচার করিতেছিলেন। ঐ বাড়ীতেই তিনি তখন সপ্তাহে তিন দিন—রবিবার, বুধবার এবং শুক্রবার রাজযোগ, গীতা এবং উপনিষদের ক্লাস লইতেছিলেন। কলিকাতার একদল তরুণ ও যুবক স্বামিজী মহারাজের ঐ সকল ক্লাসে নিয়মিতভাবে যোগদান করিত। ঐ সকল শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে নরেন্দ্রকুমার বসু নামে এক ব্যক্তিও ছিলেন।

এই নরেন্দ্রকুমার বসুর সহিত রবিদেব আত্মীয়তা ছিল। নরেন্দ্র-কুমার বসু এবং রবিদের প্রতিবেশী ঢাকার হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর সহিত মধ্যে মধ্যে রবির ধর্মপ্রসঙ্গে নানাবিধ আলোচনা হইত। একদিবস ইঁহাদের সহিত রবির বিভিন্ন ভারতীয় সাধু-মহাত্মার বিষয় আলোচনা হইতেছিল। তখন কথাপ্রসঙ্গে নরেন্দ্রকুমার বসু রবিকে বলিলেন, "আমেরিকা হতে কিছুদিন হয় এক সাধু এসেছেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য। ইডেন হসপিট্যাল রোডের এক বাড়ীতে তিনি থাকেন। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আমি তাঁর রাজযোগ, গীতা, উপনিষদের ক্লাসগুলিতে যোগ দিই। তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমার সঙ্গে যেতে পার। আমি তোমাকে স্বামিজী মহারাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি।"

পিতা সীতানাথ বসুর নিকট রবি পূর্বেই দক্ষিণেশ্বরের পতিত-পাবন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পুণ্য কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন। রবি তাঁহার ঋষিপিতা সীতানাথের জীবনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দিব্য প্রভাব স্বচক্ষে প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এক্ষণে আত্মীয় নরেন্দ্রকুমার বসুর নিকট সেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম সুযোগ্য সন্ন্যাসী সন্তান শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর কথা শুনিয়া এই দিগ্বিজয়ী বৈদান্তিক সন্ন্যাসীকে দর্শনের নিমিত্ত রবির প্রাণ ভীষণভাবে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর প্রতি রবি যেন জন্ম-জন্মান্তরের এক দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। রবি তৎক্ষণাৎ নরেন্দ্রকুমার বসুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব তাঁহাকে স্বামিজী মহারাজের নিকট লইয়া যাইবার জন্য তিনি নরেন্দ্রনাথ বসুকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর প্রতি সপ্তদশ বর্ষীয় তরুণ রবি অকস্মাৎ এই প্রকার সুগভীর আকর্ষণ অনুভব করিলেন কেন? শৈশবেই তিনি পিতার নিকট পরমহংসদেবের পুণ্য কাহিনী শ্রবণ করিয়াছেন। বেলুড়ে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের লীলাসঙ্গিনী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী তখন মর্ত্যকায়ায় শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যলীলায় সহায়তা করিয়া মাত্র কিছুদিন পূর্বে লোকান্তরিতা হইয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের লীলাসহচর ও পার্ষদ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ প্রভৃতি তখনও দেহধারণপূর্বক বেলুড় এবং কলিকাতায় অবস্থান করিয়া নিত্য শত শত তত্ত্বজিজ্ঞাসুর সন্দেহগ্রন্থি মোচন করতঃ আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ সুগম করিয়া দিতেছেন। তাঁহাদের কথাতো রবি জানিতেন; তবে তাঁহাদের প্রতি তিনি প্রাণে প্রাণে এই প্রকার তীব্র আকর্ষণ

অনুভব করিতেন না কেন? ইহার উত্তরে, পরমহংসদেবের ভাষাতেই বলিতে হয় "কুটো বাঁধা আছে।" এই বিশ্বসংসারে যে যার, সে তার। গুরু আমাদের পূর্বনির্দিষ্ট। গুরু-শিষ্যের পবিত্র সম্পর্ক এক জীবনের নহে, ইহা জন্মজন্মান্তরের। নির্বাপিত প্রায় রক্তিমাভ অগ্নি যেরূপ অকস্মাৎ বায়ুব সামান্য ফুৎকারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, গুরু-শিষ্যের জন্মজন্মান্তরের এই সুগভীর, কিন্তু সাময়িকভাবে সুপ্ত, সম্পর্কও তদ্রূপ সময় হইলে অকস্মাৎ হৃদয় আলোড়িত করিয়া সজাগ হইয়া উঠে। রবির ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইয়াছে। শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর সহিত রবির গুরু-শিষ্য সম্পর্ক কেবলমাত্র এই জন্মের নহে, উহা জন্মজন্মান্তরের। এই জন্যই রবির জীবনের সন্ধিক্ষণে যখন গুরুর প্রয়োজন হইল, তখনই তাঁহার জন্মজন্মান্তরের গুরু আসিয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলেন এবং এইজন্যই রবি শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর প্রতি মনে মনে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন ও তাঁহাকে দর্শনের নিমিত্ত ভীষণভাবে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

অবশেষে রবির জীবনে একদিন সেই শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হইল। কোন এক রবিবার তিনি একাকী ইডেন হস্‌পিট্যাল রোডের শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি ভবনে গমন করিলেন। বিস্মিত পুলকে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীকে দর্শন করিলেন এবং দর্শন করিয়া ভক্তিতে অভিভূত হইলেন। স্বামিজী মহারাজের শালপ্রাংশু সমুন্নত দীর্ঘ দেহাবয়ব, বীরত্বব্যঞ্জক ও বলিষ্ঠ দেহাকৃতি, রজতগিরিনিভ নয়নমুগ্ধকর গৌর দেহকান্তি, সদ্যঃ প্রস্ফুটিত শ্বেত সরোজের কোমল-দল সদৃশ আয়ত লোচনদ্বয়, সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল নয়নদ্বয়ে মর্মভেদী সুগভীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, শ্রুতি-সুখকর সুমিষ্ট উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর এবং সর্বোপরি তাঁহার রাজাধিরাজ সদৃশ সুমহান ব্যক্তিত্ব রবিকে যেন চুম্বকের ন্যায় আকৃষ্ট করিল। স্বামিজী মহারাজকে দর্শনমাত্র তাঁহার পদপ্রান্তে ভক্তি-শ্রদ্ধায় রবির মস্তকখানি নত হইয়া

পড়িল। ভূমিতলে সমস্ত দেহ লুটাইয়া দিয়া রবি স্বামিজী মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত রবির মন. আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই তিনি স্বামিজী মহারাজকে ইহা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলেন না; তবে জীবনের পরম পবিত্র মুহূর্তেই রবি মনে মনে তাঁহার হৃদয়মন্দিরের গুরুর সিংহাসনে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীকেই ভক্তিভাবে সংস্থাপিত কবিলেন।

ইহার পর হইতে রবি নিয়মিতভাবে ইডেন হস্‌পিট্যাল রোডের শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতিতে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর ক্লাস সমূহে যোগদান করিতে লাগিলেন। ক্লাস না থাকিলেও সপ্তাহের অন্যান্য দিন তিনি মধ্যে মধ্যে তথায় গমন করিতেন। এই প্রকার যাতায়াতেব ফলে ক্রমে ক্রমে স্বামিজী মহারাজ এবং বেদান্ত সমিতির অপরাপর সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দের সহিত রবির আলাপ হইতে লাগিল। তাঁহার শ্রান্ত-ক্লান্ত মনমধুপ যেন এত দিনে অভীষ্ট পুষ্পোদ্যানের সন্ধান লাভ করিল।

একদিন অপরাহ্নে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজী বেদান্ত সমিতি ভবন হইতে পদব্রজে জানবাজার রাণী রাসমণির গৃহাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। রবি তখন বেদান্ত সমিতি ভবনে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ হইতেই রবি পথের উপরেই স্বামিজী মহারাজকে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। স্বামিজী মহারাজ রবির পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "চল আমার সঙ্গে, রাণী রাসমণির বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আসি।"

রবি নীরবে স্বামিজী মহারাজের অনুসরণ করিলেন। পথে যাইতে যাইতে স্বামিজী মহারাজ রবিকে প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণি সম্পর্কে অনেক কাহিনী বলিলেন। রাণী রাসমণির প্রসঙ্গ শেষ করিয়া তিনি রবির সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন, "হ্যারে, তোর নাম কি?"

"আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীমণীন্দ্রনাথ বসু, ডাক নাম রবি।"

—"তোর বাবার নাম কি ?"

—"শ্রীযুক্ত সীতানাথ বসু।"

—"তোরা ক' ভাই বোন ?"

—"আজ্ঞে, আমরা একভাই, একবোন।"

—"তোর বোনের কি বে' হয়েছে।"

—"আজ্ঞে, দিদির বে' হয়েছে।"

—"তুই কতদূর পড়াশুনা করেছিস ?"

—"আজ্ঞে, আমি ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছি।"

—"এখন কি করিস ?"

—"আজ্ঞে, এখন আমি হোমিওপ্যাথী পড়ি।"

—"তোর বাবা কি করেন ?"

—"তিনি ব্যবসা করেন।"

—"এখানে কোথায় থাকিস্ ?"

—"এখানে বৌবাজার গোপীনাথ বসু লেনে থাকি।"

—"তোদের দেশ কোথায় ?"

—"আজ্ঞে, ফরিদপুর জেলায়।"

এই প্রকার কথাবার্তা বলিতে বলিতে তাঁহারা ক্রমে রাণী রাসমণির বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন। তথায় স্বামিজী মহারাজ ঘুরিয়া ঘুরিয়া রবিকে সব দেখাইলেন। এই বাড়ীটি ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমংসদেবের পবিত্র চরণস্পর্শপূত। পরমহংসদেব বহুবার এই বাড়ী আসিয়াছেন এবং কিছুদিন এই বাড়ীতে থাকিয়া সাধনাও করিয়াছেন। স্বামিজী মহারাজের সহিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরম ভক্তিভরে রবি এই তীর্থস্থানটি পরিদর্শন করিলেন। এক অপূর্ব ভক্তিরসের ধারায় তাঁহার হৃদয় তখন কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

কয়েক দিন পরের কথা।

সেদিন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর নিকট দীক্ষা লাভের নিমিত্ত রবির প্রাণে দুর্দমনীয় তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। এখনই, এই মুহূর্তে মহামন্ত্র লাভ না করিলে প্রাণ বুঝি বাহির হইয়া যায়,—রবির তখন এইরূপ অবস্থা! স্বামিজী মহারাজকে রবি কাতর কণ্ঠে কৃপা করিবার কথা বলিলেন। তিনি কিন্তু প্রার্থীর আবেদনে কর্ণপাতও করিলেন না,—সন্ধ্যার পর সোজা আপনার ঘরে চলিয়া গেলেন। রবিও "আপনাকে কৃপা করতে হবেই" বলিয়া স্বামিজী মহারাজের ঘরের দরজার সম্মুখে ভূমিশয্যায় শুইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, স্বামিজী মহারাজের আশ্বাসবাক্য না পাইলে তিনি অনাহারে ঐ অবস্থায় দেহত্যাগ করিবেন। রবি কাতর কণ্ঠে স্বামিজী মহারাজের নিকট বারংবার তাঁহাব প্রাণের বাসনা নিবেদন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। স্বামিজী মহারাজ রবির এই ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার ঘরের মধ্য হইতেই অশ্রাব্য, অকথ্য, অশ্লীল ও রূঢ় ভাষায় রবিকে যৎপরোনাস্তি গালাগালি দিতে লাগিলেন। রবি শুইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজজীর সন্তান স্বামী করুণানন্দ তখন স্বামিজী মহারাজের সহিত কলিকাতায় বেদান্ত সমিতিতে বাস করিতেছিলেন। তিনি রবিকে পরীক্ষা করিবার জন্য তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি সারারাত একাসনে বসে ধ্যান করিতে পারবি?"

—"হ্যাঁ, পারব।" কাঁদিতে কাঁদিতেই রবি স্পষ্ট কথায় সংক্ষেপে উত্তর দিলেন।

এদিকে রাত্রিও ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। শেষপর্যন্ত বেদান্ত সমিতির অন্যতম ভক্ত মহাতাপস নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রবিকে মিষ্ট কণ্ঠে অনেক প্রবোধ ও সান্ত্বনা-বাক্যে আশ্বাসদানে

শান্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, "রবি, তুমি যেমন আসা-যাওয়া করছ, তেমনি করতে থাক। লেগে থাক। নিরাশ হয়ো না। সময় হলেই মহারাজ তোমায় কৃপা করবেন। লক্ষ্মীটি, কান্নাকাটি করো না। আজ বাড়ী যাও, অনেক রাত হলো।"

নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কথায় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া রবি রোদন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন রাত্রি একটা বাজিয়া গিয়াছে।

পাঠক! সাংসারিক পাটোয়ারী বুদ্ধি লইয়া আমরা যেন এই ঘটনাটির বিচার না করি। মহাগুরু তাঁহার মহাশিষ্যের সহিত সেদিন কি উদ্দেশ্যে এই রুদ্রলীলার অভিনয় করিলেন, তাহা বুঝিবার মত জ্ঞান-বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি কি আমাদের আছে? ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজী, যিনি সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করেন, কি উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহার জন্মজন্মান্তরের ভক্ত-শিষ্য রবির সহিত সেদিন এই নির্দয় ব্যবহার করিলেন, আমরা যেন সাধারণ বুদ্ধিতে উহার বিচার না করি! আইস, আমরা ঐ মহাগুরু এবং তাঁহার মহাশিষ্যের ঐ লীলা অভিনয়ের মর্মোপলব্ধির জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে বারংবার সকাতরে শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ বুদ্ধি প্রার্থনা করি।

রবির সহিত শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর উক্ত ব্যবহার সম্পর্কে এখানে আমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"ধৈর্য" এবং "ধর্ম", এই দুইটি পদেরই ব্যুৎপত্তি হইতেছে সংস্কৃত "ধৃ" ধাতু হইতে। "ধৈর্য" এবং "ধর্ম" অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যথার্থ ধৈর্যশীল না হইলে কদাপি ধর্ম লাভ হয় না। আমার সামান্য বুদ্ধিতে মনে হয়, স্বামিজী মহারাজ ঐ দিন রবির ধৈর্য পরীক্ষার জন্যই তাঁহার প্রতি ঐ প্রকার অশ্রাব্য, অকথ্য, অশ্লীল ও রূঢ় ভাষায় গালাগালি বর্ষণ করিয়াছিলেন।

আরও একটি বিষয় আছে। যাহাকে যথার্থ ভালবাসা যায়, তাহাকেই কাঁদান যায়। স্বামিজী মহারাজ রবিকে যথার্থই ভালবাসিতেন বলিয়া বোধ হয়, ঐদিন তাঁহাকে ঐরূপভাবে কাঁদাইয়া ছিলেন। রবির প্রতি স্বামিজী মহারাজের ঐদিনের ব্যবহার ক্রোধ নহে, উহা সুগভীর ও সীমাহীন প্রেমেরই পরিচায়ক।

৪

সেদিন রাত্রি প্রায় দেড় ঘটিকায় রবি বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। সমস্ত রাত্রি তাঁহার আর নিদ্রা হইল না। শয্যায় শয়ন করিয়াও তিনি নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর নিকট হইতে ঐ প্রকার রূঢ় ব্যবহার ও মর্মান্তিক আঘাতের জন্য রবি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। অথচ ইহার জন্য স্বামিজী মহারাজের প্রতি রবির মনে কোনপ্রকার বিরূপভাব কিংবা অভিমানেরও সৃষ্টি হইল না। রবি নীরবে এই দুঃসহ আঘাত সহ্য করিলেন।

একটি গল্প আছে। রামায়ণের ঘটনা।

রাম-লক্ষ্মণ পম্পা সরোবরের তীরে আসিয়াছেন। তাঁহারা সরোবরে স্নান করিবেন। জলে নামিবার পূর্বে রাম তাঁহার হাতের ধনুর্বাণটি মাটিতে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। স্নানান্তে যখন তীরে উঠিয়া তিনি ধনুর্বাণটি মাটি হইতে তুলিতে গেলেন, তখন রাম দেখিলেন যে, মাটিতে একটি ভেক তাঁহার ধনুকে বিদ্ধ হইয়া মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। এই করুণ দৃশ্যে ব্যথায় কাতর হইয়া রাম ভেকটিকে শুশ্রূষা করিবার জন্য সযত্নে মাটি হইতে তুলিয়া লইলেন।

স্নেহসিক্ত কণ্ঠে রাম ভেকটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার এই ধনুকাঘাতে তখনই চীৎকার করলে না কেন? আমি তা'হলে সতর্ক হতে পারতাম, তোমারও এমন অবস্থা হ'ত

না। তোমাকে যখন সর্প প্রাণে বধ করে তখন তো তুমি যন্ত্রণায় চীৎকার করে থাক। কেন তুমি তখন সেরকম চীৎকার করলে না?”

মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর ভেক তখন অতিকষ্টে উত্তর করিল, “রাম, তুমি আমার জীবনসর্বস্ব। আমাকে যখন কোন সর্প প্রাণবধ করতে উদ্যত হয়, আমি তখন ‘রাম, আমাকে রক্ষা কর; রাম, আমাকে রক্ষা কর’ বলে তোমারই শরণাপন্ন হই। কিন্তু এখন যখন দেখলাম, তুমি স্বহস্তে আমার প্রাণবধ করতে উদ্যত হয়েছ, তখন আর কার শরণাপন্ন হব, বলতো! সেজন্যই আমি তখন নীরব ছিলাম।”

রবিও মনে মনে যাঁহাকে পূর্বেই তাঁহার হৃদয়-সিংহাসনে গুরুপদে বরণ করিয়াছেন এবং যাঁহার শ্রীচরণে মনে মনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, আজ তাঁহার-দেওয়া-আঘাত সেইজন্যই তিনি নীরবে সহ্য করিলেন। নিজের অদৃষ্ট ব্যতীত অপর কাহাকেও তিনি এই জন্য দোষী করিলেন না। স্বামী অভেদানন্দজীর প্রতি তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধাও বিন্দুমাত্র হ্রাস পাইল না।

পরদিবস অপরাহ্ণেই আবার রবি যথারীতি স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। স্বামী অভেদানন্দ এই দিন রবির সহিত অতি সদয় ব্যবহার করিলেন। এই শান্ত-সৌম্য সন্ন্যাসী যে গত রাত্রিতে রুদ্র ধূর্জটির মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন, ইহা আর রবির তখন মনেই হইল না। স্বামিজী মহারাজের অমৃতবর্ষী মধুর সস্নেহ বাক্যে রবির মনের সমস্ত উত্তাপ ও অশান্তি দূর হইয়া গেল।

রবির পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্বামী অভেদানন্দ বলিলেন, “তুই আমার এখানে রোজ আসবি; তোকে আমার খুব ভাল লাগে।”

স্বামী অভেদানন্দ অপরাহ্ণের দিকে তাঁহার কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া নীরবে পড়াশুনা করিতেন। বাহিরের কেহ আসিয়া ঐ

সময় যাহাতে তাঁহার পাঠে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করিতে পারে, সেইজন্যই এই ব্যবস্থা।

রবি বলিলেন, "কিন্তু আপনার ঘর যে তখন বন্ধ থাকে! আমি আসব কি করে?"

স্বামিজী মহারাজ বলিলেন, "তুই পাঁচটার পর এসে আমার ঘরের দরজায় তিনটে টোকা দিবি। তোর এই সঙ্কেত পেলেই আমি দরজা খুলে দেব।"

ইহার পর হইতে প্রতিদিন রবি অপরাহ্ণ পাঁচটার পরেই স্বামিজী মহারাজের ঘরের দরজায় যাইয়া টোকা দিয়া সঙ্কেত করিতেন। সঙ্কেত পাইয়া স্বামী অভেদানন্দও ঘরের দরজা খুলিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া যাইতেন। রবি ঘরে প্রবেশ করিয়া পুনরায় দরজা বন্ধ করিয়া দিতেন।

এই প্রকারে প্রতিদিন আড়াই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা পর্যন্ত রবি স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পুণ্য সঙ্গ লাভ করিতেন। স্বামিজী এই সময় রবিকে "রামকৃষ্ণ কথামৃত", "রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" প্রভৃতি সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিতে দিতেন। কোন কোন দিন রবিকে তিনি বিবিধ প্রকার সদুপদেশও দান করিতেন।

এই সময় রবিকে স্বামী অভেদানন্দ একদিন প্রাণায়াম সম্পর্কে শিক্ষা দান করিলেন। কি নামের মন্ত্র জপ করিতে হইবে, কি প্রকারে জপ করিতে হইবে তাহাও স্বামিজী মহারাজ একদিন রবিকে শিখাইয়া দিলেন। স্বামী অভেদানন্দের নির্দেশ ও উপদেশ অনুসারে এই সময় হইতে রবি যথারীতি প্রত্যহ নাম জপ করিতে এবং প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে লাগিলেন।

১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, ফাল্গুন মাস। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরম-হংসদেবের জন্মতিথি উৎসব আসন্ন। ইডেন হস্‌পিট্যাল রোডের বেদান্ত সমিতিতে এই উৎসবের প্রস্তুতি চলিতেছে। এই সময়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসবের ঠিক পূর্বদিবস রবি যথারীতি যথাসময়ে বেদান্ত সমিতিতে গমন করিলে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ অকস্মাৎ তাঁহাকে বলিলেন, "কে? রবি! কাল তোকে বলি দেবো, ঠাকুরের কাছে তোকে বলি দেবো। কাল ঠাকুরের জন্মতিথি, তুই কিছু ফুল আর একটা ফল নিয়ে আসিস্।"

রবি বুঝিলেন, তাঁহার জীবনের পবিত্রতম মুহূর্ত প্রত্যাসন্ন। স্বামী অভেদানন্দ যে আজ তাঁহাকে অযাচিতভাবে দীক্ষা দিতে চাহিয়াছেন, ইহাতে রবি যেন কৃত-কৃতার্থ হইয়া গেলেন। স্বামিজী মহারাজের অপরিসীম কৃপা ও করুণায় রবির দুই নয়নে অশ্রুর প্লাবন নামিয়া আসিল।

পরদিবস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথি দিন পূর্বাহ্নে বেলা দশটা, সাড়ে দশটায় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পটের সম্মুখে রবিকে দীক্ষা দান করিলেন। রবির পিতা পরম বৈষ্ণব। প্রত্যহ স্বহস্তে গৃহদেবতা নারায়ণের পূজা না করিয়া তিনি জল স্পর্শ করেন না। রবিও বাল্যকালাবধি শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন, ভক্তি করেন। আজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁহার ইষ্ট হওয়ায় রবির মনে সামান্য একটু দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই পরমহংসদেবের শ্রীমুখের বাণী "যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং একাধারে রামকৃষ্ণ" প্রভৃতি স্মরণ করিয়া রবি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ফেলিলেন। রবির যে-হৃদয়ে এতদিন সমস্তখানি স্থান জুড়িয়া বিরাজ করিতেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আজ হইতে সেখানে সর্বক্ষণ বিরাজ করিতে লাগিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহার কাছে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণে এখন আর কোনও পার্থক্য রহিল না।

রবির দীক্ষা হওয়ায় তাঁহার সমবয়সী বন্ধু এবং আত্মীয় সুরেশচন্দ্র মিত্রও দীক্ষালাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। রবিই সুরেশ-চন্দ্রকে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতিতে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের

নিকট প্রেরণ করেন। কিছুদিন পরে সুরেশচন্দ্রকেও স্বামী অভেদানন্দ দীক্ষা দান করিয়াছিলেন।

বাড়ীর কেহই জানিতেন না যে রবির দীক্ষা হইয়া গিয়াছে। রবি তাঁহার দীক্ষার কথা বাড়ীতে গোপন রাখিয়াছিলেন। তিনি এই সময় গোপনে বাড়ীতে সকালে বেশ কিছু সময় এবং বিকালেও প্রায় আড়াই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা পায়খানায় বসিয়া নিয়মিতভাবে জপ করিতেন। শীত-গ্রীষ্ম বার মাস গভীর রাত্রে বাড়ীর ছাদে বসিয়াও তিনি ধ্যান-জপ করিতেন। অথচ তাহাদের বাড়ীর পশ্চাতেই একটি প্রকাণ্ড নিমগাছ ছিল এবং সেই নিমগাছে একটা ব্রহ্মদৈত্য বাস করিত। রবিদের পাশের বাড়ীর উদয় ঘোষের এক মেয়েকে এই ব্রহ্মদৈত্য একদিন ছাদের উপর ধরিয়াছিল। মেয়েটি সন্ধ্যার সময় ছাদের উপর এলোচুলে বেড়াইতেছিল। রবি কিন্তু উহাতে বিন্দুমাত্র ভয় না পাইয়া প্রত্যহ গভীর রাত্রে ছাদে বসিয়া ধ্যানজপ করিতেন। ব্রহ্মদৈত্য রবিকে কোনদিন কোন প্রকার ভয় দেখান নাই; তবে তিনি ছাদের উপর ধ্যানজপ করিবার কালে কোন কোনদিন মিষ্টান্নের মধুর গন্ধ, আবার কোন কোনদিন ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ পাইতেন।

রবির পিতা সীতানাথ বসুর অন্তরের একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাঁহার একমাত্র পুত্র রবি যতদূর পড়াশুনা করিতে চাহেন, তিনি তাঁহাকে ততদূর পড়াইবেন। রবির শিক্ষার জন্য অর্থব্যয়ে তিনি আদৌ কার্পণ্য করিতেন না। বিধাতার ইচ্ছা কিন্তু অন্যরূপ। তিনি রবিকে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের দিকে আধ্যাত্মিকতার পথে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর নিকট মন্ত্র-দীক্ষা লাভের পর রবির সংসারাসক্তি যেন আরও হ্রাস পাইল। লেখাপড়া করিয়া যে সময়টুকু নষ্ট হয়, সেই সময়টুকুও তিনি নষ্ট করিতে চাহেন না। হোমিওপ্যাথী পড়িবার দিকেও তাঁহার

আর মন নাই। ক্রমে ক্রমে তিনি হোমিওপ্যাথিক কলেজে যাতায়াত কমাইয়া দিলেন এবং অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার জন্য পড়া-শুনাও শেষপর্যন্ত একেবারেই ছাড়িয়া দিলেন। তিনি বেদান্ত সমিতিতে আরও বেশী করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন। প্রতিদিন তিনি নিয়মিতভাবে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর পূত সঙ্গ করিতেন এবং তাঁহার সেবা করিতেন। স্বামিজী মহারাজের বিভিন্ন ক্লাসগুলিতেও তিনি নিয়মিতভাবে যোগদান করিতেন। সংসারের কোন আকর্ষণই রবিকে ঐ সকল কার্যে বাধা দিতে পারিত না।

রবিব পিতা সীতানাথ বসুর শরীব ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার কঠিন ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। গুরুগত-প্রাণ রবি তখন নিয়মিতভাবে বেদান্ত সমিতি হইতে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর অন্নপ্রসাদ আনয়ন করিয়া পিতাকে খাওয়াইতেন। স্বামিজী মহারাজের অন্নপ্রসাদ আহারে সীতানাথও কয়েকবার করাল ব্যাধির আক্রমণে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। ইহাতে রবির মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, স্বামিজী মহারাজের অন্নপ্রসাদ গ্রহণে মানুষ সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করে।

রবির দীক্ষালাভের পাঁচ-ছয় বৎসর পবের ঘটনা।

বাল্যকাল হইতে রবির বুদ্ধগয়া, কাশী, সারনাথ প্রভৃতি দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। এতদিনে তাঁহার সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। একদিবস রবি তাঁহার অন্যতম গুরুভ্রাতা নীলমণি মহারাজকে সঙ্গে করিয়া পদব্রজে ঐ সকল স্থান দর্শন করিবার মানসে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলেন। রবির এই তীর্থ-যাত্রার কথা তাঁহার বাড়ীর কেহই জানিতেন না। সঙ্গে তাঁহাদের সম্বল মাত্র ছয়টি পয়সা (তখন চৌষট্টি পয়সা এক টাকার সমান

ছিল)। যাত্রার দ্বিতীয় দিবসেই এই ছয় পয়সা খরচ হইয়া গেল। পথে তাঁহারা মাধুকরী করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন।

এই তীর্থযাত্রার কয়েকদিনের স্মৃতি অদ্যাবধি রবির মনে উজ্জ্বল হইয়া আছে। ঘটনাগুলি এখানে বর্ণিত হইল।

নীলমণি মহারাজ এবং রবি হাঁটিতে হাঁটিতে হুগলী জিলার একটি অখ্যাত গণ্ডগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা দ্বিপ্রহর। ক্লান্ত তীর্থযাত্রীদ্বয় গ্রামের এক দরিদ্র গৃহস্থের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহারা দেখেন যে এক বৃদ্ধা তাহার মাটির ঘরের বারান্দায় বসিয়া একখানি কাঁথা সেলাই করিতেছেন এবং নীরবে চোখের জল ফেলিতেছেন। বৃদ্ধাকে কাঁদিবাব কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "বাবা, আমার ঐ নাতিটি ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই। ছেলেটি আজ ক'মাস ধরে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগ্ছে। রুজি-রোজগার সব বন্ধ। এদিকে ঘরেও চাল, ডাল কিছু নেই। শুধু একমুষ্টি চাল আছে; কাল সকালে রান্না করে ওকে খেতে দেব। তারপর সে হাটে যাবে।...... আমার এই পোড়া অদৃষ্টের কথা ভেবেই আমি কাঁদছি।"

বৃদ্ধার এই পৌত্রটিকে তাঁহারা ঘরের বারান্দাতেই দেখিতে পাইলেন। ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া তাহার শরীর অস্থি-চর্মসার এবং পেটটিও প্লীহায় অসম্ভব বড় হইয়াছে।

বৃদ্ধার নিকট তাঁহারা তাঁহাদের এতখানি বেলাপর্যন্ত অনাহারের কথা বলিলে বৃদ্ধা খুবই ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সে কি বাবা, তোমরা এখনও খাওনি? এ পথ দিয়ে সোজা একটু এগিয়ে গেলেই ঠাকুরবাড়ী পাবে। সেখানে অতিথিশালা আছে। সেখানে যাও। সেখানে গেলেই প্রসাদ পাবে।"

নীলমণি মহারাজ এবং রবি ঠাকুরবাড়ী যাইয়া দেখেন, সেখানে সকলের আহারাদি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরবাড়ীর অতিথিশালা হইতে তাঁহাদিগকে কিছু চাউল দেওয়া হইল।

চাউল কয়টি তাঁহারা পূর্বোক্ত বৃদ্ধাকে আনিয়া দিলেন। বৃদ্ধা যখন শুনিলেন যে, অতিথিশালায়ও তাঁহাদের খাওয়া হয় নাই, তখন তিনি কোনক্রমেই তাঁহাদিগকে ছাড়িলেন না। তিনি তাঁহার ঘর হইতে হাঁড়ি, কাষ্ঠ এবং পরদিবস রন্ধনের জন্য যে দুই-মুষ্টি চাউল অবশিষ্ট ছিল, তাহা আনিয়া অতিথিদ্বয়কে দিলেন। বৃদ্ধার একটা লেবু গাছে একটি মাত্র লেবু ছিল; তিনি তাহাও ছিঁড়িয়া আনিলেন এবং অন্য এক বাড়ী হইতে একটি কাঁচা কলা চাহিয়া আনিয়া তাঁহাদিগকে দিলেন।

রন্ধনেব সমস্ত কিছু যোগাড় করিয়া দিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "বাবা, আমরা অতি নীচ জাত। তোমাদের ভাতে-ভাত তোমরাই রান্না করে নাও।"

নীচ-জাত বলিয়া নহে, বৃদ্ধার কষ্ট হইবে বলিয়াই রবি রন্ধন করিলেন। লেবু সহযোগে খোসাসুদ্ধ কাঁচাকলা সিদ্ধ দিয়া তাঁহারা পরম তৃপ্তির সহিত অন্নগ্রহণ করিলেন।

রবি কাহাকেও এই প্রকার অতিথি সৎকার করিতে দেখেন নাই। বৃদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধায় রবির মন ভরিয়া উঠিল।

পরবর্তী জীবনে রবি ভারতবর্ষের বহুস্থানে বহু ভক্তের বাড়ীতে চর্ব্যচুষ্যলেহ্যপেয় সহযোগে বহুবার অন্নগ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু এমন পবিত্র অন্ন তিনি জীবনে আব কোনদিন গ্রহণ করেন নাই।

পরিব্রাজকদ্বয় পথ চলিতে থাকেন। পশ্চাতে দেখা যায় বৃদ্ধার অশ্রুসিক্ত ছল ছল আঁখি দুইটি।

পরদিবস তাঁহারা উপস্থিত হইলেন অপর এক গ্রামে। নীলমণি মহারাজ এবং রবি এই গ্রামে যাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, তাঁহারাও নিঃস্ব, দরিদ্র।

বাড়ীর গৃহিণী লাউ শাক দিয়া মুগ ডাল রাঁধিয়াছেন। সেই ডালও আবার আস্ত ডাল নহে, ডালের খুদ। ইহা দ্বারাই গৃহিণী অতিথিদ্বয়কে ভাত বাড়িয়া দিলেন।

অতিথিদ্বয় আহারে বসিলে বাড়ীর গৃহিণী পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাদের খাওয়া দেখিতে লাগিলেন। অতিথিদ্বয়ের আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিল। গৃহিণী করজোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদিগকে বলিলেন, "বাবা, আমরা বড় গরীব। একটু আলু বা অন্য কোন ভাল তরকারীও আমাদের জোটে না। একটু আলুর তরকারী আমাদের কাছে রাজভোগের মত। গরীবের এই শাক অন্ন আপনারা পেটভরে খাবেন।"

রবি দেখিলেন, এই দরিদ্রদের মধ্যেই এখনও আন্তরিকতা এবং ধর্মভাব রহিয়াছে। পূর্বদিবস এবং অদ্য দুইদিন দুইটি দরিদ্র নিঃস্ব মহিলার ধর্মপ্রাণতা এবং চারিত্রিক মহত্ত্ব রবিকে মুগ্ধ করিল। চল্লিশ বৎসর পরেও ইঁহাদের স্মৃতি রবির মনে যেন উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

এই তীর্থপর্যটনের অন্য একদিনের ঘটনা।

নীলমণি মহারাজ এবং রবি দ্বিপ্রহরে ক্লান্ত হইয়া এক গৃহস্থের বাড়ী যাইয়া পানীয় জল চাহিলেন। বাড়ীর এক বয়স্কা মহিলা ইহাতে তাঁহাদিগকে গ্রাম্য মেয়েলী ভাষায় অনেক কটু কথা শুনাইয়া দিলেন। কর্কশ ভাষায় তিনি তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "কেন? ঐ যে পুকুর রয়েছে, তা' দেখতে পাওনা? এখানে এসেছ ঢং করতে?"

নীলমণি মহারাজ এবং রবি মহিলার কথায় কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া নীরবে চলিয়া আসিলেন। পরিব্রাজক জীবনে ইহাও তাঁহাদের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা!

অপর একদিনের ঘটনা।

সেদিন নীলমণি মহারাজ এবং রবি এক গ্রামে উপস্থিত হইলে ঐ গ্রামের এক মুসলমান ভদ্রলোক তাঁহাদিগকে বিশেষ আন্তরিকতার সহিত স্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন। ঐ মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়ী সেদিন একজন আত্মীয়ের আগমন হেতু খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। ভদ্রলোক রবি এবং নীলমণি

মহারাজকে কিছুতেই ছাড়িলেন না। তাঁহার গৃহে তাঁহাদের সেদিন অন্নগ্রহণ করিতেই হইল। রবি এবং নীলমণি মহারাজ পরম তৃপ্তির সহিত ঐ মুসলমান ভক্তের অন্নগ্রহণ করিলেন। এই জন্য তাঁহাদের মনে কোন প্রকার বিকারের সৃষ্টি হয় নাই। সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মহাসাধক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সন্তান তাঁহারা। তাঁহারা জানেন, সকলেই ঈশ্বরের সন্তান। পরমহংস-দেবও শ্রীমুখে বলিয়াছেন, "ভক্তের জাত নেই।"

কাশীর পথে তীর্থযাত্রীদ্বয় এক দিবস পদব্রজে আসানসোল আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানে তাঁহারা রামকৃষ্ণ আশ্রমে (তখনও উহা রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই) আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আসানসোল আসিয়া রবির পেটের অসুখ হইল। নীলমণি মহারাজও অসুস্থ হইলেন। এখানে কয়েক দিবস থাকিয়া তাঁহারা শরীর সুস্থ করিলেন।

আসানসোলে নীলমণি মহারাজের পূর্ব পরিচিত এক কংগ্রেস কর্মীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি নীলমণি মহারাজকে অনেক বুঝাইয়া কলিকাতা লইয়া গেলেন। নীলমণি মহারাজের ট্রেন ভাড়া উক্ত কংগ্রেসকর্মীই দিয়াছিলেন।

রবিকেও তিনি কলিকাতা লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। রবি কিন্তু কিছুতেই কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি যা সঙ্কল্প করে বের হয়েছি, তা' সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমি ফিরব না। আমি যা মনস্থ করেছি, তা করবই। পদব্রজে হাজারীবাগের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে যদি আমাকে বাঘের পেটে যেতে হয়—তবুও আমি কাশী বিশ্বনাথ দর্শন না করে ফিরছি না,—বুদ্ধগয়া দর্শন না করে ফিরছি না।"

কংগ্রেসকর্মী রবির এই দৃঢ় সঙ্কল্প দেখিয়া আর কিছু বলিলেন না। নীলমণি মহারাজ কাশী গমন হইতে নিবৃত্ত হইয়া কলিকাতা

রওনা হইলেন। যাইবার পূর্বে তিনি রবির হাত দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ভাই রবি, আমি তোমাকে ফেলে চললাম। তুমি মনে কিছু করো না।"

রবিকে কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুত করা গেল না দেখিয়া আসানসোলের ভক্তবৃন্দ বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সত্যই তো, রবি একা একা কি করিয়া হাজারীবাগের নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া যাইবেন? তাঁহারা তখন নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলেন। ইহার দ্বারা তাঁহারা ববিকে একখানি ট্রেনের টিকিট কিনিয়া দিলেন এবং হাতখরচের জন্য তাঁহার হাতেও আট আনা (বর্তমানে পঞ্চাশ পয়সা) পয়সা দেওয়া হইল। সুতরাং ঈশ্বরেচ্ছায় রবির তীর্থভ্রমণ নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হইতে লাগিল। আসানসোল হইতে রবি গয়া পৌঁছিলেন।

৫

গয়াধামে পৌঁছিয়া রবির মন অপূর্ব শান্তিতে ভরিয়া গেল। তাঁহার বহুদিনের একটি আকাঙ্ক্ষা এতদ্দিনে পূর্ণ হইল। তথায় তিনি চারি-পাঁচ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি গয়ার ভারত সেবাশ্রমে উঠিয়াছিলেন। গয়ার ভারত সেবাশ্রমে তখন জ্ঞানানন্দজী ছিলেন। গয়াধামে রবি বিষ্ণুপাদপদ্ম, অক্ষয় বট, ব্রহ্মযোনি পাহাড়, আকাশ-গঙ্গা পাহাড় প্রভৃতি দর্শন করেন এবং ফল্গু নদীতে স্নান করেন। পদব্রজেই তিনি এই সকল দর্শনাদি করিয়াছিলেন।

গয়াধাম হইতে রবি বুদ্ধগয়া দর্শনের জন্য গমন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতির জীবনে বুদ্ধগয়া একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। পরমহংসদেবের অসুখ অবস্থায় সেবা করিবার সময় একদিন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ এবং স্বামী শিবানন্দ কাশীপুর উদ্যানবাটী হইতে পরমহংসদেবকে না বলিয়াই বুদ্ধগয়ায় আসিয়াছিলেন। বোধিবৃক্ষের নীচে বসিয়া তাঁহারা ধ্যান করিয়াছিলেন। ধ্যানে স্বামী বিবেকানন্দের জ্যোতিদর্শন এবং স্বামী অভেদানন্দের মন দিব্য অনুভূতিতে পূর্ণ হয়। রবি তাঁহার গুরু স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর নিকট এই দিনের অনেক স্মৃতিকথা অনেকবার শ্রবণ করিয়াছিলেন। তদবধি রবির মনে বুদ্ধগয়া দর্শনের নিমিত্ত এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল।

বুদ্ধদেবকে রবি জন্মাবধি শ্রদ্ধা করেন। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ জগতের কল্যাণ কামনায় এবং জীবের দুর্গতি মোচনের জন্য রাজৈশ্বর্য, যুবতী ভার্যা যশোধরা ও প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র রাহুলকে ত্যাগ করিয়া একদিন মহাভিক্ষুর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এই ত্যাগ অতুলনীয়। হৃদয়বত্তায় বুদ্ধদেব পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মগুরুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি করুণার অবতার।

বুদ্ধগয়ায় রবি বুদ্ধমূর্তি দর্শন করিলেন। যে বৃক্ষমূলে তপস্যা করিয়া বুদ্ধদেব "বুদ্ধত্ব" লাভ করিয়াছিলেন, রবি সেই বোধিবৃক্ষের মূলে বসিয়া ধ্যান করিলেন। ধ্যান করিতে করিতে রবির প্রাণ দিব্য আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি প্রাণে অপরিসীম শান্তি অনুভব করিলেন।

তথায় রবি বুদ্ধগয়ার মোহান্তের মঠে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কাশীধাম। ইহা যেন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক দেহের হৃৎপিণ্ড। প্রাণীর হৃৎপিণ্ড হইতে যেরূপ তাহার সমগ্র শরীরের রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়, এই কাশীধাম হইতেও একদিন তদ্রূপ সমগ্র ভারতদেহে আধ্যাত্মিকতার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল।

"অগ্নিহোত্রী মিলেছে হেথায় ব্রহ্মবিদের সাথে,
বেদের জ্যোৎস্না-নিশি মিশে গেছে উপনিষদের প্রাতে।"

এই সেই কাশী, যেখানে ভারতের উত্তরতম প্রান্ত হইতে তথাগত বুদ্ধ, দক্ষিণতম প্রান্ত হইতে আচার্য শঙ্কর আসিয়া তাঁহাদের ধর্মপ্রচার করিয়াছেন। এই সেই কাশী, যেখানে কবি তুলসীদাস, ভক্ত কবীর তাঁহাদের অমৃত-মধুর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই সেই কাশী, যেখানে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তৈলঙ্গস্বামী, সাধক ভাস্করানন্দ তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চক্ষে এই কাশী মৃন্ময় নহে, উহা স্বর্ণময়। শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন সন্ন্যাসী-সন্তান—স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ,

স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী তুরয়ীানন্দ প্রভৃতি এই কাশীতে অবস্থান করিয়া দুশ্চর তপস্যা করিয়াছেন।

গয়াধাম হইতে ট্রেনযোগে রবি কাশীধাম আসিয়া পৌঁছিলেন। কাশীতে রবি মোট দশ-বার দিন ছিলেন। তিনি সেখানে মিছরী পুকুরে শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গৃহে তখন জগদ্ধাত্রী পূজা হইতেছিল। রবি শুনিয়াছিলেন যে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রীর অংশে জন্মগ্রহণ করেন; সুতরাং ঐ গৃহে রবি যে মায়ের প্রসাদ পাইয়া মহানন্দে ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

কাশীধামে রবি বিশ্বনাথ এবং অন্নপূর্ণা দর্শন করেন। বিশ্বনাথের অপূর্ব আরতি দর্শনে তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। প্রত্যহ কাশীর স্বচ্ছতোয়া গঙ্গার পুণ্য সলিলে অবগাহন করিয়া তিনি শান্তি লাভ করিলেন। রবির বারাণসী দর্শনের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা এই প্রকারে পূর্ণ হইল।

কাশীতে অবস্থানকালে রবি কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি তখন চিকিৎসার জন্য কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গমন করেন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই সুস্থ হইয়া উঠেন।

কাশীর দ্রষ্টব্যস্থানসমূহ দর্শন করিয়া রবি পদব্রজে মৃগদাব-সারনাথ গমন করেন। গয়ায় বোধিবৃক্ষমূলে তপস্যা করিয়া বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধদেব এই কাশীসংলগ্ন সারনাথে আসিয়াই তাঁহার নবধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধজাতক কাহিনীতে বর্ণিত আছে, এই মৃগদাব অরণ্যে বুদ্ধদেব তাঁহার পূর্ব-পূর্ব জন্মে বিভিন্ন প্রাণীদেহ ধারণপূর্বক বিচিত্র লীলা করিয়া গিয়াছেন। সারনাথের স্তূপগাত্রে বুদ্ধদেবের সেই সকল লীলাকাহিনী বর্ণিত ও চিত্রিত রহিয়াছে। মৃগদাব-সারনাথ দর্শনে বুদ্ধভক্ত রবির মনে দিব্য আনন্দানুভূতি হয়।

কাশী হইতে রবি কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার বৃন্দাবন গমনেরও আকাঙ্ক্ষা ছিল ; কিন্তু অর্থাভাবে সেই আকাঙ্ক্ষা এই যাত্রায় পূর্ণ হইল না। অর্থাভাবে রবি কখনও পদব্রজে, আবার কখনও বা ট্রেনের গার্ডকে বলিয়া ট্রেনে কলিকাতা আসিলেন।

জামসেদপুরে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজীর এক আদর্শ গৃহীভক্ত ছিলেন। তাঁহার নাম বীরেন্দ্রনাথ হাজরা। তিনি টাটা কোম্পানীতে চাকুরী করিতেন। তিনি ছিলেন আদর্শ কর্মযোগী। সংসারের যাবতীয় কর্মকে, এমন কি কারখানায় তিনি যে কর্ম করিতেন, তাহাকেও তিনি ঈশ্বরের কর্ম বলিয়া মনে করিতেন। গুরুর প্রতি অপরিসীম ভক্তি, গুরু-ভ্রাতাদের প্রতি অপরিমেয় স্নেহ এবং সকল সম্প্রদায়ের সাধুসেবা তাঁহার চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল।

উক্ত বীরেন্দ্রনাথ হাজরা ১৯২৭ খৃস্টাব্দের কোন এক সময়ে তদীয় গুরুভ্রাতা রবিকে জামসেদপুর যাইবার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করেন। তাঁহার আন্তরিক আমন্ত্রণে রবি ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে প্রথম জামসেদপুর গমন করেন।

১৯২৭-২৮ খ্রীস্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর আদেশে রবি এবং স্বামী করুণানন্দ পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণে গমন করেন। তাঁহাদের পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য হইল, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণী ও গীতা প্রচার এবং গীতা দান। পূর্ববঙ্গ সফরকালে তাঁহারা স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাবলীও বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গ সফরকালে রবি এবং করুণানন্দ স্বামী খুলনা, ফরিদপুর জিলার গোপালগঞ্জ, মাদারিপুর, পালং, ঢাকা জিলার তারপাশা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামী বিবেকানন্দ একবার পূর্ববঙ্গ পর্যটনে গিয়াছিলেন। তখন তিনি চট্টগ্রাম জিলার বিখ্যাত তীর্থস্থান চন্দ্রনাথ দর্শন করিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম শহরের অধিবাসীবৃন্দের বিশেষ আগ্রহ এবং অনুরোধ সত্ত্বেও নানা কারণে স্বামী বিবেকানন্দ তখন চট্টগ্রাম যাইতে পারেন নাই। অতঃপর আকস্মিকভাবে স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগ হইলে চট্টগ্রাম শহরবাসীদের সেই আকাঙ্ক্ষা আর কখনও পূর্ণ হয় নাই। ইহাতে তাহারা বিশেষ মর্মাহত এবং ম্রিয়মান ছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকা হইতে স্থায়ীভাবে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলে চট্টগ্রামের অধিবাসীবৃন্দ স্বামী বিবেকানন্দের এই সুযোগ্য গুরুভ্রাতাকে একবার চট্টগ্রাম শহরে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিলেন। স্বামী অভেদানন্দ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ যখন বলিয়াছিলেন, "Even if I perish out of this plane my message will be sounded through these dear lips and the world will hear it,"—তখন স্বামী অভেদানন্দের বাণীই যে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, তাহাতে আর সন্দেহ কি!

চট্টগ্রামের অধিবাসীবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের শীতকালে স্বামী অভেদানন্দ চট্টগ্রাম গমন করেন্। চট্টগ্রাম শহরের প্রধান সরকারী উকিল রসিকলাল হাজারী মহাশয় স্বামী অভেদানন্দকে চট্টগ্রাম লইয়া যাইবার ব্যাপারে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার উদ্যোগে চট্টগ্রাম শহরের জমিদার ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ীতে স্বামী অভেদানন্দের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। স্বামিজী মহারাজের সহিত চিন্তাহরণ মহারাজ, নগেন মহারাজ, কেশবচৈতন্য এবং রবি ছিলেন।

স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের অনুরোধে স্বামী অভেদানন্দ চট্টগ্রাম শহরে পাঁচ-ছয়টি ভাষণ দান করেন। স্থানীয় কলেজ হোস্টেলের

ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ বলিয়াছিলেন, “স্বামী বিবেকানন্দ আমার গুরুভ্রাতা। তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষ কদাচিৎ কখনও জগতে আসেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান যন্ত্র ছিলেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণ যন্ত্রী, স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ভাবসমূহ প্রচার করে গিয়েছেন।”

“আমেরিকার এক ডাক্তার স্বামী বিবেকানন্দকে যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলেন, ‘এমন মহান প্রাণ, এমন উদার ব্যক্তি আমি আর কখনও দেখিনি।’ চিকাগো শহরে তাঁর প্রথম বক্তৃতা শুনেই আমেরিকাবাসী তাঁকে দেবতার ন্যায় আদর করেন, তাঁর অনুসরণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের ত্যাগ ও বিবেক-বৈরাগ্যের যেমন তুলনা হয় না, তেমনি তাঁর দেশপ্রেমও অতুলনীয়। আমি তাঁর মাথার একগাছি চুলেরও যোগ্য হতে পারিনি। তাঁর মধ্যে একটি দেবদুর্লভ শক্তি ছিল। তোমরা এই বিবেকানন্দের আদর্শকে গ্রহণ কর। তাঁর আদর্শে তোমাদের জীবন ও চরিত্র গঠন কর, দেশ ও জাতির কল্যাণ কর। তোমরা চরিত্রবান হয়ে ভারতের মুখোজ্জ্বল কর। ভারতের স্বাধীনতার জন্য তোমরা জীবন উৎসর্গ কর।”

জমিদার ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের ব্যবস্থাপনায় স্বামী অভেদানন্দজী একদিন মৈনাক পর্বত এবং কক্সবাজার পরিদর্শনে গমন করেন। পুরাণে বর্ণিত আছে, গিরিরাজ হিমালয়ের পুত্র মৈনাক দেবরাজ ইন্দ্রের ভয়ে সমুদ্রগর্ভে যাইয়া আত্মগোপন করেন। পুরাকালে পর্বতসমূহ পক্ষীর মত পক্ষ বিস্তার করিয়া আকাশে উড়িতে পারিত। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার বজ্র দ্বারা এই সকল পর্বতকে পক্ষহীন করিতে আরম্ভ করিলে মৈনাক সমুদ্রগর্ভে যাইয়া লুকাইয়া আত্মগোপন করেন।

কক্সবাজার একটি অতীব মনোরম এবং স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহা সমুদ্রতীরে অবস্থিত।

দিন কয়েক চট্টগ্রাম শহরে অবস্থান করিয়া স্বামী অভেদানন্দ

যেদিন সীতাকুণ্ডে চন্দ্রনাথ দর্শনের জন্য চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন, সেদিন তিনি গাড়ীতে বসিয়া সমবেত চট্টলভক্তদিগকে বলিলেন, "জগতে আর কি আছে? এক ভালবাসা। ভালবাসাই ধর্ম। Love is the supreme virtue. প্রেমই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এই ভালবাসার দ্বারাই শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎকে জয় করেছিলেন। বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, যীশুখ্রীস্ট, চৈতন্যদেব, গুরুনানক প্রভৃতি সকলেই এই ভালবাসা দ্বারা জগৎকে জয় করেছিলেন। ভালবাসাই ভগবান। God is love. বালকেরা পরস্পব পরস্পরকে ভালবাসে। Children love each other." সেখানেই ভগবান।"

৮ই মাঘ সকাল সাড়ে সাতটায় স্বামী অভেদানন্দ সীতাকুণ্ড স্টেশন হইতে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত চিন্তাহরণ মহারাজ, নগেন মহারাজ, কেশব চৈতন্য, রবি, সুবোধ বর্ধন, নোয়াখালির শ্রীযুত সুরেন সুরের স্ত্রী, কন্যা এবং ভ্রাতাও ছিলেন।

চন্দ্রনাথ পাহাড়ে চড়াই করিবার কালে স্বামী অভেদানন্দ শিষ্য রবিকে এক সময় বলিলেন, "কিরে, নির্মলানন্দ চন্দ্রনাথ দর্শন করতে আসেন নি?"

রবি বলিলেন, "তিনি চন্দ্রনাথ দর্শন করতে আসেন নি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'ওসব দেখে আর কি হবে? বাসনা বাড়বে বই তো নয়! যাঁকে দেখবার, তাঁকে দেখেছি। এ যুগের যিনি অবতার, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, তাঁকে দেখেছি! তাঁকে যখন দেখেছি, তখন আর বাকি রইল কি!' পূজনীয় নির্মলানন্দ স্বামী আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করেন। চট্টগ্রামে তিনি ভক্তদের কাছে বলেছিলেন, 'আমি বক্তৃতা দিতে পারব না। অভেদানন্দ মহারাজ আসছেন, তিনি ইয়ং (young), তাঁর বক্তৃতা দিবার শক্তি আছে। তিনি বক্তৃতা দেবেন। বয়সে আমি তাঁর বড়, কিন্তু গুণে অনেক বিষয়ে তিনি আমার বড়'।"

স্বামী অভেদানন্দ ইহা শুনিয়া বলিলেন, "তা ঠিক! তুলসী (স্বামী নির্মলানন্দের গৃহাশ্রমের নাম) আমাকে খুব মান্য করে।"

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ চন্দ্রনাথ পাহাড়ে যাইবার সময় বিরূপাক্ষ মন্দির দর্শন করিলেন। পরে তিনি চড়াই করিয়া বাবা চন্দ্রনাথের মন্দিরে উপনীত হইলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া স্বামিজী বিগ্রহকে প্রণাম ও ধ্যান-জপাদি করিলেন। পরে পুষ্প-বিল্বপত্র ও জল লইয়া তিনি বাবা চন্দ্রনাথের শিরে অঞ্জলি অর্পণ করিলেন,—

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং গতিস্তং পরমেশ্বরঃ॥"

পরে পূজাদি সাঙ্গ করিয়া স্বামী অভেদানন্দ বলিলেন, "বহুদিন ইচ্ছা হয়েছিল চন্দ্রনাথ দর্শন করব। আজ শ্রীশ্রীঠাকুর সে ইচ্ছা মিটালেন।"

মন্দিরের বাহিরে আসিয়া স্বামী অভেদানন্দ ঐ স্থানের দৃশ্যাবলী দর্শন করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া বলিলেন, "বাঃ, কি সুন্দর দৃশ্য! ছাখ, কেমন দেখাচ্ছে! মনে হচ্ছে যেন থিয়েটারের সিন্। মনোরম স্থান। এমন স্থানেই তপস্যা করতে হয়।"

পরে রবি এবং অন্যান্য সকলে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বিগ্রহকে পূজা ও অঞ্জলি প্রদান করিলেন।

মধ্যাহ্নে সকলে উনকোটি শিবের স্থানে উপস্থিত হইলেন। গহ্বরে যাইয়া সকলে উনকোটি শিব দর্শন করিলেন। এই সময় স্বামী অভেদানন্দ পিপাসার্ত হইয়া রবির নিকট পানীয় জল চাহিলেন। রবি উনকোটি শিবের ঝরণা হইতে স্বামিজী মহারাজের জন্য জল লইয়া আসিলেন। তথায় এক সাধুর কুটীর ছিল। কুটীরে অনেকগুলি পেঁপে ছিল, কিন্তু কোন লোক ছিল না। রবি স্বামিজী মহারাজের জন্য দুইটি পেঁপে বাছিয়া লইলেন এবং উহার দাম বাবদ একটি সিকি দিবার কথা কাগজে লিখিয়া তথায় রাখিয়া আসিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ পেঁপেসহ জল পান করিলেন এবং সকলকে

প্রসাদ দিলেন। তিনি নিজে নিজেই বলিলেন, "একটু ডাব বা লেবু পেলে হত!"

ইহার কিছু পরেই চন্দ্রনাথের মোহান্ত মহারাজ স্বামী অভেদানন্দের প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ স্বামিজী মহারাজের সেবার জন্য সুবৃহৎ কয়েকটি পরাতে (বড় বড় থালা) করিয়া লোক মারফৎ প্রচুর ফল ও মিষ্টি পাঠাইয়া দেন। ঐ সকল ফলের মধ্যে ডাব, লেবু ইত্যাদিও ছিল। স্বামিজী মহারাজ উহা হইতে একটি ডাবের জল পান এবং একটি কমলালেবু ও সামান্য মিষ্টি খাইয়া সকলকে উহা বিলাইয়া দিলেন, "নে, তোরা কে কত খাবি, খা।"

অতঃপর স্বামী অভেদানন্দ সকলকে লইয়া জ্যোতির্ময়ে আসিলেন। সহসা জ্যোতির্ময়ের অগ্নি দর্শন না হওয়াতে স্বামিজী মহারাজ হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন, অগ্নি, এসো, এসো।" অতঃপর তিনি অগ্নিদেবের আবাহন মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন,

"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং
হোতারং সর্বধাতমম্।"

এইটি হইতেছে অগ্নিদেবের প্রার্থনা,—ঋগ্বেদের মন্ত্র। স্বামী অভেদানন্দের এই মন্ত্রোচ্চারণের কিছু পরেই জ্যোতির্ময় হইতে অগ্নির আবির্ভাব হইল।

স্বামী অভেদানন্দ অতঃপর ঐ স্থান হইতে শঙ্কর মঠের স্বামী নীলানন্দ সরস্বতীর বিশেষ অনুরোধে সদলবলে শঙ্কর মঠে গমন করিলেন। নীলানন্দ স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণের এই দিগ্বিজয়ী সন্ন্যাসী সন্তানকে বিশেষ আদর-যত্ন করিলেন। তাঁহাকে বিবিধ ফল এবং মেওয়া দেওয়া হইল। স্বামিজী মহারাজ সামান্য ফল গ্রহণ করিয়া সমবেত ভক্তবৃন্দের মধ্যে তাহা বিলাইয়া দিলেন।

ঐ দিনই রাত্রিতে সীতাকুণ্ড হইতে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতে সকলে কুমিল্লা পৌঁছিলেন। কুমিল্লাতে স্বামী অভেদানন্দ রাণীর

দীঘির ধারে স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুত প্রমোদকুমার ভট্টাচার্যের বাড়ীতে অবস্থান করেন। তথায় কতিপয় দিবস অবস্থানকালে স্বামী অভেদানন্দ মহেশ ভট্টাচার্যের ঈশ্বর পাঠশালায়, নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের অভয় আশ্রমে কয়েকটি বক্তৃতা দেন এবং রামমালা ছাত্রাবাসটি পরিদর্শন করেন।

৯ই মাঘ, সোমবার। প্রাতঃকাল।

স্বামিজী মহারাজ গৃহস্বামী প্রমোদবাবুকে উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে বলিলেন, "এ দেহই হচ্ছে মন্দির! ঠাকুরঘর! হৃদয়েই ঠাকুরঘর।"

সন্ধ্যার সময় জনৈক ভক্ত স্বামী অভেদানন্দকে বলিলেন, "আপনি আমার গুরু।"

ইহার উত্তরে স্বামী অভেদানন্দ বলিলেন, "গুরু কে? গুরু ত আপনার হৃদয়ে রয়েছেন। মানুষ কি কখনও গুরু হতে পারে? গুরু এক পরমাত্মা।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিম্।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষণম্॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধী সাক্ষীভূতম্।
ভাবাতীতং ত্রিগুণ রহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

—এই হচ্ছে গুরুর লক্ষণ। সে-ই গুরু। হৃদয়ে তাঁকে ধ্যান করুন। Ask, and it shall be given you. Search, ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. পরমহংসদেবকে কেউ 'গুরু' কি 'বাবা' বললে তিনি বলতেন, 'আমার কোন শালা চেলা নেই। সকলেই ঈশ্বরের ছেলে। আত্মা (জীবাত্মা) পরমাত্মার অংশ, পরমাত্মার কাছেই শিক্ষা পায়।"

১১ই মাঘ, বুধবার। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ।

প্রাতঃকালে স্বামিজী মহারাজ কুমিল্লার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়টি দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি এক বক্তৃতায় ছাত্রীদিগকে উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে বলিলেন, "তোরা হাস্‌বি, খেলবি, exercise ব্যায়াম করবি। শরীর ভাল হবে। শরীর ভাল না থাকলে কিছুই জীবনে করতে পারবি না। জীবনটা বিড়ম্বনামাত্র হবে। তোদের গায়ে এত শক্তি হবে,—তিনটে পুরুষকে ঠেলে ফেলে দিবি। লাঠি খেলবি। ছোরা খেলবি। তা না হলে আত্মরক্ষা করবি কেমন করে? কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটবি, কোদাল দিয়ে মাটি কাটবি। Muscle stiff হবে। তারপর প্রাণায়াম করবি,—বুকের ছাতি বাড়বে। সাধারণ প্রাণায়াম। তোরা এখান থেকে শিক্ষা করে ভাল শিক্ষয়িত্রী হ'। তোরা এক একজন গ্রামে যেয়ে স্কুল করবি,—শিক্ষা দিবি। তোদের দ্বারাই দেশের কল্যাণ হবে।"

অভয় আশ্রম দর্শন করিয়া স্বামী অভেদানন্দ অতীব প্রীত হইয়াছিলেন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনি বলিয়াছিলেন, এমন আশ্রম এখন ভারতের প্রত্যেক শহরে হওয়া উচিত,—বিশেষতঃ বাংলার গ্রামে গ্রামে। তা হলেই দেশের কল্যাণ হবে।"

১৩ই মাঘ, শুক্রবার।

স্বামিজী মহারাজ সুবোধ বর্ধনের মাকে বলিলেন, "আমার সংসার, আমার স্বামী, আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার নাতি,—এই বুদ্ধি ত্যাগ করে—ভগবানের সংসার, ভগবানের ছেলে-মেয়ে এবং সবই তাঁর, এই বুদ্ধি ধরে থাক্‌বে। তাঁর ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে সংসারের সমস্ত কাজ করবে,—মনে শান্তি পাবে, আনন্দ পাবে। তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে, যেন তোমার মন সর্বদা তাঁর দিকে থাকে। যত 'আমি', 'আমার' করবে ততই

দুঃখ পাবে। তোমার স্বামী কি তোমার? তোমার ছেলে কি তোমার? তোমার নাতিপুতি কি তোমার? তুমি একা এসেছ, একা যাবে। তুমি মরলে কি তোমার সঙ্গে কেউ যাবে? ভগবান্ তোমাকে এই ছেলেপুলেদের লালন-পালন করতে দিয়েছেন। তুমি লালন পালন করে যাবে। তাঁর জিনিস, যখন তাঁর ইচ্ছা হবে, তখন নিয়ে যাবেন,—তাতে তোমার কোন কিছু বলবার অধিকার নেই। দেখনা, আয়াগুলো সাহেবদের ছেলেগুলোকে কেমন করে লালন-পালন করে! নিজের ছেলের মত, কিন্তু সে মনে জানে যে তাঁর সন্তান নয়। সেই রকম তুমিও সংসারের সব কাজ করবে; কিন্তু মনে জান্‌বে সবই ভগবানের! ভগবানের সংসার। এই বুদ্ধি করে সংসার কর,—আনন্দ পাবে। তা' না হলে' যত 'আমি', 'আমার' করবে ততই দুঃখ পাবে।

জীবের 'আমি' নিয়েই যত যন্ত্রণা। গরু 'হাম্বা' 'হাম্বা' (আমি, আমি) করে, তাই এত যন্ত্রণা। লাঙলে যোড়ে, রোদবৃষ্টি গায়ের উপর দিয়ে যায়, আবার কসাইয়ে কাটে, চামড়ার জুতো হয়, ঢোল হয়; তখন খুব পেটে (হাস্য)। তবুও নিস্তার নেই! শেষে নাড়ী-ভুঁড়ি থেকে তাঁত হয়। সেই তাঁতে ধুনুরীর যন্ত্র হয়। তখন আর 'হাম্বা' 'হাম্বা' বলে না, তখন বলে 'তুঁহু' 'তুঁহু'। যখন 'তুমি' 'তুমি' বলে তখন নিস্তার। হে ঈশ্বর, আমি দাস, তুমি প্রভু; আমি ছেলে, তুমি মা!"

১৫ই মাঘ, রবিবার, ১৩৩৪ সন।

সকাল বেলা স্বামিজী মহারাজ চেয়ারে বসিয়া গান গাহিতেছেন,—

"পড়িয়ে ভবসাগরে ডোবে মা তনুর তরী।
মায়া-ঝড়, মোহ-তুফান ক্রমে বাড়েগো শঙ্করী॥
একে মনমাঝি আনাড়ী, তাহে ছ'জন গোঁয়ার দাঁড়ি,
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি হাবুডুবু খেয়ে মরি!

ভেঙ্গে গেল ভক্তির হাল, ছিঁড়ে গেল শ্রদ্ধার পাল,
নৌকা হল বানচাল, উপায় কি করি !!
উপায় না দেখিয়ে ভেবে দাশরথি সারা,
তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার দুর্গানামের ভেলা ধরি ॥”

ইহার তিন-চারি দিন পরে স্বামী অভেদানন্দ কলিকাতা চলিয়া আসেন। রবি কিছুদিন কুমিল্লা থাকিয়া নারায়ণগঞ্জের লাঙ্গলবন্ধে ব্রহ্মপুত্রে অষ্টমী স্নান করিতে গমন করেন।

কথিত আছে, পরশুরাম মাতৃহত্যাজনিত পাপ খণ্ডন করিবার জন্য এই তীর্থে স্নান করিয়াছিলেন। এই স্থানে স্নান করিবার পর পরশুরামের হস্তস্থিত কুঠার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। লাঙ্গলবন্ধে অবস্থানকালে রবি একদিন স্থানীয় বিখ্যাত সাধক ললিত সাধুকে যাইয়া দর্শন করিয়া আসেন।

রবি যখন কুমিল্লা অবস্থান করিতেছিলেন তখন বাংলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক শ্রীশ্রীরামঠাকুর মহাশয়ও কুমিল্লায় এক ভক্তের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। রবি একদিন ঐ ভক্তের বাড়ীতে যাইয়া শ্রীশ্রীরামঠাকুরকে দেখিয়া আসিলেন। শ্রীশ্রীরাম-ঠাকুর তখন মৌনী ছিলেন,—পদ্মাসনে দৃঢ়ভাবে বসা। তিনি ক্ষীণাঙ্গ, সুন্দর-শান্ত মূর্তি। তিনি অসামান্য যোগবিভূতির অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ।

শ্রীশ্রীরামঠাকুর নামজপ ও শরণাগতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। তাঁহার একটি উপদেশ, “নামেতে অপত্যস্নেহ জাগাবেন। ছেলে-মেয়ে মায়ের চোখের আড়াল হয়ে গেলে মায়ের মন উচাটন হয়; নামছাড়া হলে মনে যদি ঐরূপ উচাটন ভাব হয়, তবেই নামে অপত্যস্নেহ জাগানো হয়। নামেতে অপত্যস্নেহ জাগাতে পারলে সকল বিপদ হতে মুক্ত হওয়া যায়।”

শ্রীশ্রীরামঠাকুরের অপর এক মূল্যবান বাণী, “গুরুর বাক্যই গুরু।”

কুমিল্লা হইতে রবি পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলে ব্যাপক ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইলেন।

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে মাঘ মাসে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের সহিত সেবক-শিষ্য রবি, স্বামী নিশ্চলানন্দ, ভূপেন মহারাজ, নগেন মহারাজ এলাহাবাদে কুম্ভমেলায় গমন করেন। স্বামিজী মহারাজ এলাহাবাদে গ্রে এ্যাণ্ড কোম্পানীর মালিক শ্রীঅমূল্য কুমার বিশ্বাসের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। মাঘ মাসের মৌনী অমাবস্যায় কুম্ভ-স্নানের দিন নৌকায় ত্রিবেণী যাইয়া স্বামিজী মহারাজ স্নান করিলেন। স্নানের পর কুম্ভমেলা পরিক্রমা করিয়া তিনি বেলা প্রায় তিনটার সময় রামকৃষ্ণ মিশনের ছাউনীতে আসেন। তিনি তখন ভীষণ ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হইয়া তথাকার সাধুদের নিকট কিছু আহার্য চাহিলেন। সাধুদের তখন আহারাদি শেষ হইয়া গিয়াছে। হাঁড়িতে সামান্য একটু খিচুড়ি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সাধুরা সেই সামান্য খিচুড়ি এবং এক রোয়া কমলালেবু আনিয়া তাঁহাকে দিলেন। স্বামিজী মহারাজ উহা আহার করিয়া জল পান করিলেন।

রবি ও অন্যান্য সঙ্গীরা কুম্ভমেলায় সাধুদের সহিত কুম্ভস্নান করিলেন।

পরদিবস স্বামিজী মহারাজ সকলকে লইয়া গঙ্গার পরপারে ঝুসিতে গমন করেন। নড়াইলের জমিদার শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ রায়ও স্বামিজীর সঙ্গে ছিলেন। স্বামিজী মহারাজ তাঁহার যৌবনে যে কুঠিয়ায় অবস্থান করিয়া তপস্যাদি করিতেন, তাহা সকলকে দেখাইলেন। কুম্ভস্নানের কয়েকদিন পরে স্বামী অভেদানন্দ কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিলেন।

রবি যখন এলাহাবাদে বাস করিতেছিলেন তখন একদিন কুম্ভমেলায় ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার ব্রজবিদেহী সন্তদাস বাবাজীর

সহিত রবিকে পরিচয় করাইয়া দেন। রবি এবং সন্তদাস বাবাজী উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। রবি সন্তদাস বাবাজীকে চিরদিনই অপরিসীম ভক্তি এবং সন্তদাস বাবাজীও রবিকে অশেষ স্নেহ করিতেন।

রবি একমাস এলাহাবাদে কাটাইয়া কাশী গমন করেন এবং তথায় তপস্যায় নিযুক্ত হন। কাশীতেই তিনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বরের গান শ্রবণ করেন। রবির প্রায় কুড়ি দিন এই খ্যাতনামা গায়কের গান শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

আমেরিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তনের কয়েক বৎসর পরেই স্বামী অভেদানন্দজী উত্তরবঙ্গে বেদান্ত প্রচারেব জন্য দার্জিলিং শহরে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজী দার্জিলিং আশ্রমে যাইবার কালে শিষ্য রবিকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। রবি এই সময় একটানা সাতমাস কাল দার্জিলিং অবস্থান করেন এবং প্রাণ ভরিয়া গুরু, স্বামী অভেদানন্দের সেবা করেন। রবি সুদীর্ঘ ষোল বৎসর কাল শ্রীরাম-কৃষ্ণের দিগ্বিজয়ী সন্তান স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তবে স্বামিজী মহারাজের সহিত এই একবারই তিনি দার্জিলিং গমন করেন। অন্যান্য বৎসর স্বামী অভেদানন্দ কলিকাতা হইতে দার্জিলিং গমন করিলে রবি শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাবলী প্রচারে কিংবা তীর্থ পর্যটনে ও তপস্যায় বহির্গত হইতেন।

দার্জিলিং অবস্থানকালে রবি প্রত্যহ প্রত্যুষে সূর্যোদয় দর্শন করিতেন। ঐ সময় কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণ শিখরের অপার সৌন্দর্যে রবির কবিচিত্ত মুগ্ধ হইত। ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের সন্নিকটে তিনি গীতা পাঠ করিতেন, ধ্যান করিতেন। টাইগার হিলে সূর্যোদয়

দর্শনের জন্য তিনি কয়েকবার তথায় গমন করেন ; কিন্তু আবহাওয়া অনুকূল না থাকিবার জন্য তথায় তাঁহার সূর্যোদয় দর্শন হয় নাই। অবশেষে তিনি নভেম্বর মাসে একদিন টাইগার হিল হইতে সূর্যোদয়ের অতুলনীয় সৌন্দর্য এবং পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ মাউণ্ট এভারেস্ট দর্শন করিলেন। টাইগার হিলে সূর্যোদয় এবং ভেনিসের সূর্যাস্তের সৌন্দর্য জগদ্বিখ্যাত।

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে দার্জিলিং শহরেই স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ স্বীয় জন্মতিথি দিবসে রবিকে ব্রহ্মচর্য প্রদান করিলেন। শিষ্যের প্রগাঢ় বুদ্ধ-ভক্তির কথা স্মরণ করিয়া মহাগুরু তাঁহার মহাশিষ্যের নামকরণ করিলেন 'ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্য'। ব্রহ্মচর্য লাভের পর পুত্র কলিকাতায় পিতা সীতানাথকে সব জানাইয়া পত্র দিলেন। ঋষিতুল্য পিতা সম্বুদ্ধচৈতন্যকে তাঁহার ধর্মজীবনে উৎসাহিত করিয়া পত্র দিলেন, "তুমি ব্রহ্মচর্য লাভ করিয়াছ,—ভাল কথা। আমি চাই তুমি ভাল সাধু হও এবং আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি কর।"

দার্জিলিং অবস্থানকালে ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্যের জীবনে অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা, ইটালীর বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক টুচির সহিত পরিচয়। অধ্যাপক টুচি তখন দার্জিলিং-এ অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় একদিন তিনি বেদান্ত আশ্রমে স্বামী অভেদানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তখন ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্যের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়।

অধ্যাপক টুচি সম্বুদ্ধচৈতন্যকে একদিন তাঁহার গৃহে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। সম্বুদ্ধচৈতন্য অধ্যাপক টুচির গৃহে গেলে সেখানে তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলাপ হয়। অধ্যাপক টুচি সম্বুদ্ধচৈতন্যকে বৌদ্ধদর্শন, যোগশাস্ত্র এবং প্রাণায়াম সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সম্বুদ্ধচৈতন্যও সরল ভাষায় অধ্যাপক টুচির প্রশ্নসমূহের উত্তর দিয়াছিলেন। অধ্যাপক টুচি ঐ সকল উত্তর শুনিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তখন

হইতেই ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্যের প্রতি অধ্যাপক টুচি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন।

ইহার প্রায় নয় বৎসর পর অধ্যাপক টুচি পুনরায় কলিকাতা আসিয়াছিলেন। তখন তিনি গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে অবস্থান করিতেছিলেন। অধ্যাপক টুচি তথায় একদিন ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধ-চৈতন্যকে সংবাদ দিয়া আনাইলেন। অধ্যাপক এবং মিসেস্ টুচি, দুই জনেই সম্বুদ্ধচৈতন্যকে খুব আদর আপ্যায়ন করিলেন। দুই জনেই বারংবার তাঁহাকে বলিলেন, "আমরা তোমাকে ভুলি নি।" অধ্যাপক ও মিসেস্ টুচি এই সময় সম্বুদ্ধচৈতন্যকে 'যীশুখ্রীস্টের জন্ম' সম্পর্কে একটি দুষ্প্রাপ্য ফটো দান করেন।

অধ্যাপক টুচি ইটালীর অধিবাসী হইলেও প্রাচ্যদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত, তিব্বতী ও অন্যান্য ষোলটি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি তিব্বতে বহুকাল অবস্থান করিয়া বৌদ্ধদর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কে গবেষণা করিয়াছিলেন।

৬

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের সহিত সাক্ষাতের পর রবির যে আর পড়াশুনা হয় নাই, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ সময় রবি হোমিওপ্যাথী পড়িতেছিলেন। কিন্তু মহান্ পিতা সীতানাথ পুত্রকে তাঁহার নিজের ব্যবসায় টানিয়া আনিলেন না। দূরদর্শী পিতা তাঁহার পুত্রের জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার এবং প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়াই তাঁহাকে হোমিওপ্যাথিক কলেজে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্ত সীতানাথ যে তাঁহার একমাত্র পুত্রের এই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের নিকট ব্রহ্মচর্য লাভে আনন্দিত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি! সীতানাথ এবং তাঁহার সাধ্বী পত্নী দক্ষিণাকালীও কলিকাতায় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের সহিত ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হইয়া মধ্যে মধ্যে মঠে যাইয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন এবং সাধন-ভজন সম্পর্কে নানা প্রকার উপদেশ লাভ করিতেন।

শেষ বয়সে সীতানাথের শরীর তেমন ভাল যাইতেছিল না। মাঝে মাঝেই তাঁহার অসুখ হইত। যখনই সীতানাথের মারাত্মক কোন অসুখ হইত, সম্বুদ্ধচৈতন্য মঠ হইতে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের অন্নপ্রসাদ আনিয়া রোগীকে খাওয়াইয়া দিতেন।

সম্বুদ্ধচৈতন্যের গুরুভক্তি ছিল অপরিসীম। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্মজ্ঞ সন্তান স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের অন্নপ্রসাদই রুগ্ন সীতানাথকে রোগমুক্ত করিবে।

আশ্চর্যের বিষয়, ঐ অন্নপ্রসাদেই সীতানাথ কয়েকবার করাল ব্যাধির গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

কিন্তু "ভগবানের মার" বলিয়া একটি কথা আছে। ঘটনাটি ঘটে ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। সম্বুদ্ধচৈতন্য ঐ সময় পর্যটনে বাহির হইয়াছিলেন। নবদ্বীপ, আজিমগঞ্জ, বড় নগর, জিয়াগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে পর্যটন করিয়া তিনি যখন মুর্শিদাবাদ আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন অকস্মাৎ একদিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে সীতানাথের দেহত্যাগ হইয়াছে এবং শ্মশানের চিতাগ্নিতে তাঁহার দেহ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে।

স্বপ্নদর্শনের পরদিবসই সম্বুদ্ধচৈতন্য কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিলেন। তথায় আসিয়া তিনি শুনিলেন, ১৩৪১ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ সীতানাথ সজ্ঞানে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। সদ্যঃ পতিহারা দক্ষিণাকালী শোকে মুহ্যমান। একমাত্র পুত্রকে নিকটে পাইয়া এতক্ষণে তিনি কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিলেন। সম্বুদ্ধচৈতন্যের একবার মনে হইল, তিনি কাছে থাকিলে হয়ত-বা সীতানাথের দেহত্যাগ হইত না। স্বামিজী মহারাজের অন্নপ্রসাদে এইবারও তিনি পূর্ববৎ আরোগ্য লাভ করিতেন। এই জন্যই বোধ হয় কালপুরুষ সম্বুদ্ধচৈতন্যকে এইবার কর্মোপলক্ষে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তখন কলিকাতা ছিলেন না। সীতানাথের একবার ভীষণ অসুখ হয়েছিল। একদিন রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইল। নাড়ীর গতি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। ডাক্তার জবাব দিয়া গেলেন। তখন অপরাহ্ণ। ডাক্তার বলিয়া গেলেন, রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সম্বুদ্ধচৈতন্য তখন রুগ্ন পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া একাগ্রমনে ভক্তিবিনম্র চিত্তে গীতা পাঠ করিতে লাগিলেন। রাত্রি চারিটা হইতে সকাল নয়টা পর্যন্ত তিনি গীতা পাঠ করিলেন। রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ ভালর

দিকে পরিবর্তিত হইতে লাগিল। ডাক্তারকে বিস্মিত করিয়া রোগী ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিলেন। এই সকল কারণেই সম্বুদ্ধ-চৈতন্যের মনে দৃঢ় ধারণা ছিল যে তিনি কাছে থাকিলে সীতানাথের মৃত্যু হইত না।

সীতানাথ প্রতি একাদশী তিথিতে স্বহস্তে গৃহদেবতা নারায়ণ পূজা করিতেন। তাঁহার দেহত্যাগের পূর্ব একাদশী তিথিতে যথারীতি নারায়ণ পূজা সাঙ্গ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "এই আমার জীবনের শেষ নারায়ণ পূজা।" সাধক সীতানাথ বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহাকে শীঘ্রই ইহধাম পরিত্যাগ করিতে হইবে। তিনিও সেইজন্য লোকলোচনের অন্তরালে ধীরে ধীরে নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিলেন।

সীতানাথের একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল, পুত্র যেন তাঁহার পারলৌকিক কার্য করেন। স্বর্গত পিতার ঐ অভিপ্রায় অনুযায়ী স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর অনুমতি গ্রহণপূর্বক সম্বুদ্ধচৈতন্য সীতানাথের শ্রাদ্ধাদি করিলেন। স্বামিজী মহারাজও সীতানাথের আত্মার শান্তির জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিলেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন ভাবমুখে বলিয়াছিলেন, "যারা এখানে আস্‌বে, এই তাদের শেষজন্ম।" সীতানাথ বসু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তৎসমীপে মহাতীর্থ দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়াছিলেন, সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞানে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়াছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণও ভাবমুখে তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, "সংসারে থাকবে পাঁকাল মাছের মত। পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে কিন্তু তার দেহে পাঁক লাগে না। সংসার করবে, কিন্তু সংসারের মলিনতা যেন তোমাকে স্পর্শ না করে।" ভগবদ্ভক্ত সীতানাথকে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ জরৎকারু মুনির উপাখ্যানটি বলিয়া সেইভাবে সংসার-জীবন যাপনের উপদেশ দিয়াছিলেন। সাধক সীতানাথও আজীবন সেই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন।

সুতরাং সীতানাথের পবিত্র আত্মা যে উর্ধ্বগতি লাভ করিবে, এই জন্মই যে তাঁহার শেষ জন্ম, তাহাতে আর সন্দেহ কি! অবতার পুরুষের শ্রীমুখের বাণী কদাপি ব্যর্থ হইবার নহে।

স্বামিজী মহারাজ ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্যকে বলিয়াছিলেন, "তোর বাবার মত চরিত্রের লোক সংসারে দুর্লভ।"

শ্রীভগবানে সীতানাথের অদ্ভুত বিশ্বাস ছিল। সকল কার্যে তিনি বলিতেন, "নারায়ণের যা ইচ্ছা তাই হবে।" সম্পূর্ণরূপে তিনি শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। 'কল্য কি হইবে' এই বিষয়ে তিনি জীবনে কখনও মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করেন নাই। সংসারে থাকিয়া তিনি যথার্থ সন্ন্যাসীর ন্যায় আচরণ করিতেন।

সীতানাথের শ্রাদ্ধাদি কার্যের পর শোকসন্তপ্তা দক্ষিণাকালী একদিন মঠে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীকে দর্শন করিতে গমন করিলেন। স্বামিজী মহারাজ তাঁহাকে নিজের সম্মুখে বসাইয়া নানাবিধ সান্ত্বনা দিলেন, প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। অভয় প্রদানপূর্বক স্বামিজী মহারাজ সেদিন দক্ষিণাকালীকে বলিয়াছিলেন, "ভয় কি! আমরা আছি।"- স্বামী অভেদানন্দের এই আশ্বাস বাক্যে দক্ষিণাকালী সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

অপর একদিন সন্ধ্যাবেলা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার শিষ্য সম্বুদ্ধচৈতন্যকে বলিয়াছিলেন, "ছাখ, আমিও আমার মায়ের সেবা করেছি, তার ফলও পেয়েছি। তুইও তোর মায়ের সেবা করিস্। তুই তোর মায়ের এক ছেলে! যতদিন মা আছেন, তুই কোন দূর দেশে বা বিদেশে যাবিনে। মায়ের সেবা করলে, তাঁর আশীর্বাদ পেলে তোর মহাকল্যাণ হবে।"

স্বামীর দেহত্যাগের সময় পুত্র কাছে ছিল না বলিয়া দক্ষিণাকালীর মনে একটু দুঃখ ছিল। এইজন্য শেষ জীবনে দক্ষিণাকালীর আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাঁহার একমাত্র পুত্রের ক্রোড়ে যেন

তাঁহার মৃত্যু হয়। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় সাধিকা দক্ষিণাকালীর এই আকাঙ্ক্ষা পরবর্তীকালে পূর্ণ হইয়াছিল।

সীতানাথের দেহত্যাগের পর স্বামী অভেদানন্দের নির্দেশানুযায়ী দক্ষিণাকালীর ভরণপোষণের যাবতীয় ব্যয়ভার সম্বুদ্ধচৈতন্য স্বয়ং বহন করিতে লাগিলেন। পুত্র ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং মঠে বাস করেন বলিয়া দক্ষিণাকালী তাঁহার কন্যা কনকলতার নিকট আশ্রয় লইলেন। কনকলতার স্বামী কলিকাতাতেই ব্যবসা করিতেন। সম্বুদ্ধচৈতন্য প্রতিমাসে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর নিকট জননীর ভরণপোষণের খরচ বাবদ টাকা দিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাবলী বিক্রয় করিয়া কমিশন বাবদ তিনি যাহা উপার্জন করিতেন, তাহাই সম্পূর্ণরূপে মাতৃসেবায় ব্যয় করিতেন।

এই সম্পর্কে সম্বুদ্ধচৈতন্যের এক বিচিত্র অনুভূতির কথা এখানে বলা হইতেছে। ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্যের এক বিশেষ গুণমুগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন কলিকাতার এক বিশিষ্ট পরিবারের সন্তান এবং টাটা কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী। সম্বুদ্ধচৈতন্য মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, ঐ ভদ্রলোককে তিনি তাঁহার মাতৃসেবার জন্য তাঁহাকে প্রতিমাসে কুড়িটি করিয়া টাকা দিতে বলিবেন। উক্ত ভদ্রলোকের সহিত একদিন সাক্ষাৎ হইলে সম্বুদ্ধচৈতন্য তাঁহাকে স্বীয় মাতৃসেবার জন্য ঐ সাহায্যদানের কথা বলিতে যাইবেন, এমন সময় সম্বুদ্ধচৈতন্যের মনে হইল, কে যেন হাত দিয়া অকস্মাৎ তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছেন,—তাঁহার জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি আর কিছুতেই শত চেষ্টাতেও ঐ ভদ্রলোকের নিকট তাঁহার মনোভিলাষের কথা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। সম্বুদ্ধচৈতন্য বুঝিলেন, ইহা নিশ্চয়ই তাঁহার গুরুদেবের অলৌকিক লীলা। সম্বুদ্ধচৈতন্য তাঁহার মাতৃসেবার ব্যয়ভার স্বয়ং বহন করেন, ইহাই স্বামিজী মহারাজ চাহেন।

পিতা সীতানাথের দেহত্যাগের পর গুরু শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর আদেশে সম্বুদ্ধচৈতন্য সুদীর্ঘ আটাশ বৎসরকাল (১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত) নির্বিচাবে মাতৃসেবা করেন। মাতৃদেবীর যখন যাহা প্রয়োজন হইত সম্বুদ্ধচৈতন্য তাহা না চাহিতেই জননীকে আনিয়া দিতেন। আবার যখন মাতৃদেবীর কোন স্থানে যাইবার ইচ্ছা হইত, সেখানেও সম্বুদ্ধচৈতন্য তাঁহাকে লইয়া যাইতেন। মাতৃদেবীকে তিনি ভাবতবষের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানসমূহ দর্শন কবাইয়াছেন। গত ১৯৩৯-৪৫ খ্রীস্টাব্দের বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের সময় যখন কলিকাতায় নিষ্প্রদীপের ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং কলিকাতা মহানগরী প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল তখন মাতৃদেবীর অভিপ্রায় অনুযায়ী সম্বুদ্ধচৈতন্য তাঁহাকে দেশেব গ্রামে লইয়া গিয়াছিলেন। ঐ সময় দেশের গ্রামে অবস্থানকালে প্রত্যহ জল তুলিয়া, কাঠ কাটিয়া নানা প্রকারে তিনি মাতৃসেবা কবিয়াছিলেন।

মাতৃদেবীর নাম দক্ষিণাকালী বসু। এইজন্য স্বীয় গর্ভধাবিণী জননীকে সম্বুদ্ধচৈতন্য জন্মাবধি আদ্যাশক্তি দক্ষিণাকালীরই জীবন্ত বিগ্রহ বলিয়া মনে করিতেন। একবার শ্রীশ্রীকালীপূজার দিনে কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরের উত্তর দিকের দবজায় জননী দক্ষিণাকালীকে বসাইয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তিজ্ঞানে জবাবিল্বপত্রদলে তাঁহাব পূজা করিয়াছিলেন।

পরবর্তীকালে বেলানগরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য তাঁহার গর্ভধারিণী জননী দক্ষিণাকালীকে পূজা করেন। দক্ষিণাকালীর অনুমতি ও আশীর্বাদ লাভ করিবার পর তিনি বেলা-নগরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। বেলানগর আশ্রমে প্রতি বৎসর কালীপূজার দিন সন্ন্যাসীপুত্র তাঁহার জননীকে কলিকাতা হইতে আশ্রমে আনাইয়া তাঁহার সমক্ষে স্বয়ং জগজ্জননী সর্বমঙ্গলার (বেলানগর আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত কালীর নাম) পূজা করিতেন।

৭

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্যকে তদীয় গুরুভ্রাতা সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার গৃহে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। সতীশচন্দ্র তখন ব্রহ্মদেশের হেনজাদা শহরে অবস্থান করিতেছিলেন। এদিকে সম্বুদ্ধচৈতন্য তখন কলিকাতা রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে স্বামী অভেদানন্দের সেবায় নিযুক্ত। তিনি স্বামিজী মহারাজের নিকট সতীশচন্দ্রের পত্রের কথা উল্লেখ করিলে স্বামী অভেদানন্দ সেবক শিষ্যকে বলেন, "তুই বার্মা গেলে আমাকে কে এমন ভক্তি করে প্রাণ দিয়ে সেবা করবে? আহা! তোর ভক্তি যেন প্রহ্লাদের ভক্তি।" শেষ পর্যন্ত স্বামী অভেদানন্দ শিষ্য সম্বুদ্ধচৈতন্যকে ব্রহ্মদেশে যাইবার জন্য সানন্দে অনুমতি দিলেন।

স্বামিজী মহারাজের "আহা! তোর ভক্তি যেন প্রহ্লাদের ভক্তি"—উক্তিটি সম্পর্কে কিছু বলিবার আছে। সম্বুদ্ধচৈতন্যের গুরুভক্তি ছিল অপরিসীম। তদ্গতচিত্ত হইয়া তিনি গুরুসেবা করিতেন। গুরুসেবাই ছিল তাঁহার সাধন-ভজন, ধ্যান-ধারণা। এই অপরিসীম গুরুভক্তির বলেই সেবক-শিষ্য সম্বুদ্ধচৈতন্য মনে মনে বুঝিতে পারিতেন, স্বামিজী মহারাজের কখন কোন্ জিনিসটির প্রয়োজন। স্বামিজী মহারাজকে আর মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে হইত না। কোনদিন হয়ত রাত্রি তিনটা বা সাড়ে তিনটার সময় শয্যা গ্রহণের পূর্বে স্বামিজী মহারাজের তামাক খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে। তিনি ইতস্ততঃ করিতেছেন, সেবক-শিষ্যকে এত

রাত্রে আবার তামাক দিতে বলিবেন কিনা। এদিকে সেবক-শিষ্য সম্বুদ্ধচৈতন্য স্বামিজী মহারাজের মনোভিলাষ বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি তামাক সাজিয়া নীরবে স্বামিজী মহারাজের ইজি চেয়ারের পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইতেন। অর্ধশায়িত স্বামিজী মহারাজও, "কে? রবি!"—বলিয়া প্রাণখোলা হাস্যসহ সেবক-শিষ্যের হাত হইতে গড়গড়ার নল টানিয়া লইতেন এবং খুব আনন্দ করিয়া ধূমপান করিতেন। শিষ্যকে তিনি প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিতেন, "তুই চিরদিন আনন্দে থাকবি।"—এমনই ছিল সম্বুদ্ধচৈতন্যের গুরুভক্তি ও গুরু-সেবা। এইজন্যই স্বামী অভেদানন্দ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আহা! তোর ভক্তি যেন প্রহ্লাদের ভক্তি!"

গুরু-শিষ্যেব মধ্যে কখনও কখনও প্রচ্ছন্ন কৌতুকও হইত। স্বামিজী মহারাজ কখনও সম্বুদ্ধচৈতন্যের একনিষ্ঠ সেবার প্রশংসা করিলে শিষ্য গুরুকে কপট অনুযোগের সুবে বলিতেন, "আপনিতো আর আমাকে ভালবাসেন না!"

—"কেন? ও কথা বলিস্ কেন?" স্বামিজী মহারাজ ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিতেন।

—"যেদিন আপনার কাছে প্রথম দীক্ষা নিতে চাইলাম, সেদিন আমাকে অমন করে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করলেন কেন?"

—"বল্ দেখি, আমি তোকে সেদিন কি বলেছিলাম।" রহস্য করিয়া স্বামিজী মহারাজ বলিতেন।

—"আমি তা পারব না।" স্মিতহাস্যে শিষ্য বলিতেন। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া স্বামিজী মহারাজ গম্ভীরভাবে বলিতেন, "ব্যাপার কি, জানিস? সেদিন তুই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলি। আমি সেদিন তোকে পরীক্ষার জন্যই অমন করে বলেছিলাম।"

গুরুভ্রাতা সতীশচন্দ্র রায়ের আমন্ত্রণক্রমে সম্বুদ্ধচৈতন্য স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের আশীর্বাদ গ্রহণপূর্বক ১৬ই বৈশাখ কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন রওনা হইলেন। সেই সময় ঐ একই জাহাজে কলিকাতার কতিপয় বড় বড় নামজাদা পালোয়ান, বংশী সিং প্রভৃতিও কুস্তী লড়িবার জন্য রেঙ্গুন যাইতেছিলেন। বঙ্গোপসাগর তখন ভীষণ বিক্ষুব্ধ ছিল। জাহাজের আরোহীরা সকলে জাহাজের দোলায় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। অনেকেই বমি করিতেছে। এমন কি, বংশী সিং পালোয়ানের পযন্ত মাথা ঘুরিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্য কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় জাহাজের ডেকে পায়চারী করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন, আপন মনে বিভিন্ন দেব-দেবীর স্তব পাঠ করিতেন। জাহাজের আরোহীগণ সম্বুদ্ধচৈতন্যের এই প্রকার নির্বিকার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাইতেন। জাহাজে উঠিবার পূর্বেই সম্বুদ্ধচৈতন্য তাঁহার মনকে শাসন করিয়াছিলেন, "খবরদার, জাহাজে বমি করবিনে।" একমাত্র ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্য সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় সমুদ্রভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই অপার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই স্বামী অভেদানন্দও তাঁহার সাধক জীবনে স্বীয় সাধনোপলব্ধি পরীক্ষার জন্য নিজের সুস্থ শরীরে বিভিন্ন সময়ে রোগ আনয়ন করিতেন এবং পুনরায় সুস্থ হইয়া যাইতেন। ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্য যথার্থই স্বামী অভেদানন্দ মহারাজীর সন্তান।

রেঙ্গুনে পৌঁছিবার পর সম্বুদ্ধচৈতন্য লুইস্ স্ট্রীটে চট্টগ্রামের গুরুভ্রাতা প্রফুল্লরঞ্জন দের মেসে উঠিলেন। তথায় কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া তিনি হেনজাদা গমন করেন। হেনজাদার গুরুভ্রাতা সতীশচন্দ্র রায়ের গৃহকে কেন্দ্র করিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য সমস্ত আপার বার্মা পরিভ্রমণ করেন। রেঙ্গুনের সোয়ে-ড্গন প্যাগোডা (Swe-dagon Pagoda), রামকৃষ্ণ মিশন, পেগুর শায়িত বুদ্ধমূর্তি, ম্যাণ্ডালে (অমরপুরা) বুদ্ধদেবের তিনতলার সমান উচ্চ মূর্তি প্রভৃতি তিনি দর্শন করেন। ইরাবতী নদী পার হইয়া সিংগুনে পৃথিবীর

দ্বিতীয় বৃহত্তম ঘণ্টাও তিনি দর্শন করেন এবং তথাকার অরণ্যাঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। ব্রহ্মদেশের বহু প্যাগোডা এবং ম্যাণ্ডালে বুদ্ধদেবের কেশের মন্দিরও তিনি দর্শন করেন। বিভিন্ন প্যাগোডার ফুঙ্গীরা (সন্ন্যাসী) সম্বুদ্ধচৈতন্যের সরলতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিশেষ আদরযত্ন করিতেন। পাঁচ মাসকাল ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন অঞ্চল পর্যটন করিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য আশ্বিন মাসের মধ্যভাগে রেঙ্গুন হইতে জাহাজযোগে মাদ্রাজ রওনা হইলেন।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্য তাঁহার ছাত্রজীবনে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। দেশ-প্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারার সহিত পরিচিত হইয়া এবং তদীয় সুযোগ্য গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর সংস্পর্শে আসিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্যের এই স্বদেশপ্রেম আরও শতগুণে পল্লবিত হইয়া বর্ধিত হইল। স্বামিজী মহারাজের স্বদেশপ্রেম-মূলক অগ্নিগর্ভ বাণীসমূহ তিনি তখন নানাস্থানে প্রচার করিয়া দেশবাসীকে স্বদেশমন্ত্রে উদ্বোধিত করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে এবং কলিকাতার বাহিরে গেলেও ইংরাজ সরকারের সি. আই. ডি. পুলিশ সম্বুদ্ধচৈতন্যের কার্যকলাপের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিত।

একবার আসামের শিলং হইতে সিলেট হইয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য যখন কুমিল্লা যাইতেছিলেন, তখন পথে সায়েস্তাগঞ্জ পর্যন্ত পুলিশ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল। রাত্রি তখন প্রায় বারোটা। সায়েস্তাগঞ্জে পুলিশ তাঁহাকে আটক করিয়া তাঁহার মালপত্র খানাতাল্লাস করিতে চাহে। সম্বুদ্ধচৈতন্যের নিকট তখন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ রচিত ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে কতিপয় অগ্নিগর্ভ বাণী এবং দেশপ্রেমমূলক নিবন্ধ ছিল। খানাতল্লাস এড়াইবার জন্য সম্বুদ্ধচৈতন্য তাঁহাকে লিখিত আসামের প্রধানমন্ত্রী সাদুল্লাসাহেব এবং আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর

পত্রাদি পুলিশকে দেখান। পুলিশ কর্মচারী তখন সম্বুদ্ধচৈতন্যকেই তাঁহার জিনিসপত্র খুলিয়া দেখাইতে বলেন। সম্বুদ্ধচৈতন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত স্বামী অভেদানন্দ রচিত নিবন্ধগুলি গোপন রাখিয়া পুলিশকে একটি একটি করিয়া জিনিস খুলিয়া দেখাইলেন। পুলিশ তাঁহার কাছে আপত্তিজনক কিছু না পাইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেও, এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিল যে তিনি যেন কখনও কোথায়ও কাহারও সহিত রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা এবং বক্তৃতা না করেন। পুলিশের কাছে তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক খবর আছে।

এইস্থলে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, স্বামী অভেদানন্দ মহারাজও পাশ্চাত্ত্য দেশে অবস্থানকালে ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই তীব্র ভাষায় সমালোচনা করিতেন। স্বামিজী মহারাজ রচিত India and her people (আমেরিকা হইতে প্রকাশিত) গ্রন্থখানির প্রচার ভারত সরকার তো নিষিদ্ধই করিয়া দিয়াছিল! তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া এই দেশে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করিলে সরকারের সি. আই. ডি. পুলিশ বহু বৎসর পর্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল।

যাহা হউক, কুমিল্লা পৌঁছাইয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য তদীয় গুরুভ্রাতা এবং স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুত প্রমোদ ভট্টাচার্য মহাশয়কে তাঁহার পথের ঘটনা সবিস্তারে বলিলেন। তিনি সম্বুদ্ধচৈতন্যকে এইজন্য অনেক তিরস্কার করিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "পুলিশ যদি কাগজপত্রসহ তোমাকে আমার কোর্টে হাজির করে, আমিও কিন্তু তোমাকে ছেড়ে দিতে পারব না,—তোমাকে আমি জেল দিতে বাধ্য হব।" তখন গুরুভ্রাতা শ্রীযুত প্রমোদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের পরামর্শ অনুসারে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্বুদ্ধচৈতন্য একদিন রাত্রিতে কুমিল্লাতেই স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ রচিত দেশপ্রেমমূলক অনেক নিবন্ধ আগুনে পোড়াইয়া ফেলিলেন।

সম্বুদ্ধচৈতন্য যখন যেখানে যাইতেন সর্বত্র তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন সমস্যা ও রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করিতেন। ইংরাজ সরকারের পুলিশও এইজন্য সর্বত্র তাঁহার অনুসরণ করিত। সম্বুদ্ধ-চৈতন্য যখন নেপালে গিয়াছিলেন, সেইখানেও তিনি কাটামুণ্ডুর নিকটবর্তী জঙ্গলে স্থানীয় যুবকদের স্বদেশপ্রেমের কথা, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা প্রচার করিয়াছিলেন। যুক্তপ্রদেশে (ইউ. পি.) অবস্থানকালেও তথাকার অসংখ্য তরুণ ও যুবকদের মধ্যে তিনি স্বদেশপ্রেমেব বীজ বপন করিয়াছেন। তিনি তাহাদের সহিত দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিতেন। সিংহল ভ্রমণকালে তথাকার যুবকবৃন্দের মধ্যে সম্বুদ্ধচৈতন্য দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসুর কথা বলিতেন। সিংহলেব যুবকগণ তখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রভৃতি সম্পর্কে অনেককিছু জানিলেও দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে কিন্তু কিছুই জানিত না। অনেকে তাঁহার নাম পর্যন্ত শ্রবণ করে নাই। সিংহলের সর্বত্র তরুণ ও যুবকবৃন্দের মধ্যে সম্বুদ্ধচৈতন্য সর্বদা দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসুর বাণী ও কীর্তিকাহিনী ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। সম্বুদ্ধচৈতন্য বরাবরই দেশপ্রেমিক বলিয়া যেখানেই তিনি যাইতেন, সেই-খানেই তিনি তথাকার জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার পূজারী রাণা প্রতাপসিংহ, ছত্রপতি শিবাজী, অহল্যাবাই, ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতির আদর্শ প্রচার করিয়া তাহাদিগকে দেশপ্রেমে ও স্বদেশের স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ করিতেন।

রেঙ্গুন হইতে মাদ্রাজ গমনের জন্য সম্বুদ্ধচৈতন্য যখন জাহাজে উঠিলেন তখন কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ অফিসারসহ কতিপয় পুলিশ কর্মচারী জাহাজের মধ্যেই তাঁহাকে ঘেরাও করিয়া তাঁহার নাম, ধাম, গন্তব্যস্থান প্রভৃতি সম্পর্কে নানা প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। সম্বুদ্ধচৈতন্যের জিনিসপত্র তল্লাস না করিলেও তাহারা

তাঁহার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের খাতায় লিখিয়া লইল। তিন দিন তিন রাত্রি পরে সম্বুদ্ধচৈতন্যকে লইয়া জাহাজ যখন মাদ্রাজ বন্দরে ভিড়িল, তখন দেখা গেল পূর্ব হইতেই তথায় একদল পুলিশ তাঁহার জন্য জেটিতে অপেক্ষা করিতেছে। জাহাজ জেটিতে ভিড়িবামাত্র তাহারা জাহাজের ডেকে উঠিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্যের মালপত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল। মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ব্যায়াম করিবার জন্য তাঁহার নিকট দুইটি শুষ্ক কাঠি (গাছের ডাল-ভাঙ্গা) ছিল। এই কাঠি দুইটি লইয়াও তাহারা গভীরভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিল। অবশেষে যখন তাহারা সম্বুদ্ধচৈতন্যের বাক্স ঘাঁটিয়া পুস্তকাদি পরীক্ষা করিতে লাগিল, তিনি তখন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ বজ্রগম্ভীর স্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "Don't touch this book. This is my Gita It's a very sacred book." (এই বইখানি স্পর্শ করিও না। এইখানি আমার গীতা। ইহা অতি পবিত্র গ্রন্থ।) সম্বুদ্ধচৈতন্যের এই বজ্রগম্ভীর স্বরে পুলিশ কর্মচারীরা চমকিত হইয়া উঠিল। তাহারা বোধহয় একটু ঘাবড়াইয়াও গেল। অতঃপর সংযতভাবে তাহারা তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্যকে ছাড়িয়া দিল। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার নিকট তখন আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নাই।

সম্বুদ্ধচৈতন্যকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল বটে, কিন্তু পুলিশ তাহার গতিবিধি অনুসরণ ও কাজকর্ম লক্ষ্য করিতে লাগিল। দক্ষিণ ভারত পর্যটনকালে তিনি যখন কেরলের ত্রিবান্দ্রাম পৌঁছাইলেন তখনও জনৈক পাঞ্জাবী সি. আই. ডি. পুলিশ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল।

মাদ্রাজ শহরে সম্বুদ্ধচৈতন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন মঠে উঠিয়াছিলেন। স্বামী শাশ্বতানন্দ তখন ঐ মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। মাদ্রাজের দ্রষ্টব্যস্থান সমূহ দর্শন করিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য দক্ষিণভারতের অন্যান্য স্থানে গমন করেন। তিনি মহাবলীপুরম, পক্ষীতীর্থ, বিষ্ণুকাঞ্চী, শিবকাঞ্চী,

চিদাম্বরম্, রামেশ্বর, মাদুরাই, ত্রিচিনোপল্লী, শ্রীরঙ্গম, কন্যাকুমারিকা, ত্রিবান্দ্রাম্, আরকালি, এর্ণাকুলাম্, কোয়েম্বাটুর, উটকামণ্ড, মহীশূর, ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানসমূহ দর্শন করিলেন। ব্যাঙ্গালোরে টাটা ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক সি. ভি. রমণের সহিত সম্বুদ্ধচৈতন্যের পরিচয় হয়। দক্ষিণভারত ভ্রমণকালে তিনি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠ, ত্রিপতি বালাজী, রমণ মহর্ষির আশ্রম প্রভৃতিও পরিদর্শন করেন। শৃঙ্গেরী মঠের জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যের সহিতও তাঁহার পরিচয় হয়।

দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে সম্বুদ্ধচৈতন্য ত্রিপতি বালাজীকে দর্শন করিবার জন্য যেদিন পাহাড় চড়াই করিতেছিলেন, সেইদিন পথে ভীষণ ঝড়বৃষ্টিতে তাঁহার খুব কষ্ট হয়। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রাদি সম্পূর্ণরূপে ভিজিয়া যায় এবং তিনি ঠাণ্ডায় অবশ হইয়া পড়েন। তিনি তখন মনে মনে ভাবিতেছিলেন, "একটু আগুন পেলে ভাল হতো! শরীরটা সেঁকে নিতাম!"—কিন্তু তৎপরক্ষণেই তিনি মনকে বলিয়া উঠিলেন, "মন, তুমি তো রোজ গীতা পাঠ কর! সেখানে কি পড়নি—

সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপস্যসি॥

এখন তুমি সেইভাবে প্রস্তুত হও। 'সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা' কথাটির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম কর।"

এই প্রকারে মনকে উদ্দীপ্ত করায় পথের কষ্ট আর তাঁহাকে পীড়া দিতে পারিল না। পথের যাবতীয় বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া তিনি পথ চলিতে লাগিলেন। গীতার উক্ত শ্লোকটির তাৎপর্য সম্বুদ্ধচৈতন্য যেন সেদিন যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ অদ্বৈতবাদী রমণ মহর্ষি মাদ্রাজ প্রদেশের তিরুভান্নামালাই পাহাড়ের এক গুহায় বাস করিতেন। রমণ মহর্ষি ভারতবর্ষের সাধকবৃন্দের মধ্যে এক তুলনারহিত অদ্বিতীয় পুরুষ।

তিনি নিজেই নিজের গুরু এবং নিজেই নিজের শিষ্য। সাধক জীবনে তিনি যেমন কোন গুরুবরণ করেন নাই, তদ্রূপ কোন শিষ্যও করেন নাই। রমণ মহর্ষি বলিতেন, "অজ্ঞানের রাজত্বে গুরু-শিষ্যে ভেদ আছে, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী এই দ্বৈতভাবের অতীত, তাঁহার নিকট সকলেই ব্রহ্ম।" তিনি আরও বলেন, "মানুষের প্রকৃত গুরু তাঁহার অন্তরেই রহিয়াছে। যতদিন না মানুষ তাহার অন্তরস্থিত গুরুর সন্ধান পায় ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, ততদিন বাহিরের গুরু কিছুই করিতে পারেন না।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও বলিতেন, "শুদ্ধ মনই শেষে মানুষের গুরু হয়।" শ্রীরামকৃষ্ণের মত রমণ মহর্ষিও কাহারও নিকট হইতে কোন অর্থ গ্রহণ করেন নাই এবং কখনও সিদ্ধাই দেখান নাই। পরমহংসদেবের মতই রমণ মহর্ষি ধর্মের কোন প্রকার আড়ম্বর করেন নাই; নাম, যশ ও প্রতিষ্ঠাকে তিনি কাকবিষ্ঠাবৎ ঘৃণা করিতেন।

রমণ মহর্ষির প্রধান উপদেশ হইতেছে,—"আমি'র অনুসন্ধান কর। 'আমি' কে,—উহা জানিলেই সমস্ত সন্দেহের সমাধান হইবে। 'আমি'র খবর পাইতে হইলে চিন্তা-রাজ্যের ওপারে যাইতে হইবে। ...মানুষ সদা আনন্দের জন্য ছুটিতেছে। মানুষ যে পাপ করে, তাহাও সে আনন্দের জন্যই করে। কিন্তু আনন্দ বাহ্যজগতে কোথাও নাই। উহার খনি অন্তরের গভীরতম প্রদেশে লুক্কায়িত। সদা আনন্দী হইতে হইলে আদি 'আমি'কে জানা আবশ্যক।"

রমণ মহর্ষি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের "রাজযোগ" প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থ তামিল ভাষায় পাঠ করিয়াছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সাধু সন্ন্যাসীদিগকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং স্নেহ করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া রমণ মহর্ষি সর্বধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন।

তাঁহার নিকট শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, এমন কি খ্রীস্টান এবং মুসলমান-গণও আধ্যাত্মিক আলোক লাভ করিতে আসিতেন।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বি. এল. আত্রেয় বলেন, "অদ্বৈত বেদান্তের দুরূহ তত্ত্বকে জীবনে রূপায়িত করাই রমণ মহর্ষির প্রকৃত মহত্ত্ব। বেদান্তমতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই পরমার্থ-সত্তা এবং এই দৃশ্যমান নামরূপাত্মক বিশ্ব ব্রহ্মময়। তত্ত্বানুভূতির ফলে কিছুই মহর্ষির নিকট অজ্ঞাত নহে, কেহই তাঁহাব নিকট অপর নহে এবং কোন ব্যাপারই অবাঞ্ছিত নহে।—এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের হৃদয় হইতে প্রেম, প্রীতি, করুণা, সমবেদনাদি এবং ঐক্যবোধ সদা স্বতঃই বিচ্ছুরিত হইতেছে। মহর্ষির অনুপম মহত্ত্ব এবং তজ্জন্য জনপ্রিয়তার ইহাই নিগূঢ় রহস্য। এই মহর্ষি সমগ্র মানবজাতিব শ্রদ্ধার্হ।"

বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ (ভারতবর্ষের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি) রমণ মহর্ষি সম্পর্কে বলেন, "যে জগৎ উচ্চতর সত্য ও মহত্তর সত্তায় পরিপূর্ণ, তাহা ইহজগতে প্রবিষ্ট হইলেই ইহা বাঁচিতে পারে। একমাত্র উক্ত উপায়ে ইহা রক্ষা পাইবে, অন্য উপায়ে নহে। সেই ঊর্ধ্বলোকের সহিত সংযোগ স্থাপনে আমাদের অক্ষমতাই আমাদের আধিব্যাধির মূলীভূত কারণ। শ্রীরমণের মত মহর্ষিগণ সেই পরমার্থ সত্তার সহিত আমাদের জন্মগত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্মরণ করাইয়া দেন।"

স্বামী বিবেকানন্দের মত রমণ মহর্ষিও বিশ্বাস করিতেন যে, জীবনে পূর্ণতার বিকাশ নির্জন তপস্যা অপেক্ষা ধ্যানযুক্ত সমাজ-সেবায় সহজে হয় এবং মুক্তি জগদ্ধিত দ্বারাই সুলভ।

শ্রীরামকৃষ্ণের মতই তিনি সর্বদা সহজ সমাধিতে অবস্থান করিতেন। সদা সাক্ষীভাবে জীবন-রঙ্গমঞ্চে থাকিয়া তিনি জগতের অনিত্যতা দর্শন করিতেন। আবার কখনও কখনও তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে এইরূপ লীন হইয়া যাইতেন যে তাঁহার হৃদয়ের স্পন্দন ও নিশ্বাসপ্রশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইত।

অদ্বৈতবাদী সাধকপ্রবর রমণ মহর্ষির কাহিনী শ্রবণে সম্বুদ্ধচৈতন্য তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শনের নিমিত্ত তিরুভান্নামালাই গমন করিয়াছিলেন। রমণ মহর্ষি তখন বেদান্ত দর্শনের একখানি হস্তলিখিত ইংরাজী পুঁথি পড়িতেছিলেন। ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্য পুঁথিখানি পাঠ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে রমণ মহর্ষি স্মিতহাস্যে পুঁথিখানি তাঁহাকে পাঠ করিতে দেন। রমণ মহর্ষির সহিত সম্বুদ্ধচৈতন্যের কিছু কথাবার্তাও হইয়াছিল।

দক্ষিণভারত পর্যটন করিতে সম্বুদ্ধচৈতন্যের দুই তিন মাস অতিবাহিত হইয়াছিল। সি. আই. ডি. পুলিশ কর্তৃক আটক হইবার আশঙ্কায় সম্বুদ্ধচৈতন্য এই যাত্রায় সিংহল পর্যটন স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিলে পরে, ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁহার সিংহল পর্যটনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

ঐ সময় তিনি মাদ্রাজ হইতে প্লেনে সিংহল গমন করেন এবং তথাকার প্রসিদ্ধ শহর ও দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন। তখন সিংহল ভ্রমণকালে সম্বুদ্ধচৈতন্য এডামস্ পিক (পর্বতশৃঙ্গ), মিহিন্টাল পাহাড়, কাতারগ্রাম, অনুরাধাপুর প্রভৃতি দর্শন করিয়াছিলেন। অনুরাধাপুর ও মিহিন্টাল পাহাড়ে তিনি ডাগোবা (মন্দির) দর্শনে মুগ্ধ হন।

সম্বুদ্ধচৈতন্যের সিংহল গমনের উদ্দেশ্য ছিল অনুরাধাপুর ও মিহিন্টাল পাহাড় দর্শন। সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রা যখন সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন, সেই সময় এই মিহিন্টাল পাহাড়ে রাজপুত্র মহেন্দ্র একদিন চল্লিশ হাজার নরনারীকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। রাজকন্যা সঙ্ঘমিত্রা গয়ার বোধিবৃক্ষমূলের একটি চারা সিংহলে লইয়া গিয়াছিলেন। এই চারাটি তিনি অনুরাধাপুরে রোপন করিয়াছিলেন। বুদ্ধভক্ত সম্বুদ্ধচৈতন্য ভক্তিনম্র চিত্তে এই বৌদ্ধ তীর্থ

দুইটি দর্শন করিলেন। অনুরাধাপুর হইতে তিনি ঐ বোধিবৃক্ষের একটি পত্রও সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। ঐ পবিত্র পত্রটি এখনও তৎপ্রতিষ্ঠিত বেলানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে রহিয়াছে।

সিংহলের ক্যাণ্ডী শহরটি বৌদ্ধদিগেব একটি পবিত্র তীর্থস্থান। এইস্থানে তথাগত বুদ্ধেব বিশ্ববিখ্যাত দন্তমন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরে বুদ্ধদেবের একটি পবিত্র দন্ত বক্ষিত আছে। ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্য ক্যাণ্ডীর এই প্রসিদ্ধ দন্তমন্দিরটিও এক বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া দর্শন করিতে গমন করেন। ক্যাণ্ডীতে সম্বুদ্ধচৈতন্য পেরা-ডোনিয়ার বৃহৎ বোটানিক্যাল গার্ডেন পরিদর্শন কবেন। এই বাগান এশিয়াব মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দ। সোমবার।

কলিকাতার তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ দন্ত-চিকিৎসক ডাঃ আর. আমেদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের একটি দাঁত তুলিয়াছিলেন। স্বামিজী মহারাজের সেবক-শিষ্য ব্রহ্মচাবী সম্বুদ্ধচৈতন্য তখন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ডাক্তারখানা হইতে মোটরযোগে মঠে প্রত্যাবর্তনকালে সম্বুদ্ধচৈতন্য একসময় নীরবে তাঁহার দক্ষিণ হস্তখানি স্বামী অভেদা-নন্দের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া তাঁহার ঐ উৎপাটিত দন্তটি মনে মনে প্রার্থনা করিলেন। অন্তর্যামী গুরু, স্বামী অভেদানন্দ সেবক-শিষ্য সম্বুদ্ধচৈতন্যের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিবার কালে স্মিতহাস্যে বলিলেন, "তুই কি আমার দাঁতের মন্দির করবি?—সিংহলের ক্যাণ্ডীতে যেমন বুদ্ধদেবের দন্তমন্দির আছে।" ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্যের হৃদয়তন্ত্রীতে তখন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের শ্রীমুখের এই বাণী এক অপূর্ব ঝঙ্কার ও প্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছিল। উহাকে রূপদানেব সঙ্কল্প করিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য সেদিন ক্যাণ্ডীর বিশ্ববিখ্যাত দন্তমন্দিরটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিয়া-ছিলেন। পরবর্তীকালে হাওড়া জিলার বেলানগর গ্রামে তিনি

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বীয় গুরু স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর পবিত্র জন্মশতবার্ষিকী বৎসরে কালীতপস্বীর "পবিত্র দন্তমন্দির" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এইরূপ স্মৃতিমন্দির অদ্বিতীয় এবং সমগ্র বিশ্বে ইহা তৃতীয়রহিত।

সম্বুদ্ধচৈতন্য যখন মাদ্রাজ ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ একদিন চিদাম্বরম্ হইতে ট্রেনযোগে রামেশ্বর গমন করিবার কালে তিনি স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের দর্শন লাভ করেন। স্বামিজী মহারাজ তাঁহার প্রিয় সেবক-শিষ্য সম্বুদ্ধচৈতন্যকে দর্শন দান করিয়া বলেন, "রবি, তুই শীগ্‌গির চলে আয়।"

স্বামী অভেদানন্দের এইরূপ আদেশ প্রাপ্তির পর সম্বুদ্ধচৈতন্য তাঁহার মাদ্রাজ ভ্রমণ সংক্ষিপ্ত করিয়া অনতিবিলম্বে কলিকাতার পথে রওনা হইলেন। পথে তিনি ভিজগাপট্টম, ওয়াল্টেয়ার, সীমাচলমে নরসিংহ মন্দির, পুরী, ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, কোনারক প্রভৃতি স্থান দর্শন করিলেন। পুরী স্টেশনে সম্বুদ্ধচৈতন্য তদানীন্তন কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর (পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী) সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন।

কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য স্বামী অভেদানন্দকে তাঁহার ঐ পূর্বোক্ত ট্রেনে দর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে স্বামিজী মহারাজ বলিলেন, "হাঁ, ঐ দিন ঐ সময় আমি তোর কথা খুব ভাবছিলাম। আমি শিগ্‌গিরই জামসেদপুর যাচ্ছি।"

যোগীরা এইরূপ দেহ ধারণ করিতে পারেন। শাস্ত্রে ইহাকে নির্মাণকায় বলে। শ্যামপুকুরের বাড়ীতে রোগশয্যায় শায়িত ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও এইরূপ নির্মাণকায় ধারণ করিয়া মহাষ্টমী দিন সন্ধ্যায় সন্ধিপূজার সময় তাঁহার প্রিয় ভক্ত সুরেন্দ্রকে (সুরেশচন্দ্র মিত্র) মহামায়ার পূজামণ্ডপে দর্শন দান করিয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের প্রিয় সেবক-শিষ্য

সম্বুদ্ধচৈতন্য তাঁহার জীবনে অদ্যাবধি বহুবার স্বামিজী মহারাজের ঐরূপ দিব্যদর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের কয়েকদিন পরেই স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর সহিত সেবকশিষ্য সম্বুদ্ধচৈতন্য জামসেদপুর গমন করিলেন। ইহা ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের শীতকালের ঘটনা।

৮

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ। জুলাই মাস।

জামসেদপুর নিবাসী গৃহী গুরুভ্রাতা শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ গুহের নবনির্মিত বাড়ীতে গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পূজাদি করিবার জন্য ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্য কলিকাতা হইতে জামসেদপুব গমন করেন। জামসেদপুর গমনের পর সম্বুদ্ধচৈতন্য দ্বারকাধাম দর্শনের সঙ্কল্প করিলেন। তীর্থভ্রমণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিযা তিনি স্বীয় গুরু শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর অনুমতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া পত্র দিলেন। স্বামিজী মহারাজ তখন দার্জিলিং বেদান্ত আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। ২২শে জুলাই, ১৯৩৭ তারিখে স্বামিজী মহারাজ শিষ্যকে পত্রোত্তরে লিখিলেন,

"স্নেহের রবি,

তোর পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। তুই দ্বারকাধামে যাত্রা করিতেছিস্ জানিয়া সুখী হইয়াছি। আমার শুভাশীর্বাদ জান্‌বি এবং দ্বারকানাথকে আমার সভক্তি দণ্ডবৎ প্রণাম জানাবি। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

অভেদানন্দ।"

অতঃপর গুরুভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ গুহের গৃহপ্রবেশের পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া একদিন সম্বুদ্ধচৈতন্য জামসেদপুর হইতে ভ্রমণে বহির্গত

হইলেন। পথে তিনি নাগপুর, পঞ্চবটী, ত্র্যম্বকেশ্বর, অজন্তা, ইলোরা, হায়দ্রাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদ, বোম্বাই, পুণা, পাঞ্চগণি, মহাবালেশ্বর, প্রতাপগড় দুর্গ প্রভৃতি পরিদর্শন করেন।

পুণা, প্রতাপগড় দুর্গ প্রভৃতি স্থান ছত্রপতি শিবাজীর স্মৃতিবিজড়িত। দেশপ্রেমিক ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্য এই সকল স্থান দর্শন করিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিলেন। প্রতাপগড় দুর্গেই প্রবল পরাক্রান্ত মোঘল সেনাপতি আফজল খান্‌কে হত্যা করিয়া ছত্রপতি শিবাজী তাঁহার ছিন্নমুণ্ড মা ভবানীকে উপহার দিয়াছিলেন। এই প্রতাপগড় দুর্গের একটু নীচেই পর্বতগাত্রে আফজল খান্‌কে সমাধিস্থ করা হয়। সম্বুদ্ধচৈতন্য আফজল খানের সমাধিস্থানটিও দর্শন করেন।

কথিত আছে, শিবাজীর পূজায় পরিতুষ্ট হইয়া মা ভবানী স্বহস্তে তাঁহার ভক্ত শিবাজীকে একখানি তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। ভবানী পাহাড়ের উচ্চ শিখরে ভবানী দেবীর মন্দির অবস্থিত। এই পাহাড়েই আবার শিবাজী-গুরু সমর্থ রামদাস স্বামীর একটি স্মৃতিমন্দির আছে। সম্বুদ্ধচৈতন্য এই পাহাড় এবং মন্দির দুইটি পরিদর্শন করিলেন।

পাণ্ডারপুর স্থানটি যেন মহারাষ্ট্রের বৃন্দাবনধাম। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি বিগ্রহ আছে। কথিত আছে, শিবাজী মহারাজ তাঁহাব বাল্যকালে এই তীর্থস্থানটি দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র ভ্রমণকালে সম্বুদ্ধচৈতন্য পাণ্ডারপুরেও গমন করেন।

মহারাষ্ট্র হইতে সম্বুদ্ধচৈতন্য হায়দ্রাবাদ-সেকেন্দ্রাবাদ গমন করেন। তথা হইতে তিনি পুনঃ বোম্বাই প্রত্যাবর্তন করিয়া সুরাট, ব্রোচ, বরোদা পরিভ্রমণ করেন। অতঃপর তিনি ডাকুরে যাইয়া রণছোড়জীর মন্দির ও বিগ্রহ দর্শন করেন। রণছোড়জী শ্রীকৃষ্ণের এক নাম। 'রণ' অর্থাৎ যুদ্ধ এবং 'ছোড়জী' অর্থাৎ যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ একবার যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ

করিয়া এইস্থানে আগমনপূর্বক মুরলীধারীর মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহার নাম হইয়াছে "রণছোড়জী।" এই মুরলীধারী রণছোড়জী ছিলেন বৈষ্ণব সাধক শিরোমণি পরম সাধিকা শ্রীমতী মীরাবাঈয়ের ইষ্টমূর্তি, জীবনসর্বস্ব। এই রণছোড়জীর জন্যই চিতোরের রাজকুলবধূ মীরাবাঈ তাঁহার সংসারের সুখ ও রাজৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া সাধক সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

বুদ্ধদেব এবং মীরাবাঈয়ের মধ্যে একটি অদ্ভুত মিল দেখা যায়। একজন রাজপুত্র, অপরজন রাজবধূ। একজন জীবদুঃখে কাতর, অপরজন কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী। দুইজনের কাছেই "ভূমৈবসুখম্ নাল্পে সুখমস্তি", "ত্যাগেনৈকেনামৃতত্ত্বমানশুঃ।" মীরাবাঈ যেন কলিযুগে শ্রীরাধার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। দ্বাপরযুগে শ্রীমতী রাধা কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী হইয়া সংসারসুখ পরিত্যাগপূর্বক বৃন্দাবনের পথে পথে বেড়াইয়াছিলেন, কলিযুগে রাজবধূ মীরাবাঈও পরমপুরুষ সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে বিভোর হইয়া সংসারসুখ এবং রাজৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

রণছোড়জীর মন্দির দর্শন করিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য আবু পাহাড় গমন করেন। তথাকার জৈনমন্দির 'দিলোয়ারা' ভারতবিখ্যাত। মন্দিরটি শ্বেতপাথরে নির্মিত এবং উহার কারুকার্য নয়নমুগ্ধকর। ভারতের স্থাপত্য শিল্পে এই মন্দির অতুলনীয়।

'দিলোয়ারা' দর্শন করিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য গোমতী দ্বারকা, ভেট দ্বারকা, মূল দ্বারকা, ভেরোয়াল, সুদামাপুরী এবং প্রভাসতীর্থ দর্শন করিতে গমন করেন। প্রভাসতীর্থে দ্বাপর যুগাবতার পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। এইস্থান হইতে অনতিদূরে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র দেহ সংকার করা হইয়াছিল। ভক্তিনম্রচিত্তে সম্বুদ্ধচৈতন্য এইস্থান দুইটি দর্শন করিলেন। তিনি প্রভাসতীর্থে সকল কিছু এবং সোমনাথ মন্দিরও পরিদর্শন করেন।

প্রভাসতীর্থ হইতে সম্বুদ্ধচৈতন্য গীর্ণার পর্বত দর্শন করিতে গমন

করেন। এই পর্বতটি চারি সহস্র ফুট উচ্চ। পর্বতশীর্ষে গুরু দত্তাত্রেয়ের পাদুকা রক্ষিত আছে। সম্বুদ্ধচৈতন্য এই পাদুকা দর্শন ও প্রণাম করিলেন। গুরু দত্তাত্রেয় রচিত এই শ্লোকটি তখন সম্বুদ্ধচৈতন্যের স্মৃতিপথে উদিত হইল,—

"গুণদোষ বিবর্জিত তত্ত্বমসি। সুখদুঃখ বিবর্জিত তত্ত্বমসি॥
যদি গগনোপম তত্ত্বমসি। কিমুবোদসি মানসি সর্বং শিবম্॥"

অত্রি মুনির স্ত্রী অনসূয়া ছিলেন পরমসতী। এই মহীয়সী রমণীর সতীত্ব পরীক্ষার জন্য এক দিবস স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর তিন অতিথির ছদ্মবেশ ধারণপূর্বক তাঁহার কুটীরে আগমন করেন। তাঁহারা সতী অনসূয়ার নিকট ভিক্ষা চাহিলেন। অত্রিপত্নী অনসূয়া তাঁহাদিগকে ভিক্ষা দান করিতে গেলে তাঁহারা বলিলেন যে অনসূয়া যদি তাঁহাদিগকে বিবসনা হইয়া ভিক্ষা দান করেন, তবেই তাঁহারা ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন, অন্যথায় নহে। সতী অনসূয়া মহাবিপদে পড়িলেন। একদিকে অতিথি-নারায়ণ ভিক্ষা না লইয়া ফিরিয়া যান, অপরদিকে এই সকল পরপুরুষের সমক্ষে বিবসনা হইলে তাঁহার সতীত্ব রক্ষা পায় না। অনসূয়া ধ্যানে জানিলেন এই ছদ্মবেশী অতিথি কাহারা! তিনিও তখন তাঁহার সতীত্বের তেজে ছদ্মবেশী অতিথি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর, তিন জনকেই জল সিঞ্চন করিয়া তিনটি অজ্ঞান শিশুতে পরিণত করিলেন এবং তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী বিবসনা হইয়াই তাঁহাদিগকে আহার্য প্রদান করিলেন। অজ্ঞান শিশুদিগের নিকট বিবসনা হইয়া আহার্য দেওয়ায় অনসূয়ার সতীত্বও রক্ষা পাইল এবং অতিথেয়তা ধর্মও পালিত হইল।

অতঃপর অনসূয়া ব্রহ্মার স্ত্রী সাবিত্রী, বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী এবং মহেশ্বরের স্ত্রী পার্বতীর সতীত্ব পরীক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে তথায় আনয়ন করিলেন এবং নিজ নিজ পতি নিবার্চন করিয়া লইতে বলিলেন। শিশু তিনটির মধ্যে কে যে কাহার স্বামী সাবিত্রী,

লক্ষ্মী এবং পার্বতী তাহা চিনিতে পারিলেন না। ঐ তিনটি শিশুর চেহারা একই রকম। তাঁহারা তখন সতী অনসূয়াকে অনুবোধ করিলেন, শিশুদিগকে তাঁহাদের পূর্বাবস্থায় রূপান্তরিত করিয়া দিতে। শেষপর্যন্ত তাঁহাদের অনুবোধে সতী অনসূয়া শিশু তিনটিকে তাঁহাদেব পূর্বাবস্থায় রূপান্তরিত করিয়া দিলেন।

সতীত্ব পরীক্ষায় অনসূযা সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া দেবতাত্রয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহাকে বর দান করিলেন যে তাঁহাবা সতী অনসূয়াব গর্ভে তাঁহাব পুত্রসন্তানরূপে জন্ম গ্রহণ কবিবেন। অতঃপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্ববেব অংশে অনসূয়াব এক মহাধার্মিক পুত্র জন্মগ্রহণ কবিল। এই সন্তান দেবতাত্রযের প্রদত্ত, এইজন্য সতী অনসূযা পুত্রের নাম রাখিলেন দত্তাত্রেয। দত্তাত্রেয় আজন্ম ব্রহ্মচাবী ছিলেন। পববর্তীকালে তিনি সন্ন্যাসী অবধূতের ধর্ম গ্রহণ কবিযা সংসাব ত্যাগ কবেন।

অতঃপব সম্বুদ্ধচৈতন্য বাজপুতনায় বিকানীর, জয়পুব, আজমীব, পুষ্কব সাবিত্রীতীর্থ, চিতোব, নাথদোয়ারা, বৃন্দাবন, মথুবা, আগ্রা, ফতেপুরসিক্রি প্রভৃতি স্থান দর্শনপূর্বক পাঞ্জাব হইয়া পেশোয়ার গমন কবেন। নাথদোয়ারা স্থানটি কৃষ্ণপ্রেমিকা মীবাবাঈয়ের স্মৃতিবিজডিত। তিনি এখানে থাকিয়া কিছুকাল এক মন্দিরে তাঁহার জীবনদেবতা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়াছিলেন।

পেশোয়ার হইতে সম্বুদ্ধচৈতন্য সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত হায়দ্রাবাদ গমন করেন।

এখানে সেণ্ট টি. এল. ভাসানি প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট মীরা গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের নিকট তিনি একদিন শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে হিন্দীতে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি ক্ষুদ্র হইলেও বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছিল। সম্বুদ্ধচৈতন্যের এই বক্তৃতা শ্রবণে সেণ্ট ভাসানি বিশেষ মুগ্ধ ও প্রীত হইয়াছিলেন।

সিন্ধুর হায়দ্রাবাদ হইতে সম্বুদ্ধচৈতন্য করাচী গমন করেন। তথায় তিনি ডঃ এস্, এস্. মুখার্জীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। ডঃ মুখার্জী তখন তাঁহার বাড়ীতে একাই থাকিতেন। করাচীতে আসিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন। তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। তখন তিনি চিকিৎসার জন্য করাচী রামকৃষ্ণ মিশনে গমন করেন। অসুস্থ সম্বুদ্ধচৈতন্যকে তখন উক্ত রামকৃষ্ণ মিশনের গঙ্গাধর মহারাজ এবং অধ্যক্ষ স্বামী শর্বানন্দ মহারাজ খুব সেবাযত্ন করেন। তাঁহাদের অপরিসীম সেবায় সম্বুদ্ধচৈতন্য অচিরে রোগমুক্ত হইলেন। সম্বুদ্ধচৈতন্য এখনও এইজন্য তাঁহাদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

যাহা হউক, করাচী হইতে সম্বুদ্ধচৈতন্যের পুণ্যতীর্থ হিংলাজ গমনের অভিপ্রায় ছিল। মরুতীর্থ হিংলাজ। ইহা একটি পীঠস্থান। সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র এই স্থানে পতিত হইয়াছিল। করাচী হইতে মরুভূমি অতিক্রম করিয়া পদব্রজে কিংবা উষ্ট্রপৃষ্ঠে এই মহাতীর্থে গমন করিতে হয়। শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায় এবং উপযুক্ত সঙ্গী-সাথী না পাওয়ায় সম্বুদ্ধচৈতন্য শেষপর্যন্ত হিংলাজ গমনের অভিপ্রায় ত্যাগ করেন।

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে সম্বুদ্ধচৈতন্য ব্রহ্মদেশ হইতে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের জন্য বুদ্ধদেবের একটি মর্মর-মূর্তি এবং একটি গং (বৃহৎ ঘণ্টা বিশেষ) আনয়ন করিয়াছিলেন। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের পবিত্র বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধদেবের পুণ্য জন্ম-তিথিতে সম্বুদ্ধচৈতন্যের উদ্যোগে কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে সাড়ম্বরে বুদ্ধোৎসব পালন করা হয়। এই পবিত্র বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতেই বুদ্ধদেব কপিলাবস্তুর লুম্বিনী উদ্যানে জন্মগ্রহণ করেন, উরুবিল্বের বোধিবৃক্ষের নিম্নে তপস্যা করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করেন এবং কুশীনগরে অশীতি বৎসর বয়সে মহানির্বাণ লাভ করেন।

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজী এই জন্যই এই দিনটিকে "Thrice blessed day" বলিয়া অভিহিত করিতেন। তিনি তদীয় প্রিয় সেবক-শিষ্য সম্বুদ্ধচৈতন্যের অপরিসীম বুদ্ধভক্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুই চিরদিন বুদ্ধ'উৎসব করিস্।" তদবধি সম্বুদ্ধচৈতন্য প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সাড়ম্বরে এই উৎসব পালন করিয়া আসিতেছেন।

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে যখন এই উৎসব প্রথম পালিত হয়, স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজী তখন দার্জিলিং অবস্থান করিতেছিলেন। তথা হইতে এই উৎসব উপলক্ষে তিনি কলিকাতায় সেবক-শিষ্য সম্বুদ্ধচৈতন্যকে উৎসাহিত এবং তাঁহার এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করিয়া একটি বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন। এখনও প্রতি বৎসর সম্বুদ্ধচৈতন্য যখন তৎপ্রতিষ্ঠিত বেলানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে সাড়ম্বরে বুদ্ধোৎসব পালন করেন, তখন সর্বাগ্রে স্বামিজী মহারাজের উক্ত ভাবগম্ভীর আশীর্বাণী পত্রখানি ভক্তিবিনম্রচিত্তে পাঠ করা হইয়া থাকে।

A message from Swami Abhedananda.

On this Baishakhi Purnima we have gathered herei to celebrate the thrice blessed day in the life of Prince Siddharta Gautama Buddha whose glorious advent was to help the suffering humanity towards the attaninment of freedom from the evils of birth, disease and death in this mundane world (পার্থিব জগৎ) and to lead mankind in the path of righteousness (ধর্ম).

On this memorable day we should medidate (ধ্যান করা) upon his great renunciation (ত্যাগ), his severe penance (পাপক্ষয়ার্থে কৃচ্ছ্রসাধন) and austerities (তপস্যা) with firm determination to

achieve the highest goal of Nirvana, his grand success and realisation of Buddhahood (সম্বুদ্ধত্ব) under the bowing branches of the Bodhi tree and his Parinirvan (পরিনির্বাণ) at the ripe old age of eighty after starting the Dharma-chakra (ধর্মচক্র) and establishing the fundamental principles and four noble truths of his Faith in the hearts of his sincere devotees and followers.

To day, we should prostrate (ভূমিতে শায়িত হওয়া) at the holy feet of our Lord Buddha, offer our humble salutation and remember his teachings for peace, good will, universal brotherhood (বিশ্বপ্রেম), compassion (করুণা) for all living creatures and non-injury (অহিংসা) to all animals in thought, word and deed ; and repeat—

ত্রিশরণং—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ধর্মং শরণং গচ্ছামি ॥ সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি ॥।

ওঁ মণিপদ্মে হুঁ। ওঁ মণিপদ্মে হুঁ ॥ ওঁ মণিপদ্মে হুঁ ॥।

"ওঁ নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স ইতি পি সো ভগবা অয়হং সম্মা সম্বুদ্ধ বিজ্জাচয়ণ সম্পন্ন সুগতো লোক বিদু অনুত্তো য়ো পরিশ ধম্মা সারথি সখা দেবঃ মনুষ্যানাং বুদ্ধো ভগবতি।"

সম্বুদ্ধচৈতন্য যতদিন কলিকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে অবস্থান করিয়াছিলেন, ততদিন এই বুদ্ধোৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর জনসমাবেশে বুদ্ধদেবের বাণী ও জীবনী আলোচনা করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ও অন্যান্য মনীষীদিগকে বেদান্ত মঠে আমন্ত্রণ করা হইত। বস্তুতঃ বাংলাদেশে তখন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বাহিরে অপর কেহ বা অপর কোন প্রতিষ্ঠান এত জাঁকজমক করিয়া এই প্রকার বুদ্ধোৎসব পালন

করিত না। এই উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়, পালি-ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া, শান্তিনিকেতনের স্বনামধন্য পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু, ডক্টর নলিনাক্ষ্য দত্ত প্রভৃতি বিভিন্ন বৎসর সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।*

কলিকাতাস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের এই বুদ্ধোৎসবে একবার ভারতের মুক্তিসংগ্রামে উৎসর্গীকৃত প্রাণ দেশগৌরব শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ দানের জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তাঁহার সহিত তখন তদীয় অনুচর শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বক্সী এবং শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলও বেদান্ত মঠে আগমন করিয়াছিলেন। সেদিন দেশগৌরব শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু যখন ঐ উৎসবে ভাষণ দিতেছিলেন তখন বেশ বৃষ্টি নামিয়াছিল। দেশ-গৌরব সুভাষচন্দ্রের মাথায় ছাতা ধরা হইলে তিনি উহাতে আপত্তি করেন এবং বৃষ্টি সত্ত্বেও ভাষণ বন্ধ করিলেন না। সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ যখন বৃষ্টিতে ভিজিতেছিল, তখন তিনি উৎসবের প্রধান অতিথি হইয়াও ছাতা মাথায় ধরিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। নানাবিধ রাজনৈতিক কাজের চাপের মধ্যেও দেশগৌরব শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সেদিন সম্বুদ্ধচৈতন্যের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।

দেহত্যাগের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তদীয় সংসার ত্যাগী শিষ্যবর্গকে সস্নেহে বলিতেন, "আমার কাছে তোরা সব শিখে নে। আমি চলে গেলে কে তোদের এমন

---

* এই সম্পর্কে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু ও সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

করে আমার মত শেখাবে?” এই সময়ে ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্য স্বামিজী মহারাজের নিকট বিভিন্ন শাস্ত্রের জটিল ব্যাখ্যাসমূহ, সাধনভজনের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ জানিয়া লইতে লাগিলেন। সম্বুদ্ধ-চৈতন্য যখন গভীর রাত্রিতে স্বামিজী মহারাজের সেবা করিতেন তখন সর্বজ্ঞ গুরু তাঁহার একনিষ্ঠ সেবক শিষ্যকে দিনের পর দিন মুখে মুখেই নানা বিষয়ে শিক্ষা দান করিতেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর কাছেই সম্বুদ্ধচৈতন্য বিজ্ঞান, দর্শন, দেহতত্ত্ব (Anatomy), শরীরবিজ্ঞান (Physiology), সংস্কৃত, সৃষ্টিতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস, আধুনিক পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যজাতির ইতিহাস, খ্রীস্টধর্ম, ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য, উপনিষদ প্রভৃতি নানা বিষয়ে মুখে মুখে শিক্ষালাভ করেন। স্বামিজী মহারাজ ক্লান্তিহীনভাবে প্রত্যহ রাত্রিতে রীতিমত এই সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়া সেবক শিষ্য সম্বুদ্ধচৈতন্যকে তাঁহার ভাবী জীবনের জন্য উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। সম্বুদ্ধ-চৈতন্যকে দেখিয়া স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ প্রায়শঃ বলিতেন, “তোকে দেখ্‌লে আমার বড় আনন্দ হয়।” স্বামিজী মহারাজের এই উক্তিটি বিশেষ অর্থপূর্ণ এবং ইঙ্গিতপূর্ণও বটে।

এই প্রকারে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তদীয় শিষ্য সম্বুদ্ধ-চৈতন্যের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন এবং গুরুগতপ্রাণ যোগী শিষ্যও নির্বিকার চিত্তে অক্লেশে সেই মহাশক্তির মহাবেগ নিজের মধ্যে সংহত করিয়া রাখিতেন। এই শক্তির বেগ ও প্রচণ্ডতা যে কত প্রবল, তাহার পরিচয় ও প্রমাণ পাওয়া যায় সম্বুদ্ধচৈতন্যের পরবর্তী জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর মাধ্যমে।

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের শীতকালে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ জামসেদপুর গমন করেন। সেবকশিষ্য সম্বুদ্ধচৈতন্য তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। স্বামিজী মহারাজ এইবার জামসেদপুরের এল্‌ রোডে এক

বাটিতে উঠিয়াছিলেন। স্বামিজী মহারাজ ঐ বাড়ীতে সমবেত স্বীয় শিষ্য ও শিষ্যাদিগকে দেখিয়া সানন্দে বলিয়া উঠেন, "আজ এখানে আমার চাঁদের হাট বসেছে।" এমনই ছিল স্বামিজী মহারাজের শিষ্য স্নেহ! এমন অনেক লোকও আছেন, যাঁহারা সারা জীবনে মাত্র এক মুহূর্তের জন্য স্বামিজী মহারাজের পুণ্যসঙ্গ লাভ করিয়াও তাঁহার অপার স্নেহে এমনই অভিভূত হইয়াছেন যে, তাঁহারা মনে করেন যে এই পৃথিবীতে স্বামিজী মহারাজই বোধহয় তাঁহাদিগকে সর্বাধিক স্নেহ করেন।

ঐ বৎসর স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ যখন জামসেদপুরের এল্ রোডস্থ বাড়ী হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন, তখন মোটরে উঠিবার প্রাক্কালে তিনি তথায় সমবেত ভক্তবৃন্দকে উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে স্বীয় দক্ষিণ হস্তের তর্জনীটি আন্দোলিত করিতে করিতে বিশেষ জোরের সহিত বলিয়াছিলেন, "আমার সঙ্গে তোমাদের আর দেখা হোক বা না হোক, তোমরা সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরকে ধরে থাকবে। তিনি তোমাদের জীবনের আদর্শ। সংসার জ্বালাময়। কাম, ক্রোধ, লোভকে দমন করে চরিত্র গঠন করবে। খুব জপ, ধ্যান, প্রার্থনা করবে। তাঁকে স্মরণ-মনন করবে। তিনিই সুখ ও শান্তিদাতা! তোমরা আমার এ উপদেশ মনে রাখবে।

ইহার পর সত্যসত্যই স্বামিজী মহারাজের আর জামসেদপুর যাওয়া হয় নাই।

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ। স্বামী অভেদানন্দ তখন কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে বাস করিতেছিলেন। ঐ বৎসরের কোন এক সময় চীন দেশ হইতে কতিপয় চৈনিক সাধু স্বামী অভেদানন্দের নিকট আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত শান্তিনিকেতনের চীনা-ভবনের অধ্যাপক তান্ ইয়েন্ সান্‌ও ছিলেন। তাঁহারা স্বামী অভেদানন্দের নিকট এমন একজন যোগীর সন্ধানে আসিয়াছিলেন,

যিনি তাঁহাদের সহিত চীনে যাইয়া তথাকার জনসাধারণকে যোগশিক্ষা দিতে পারেন।

এই সকল চৈনিক সাধুর নিকট স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার সেবক-শিষ্য সম্বুদ্ধচৈতন্যের পরিচয় প্রদান করিয়া বলেন, "He is a great yogi. (ইনি একজন মহাযোগী) আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতিতে ইনি বিশেষ পারদর্শী।"

তখন চীনে যুদ্ধ চলিতেছিল। চীন-জাপানের যুদ্ধ। চীনে যোগী প্রেরণ সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দ তাঁহাদিগকে বলিলেন, "এখন আপনাদের দেশে যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ থামলে দেখা যাবে।"

তাঁহারা বিফলমনোরথ হইয়া চলিয়া গেলেন। পরে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সম্বুদ্ধচৈতন্যকে একা পাইয়া বলিলেন, "কি রে রবি! চীনে যাবি? আমি তোকে চীনে পাঠাতে পারি।"

সম্বুদ্ধচৈতন্য নীরব রহিলেন।

স্বামিজী মহারাজ কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "না, থাক! তোর চীনে যেয়ে কাজ নেই। তোর মা আছেন। মা যদ্দিন আছেন, তুই দূরদেশে যাবিনে। বুঝলি?"

চৈনিক সাধুরা সম্বুদ্ধচৈতন্য মহারাজের যোগাসনের ৫০ খানি ফটো লইয়া যায়।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর দেহত্যাগের দুই বৎসর পূর্ব হইতে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে প্রত্যহ রাত্রি বারোটা একটা হইতে রাত্রি তিনটা সাড়ে-তিনটা পর্যন্ত তাঁহার সমস্ত ত্যাগী সন্তানদিগকে লইয়া তিনি ক্লাস করিতেন। সম্বুদ্ধচৈতন্য ঐ সকল ক্লাসে যথারীতি যোগদান করিতেন। ঐ ক্লাস সমূহে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ স্বরচিত পুস্তকাবলীর পাণ্ডুলিপিগুলি একের পর এক পড়িয়া শোনাইতেন এবং প্রয়োজন বোধে স্থানে স্থানে উহাদিগকে সংশোধন করিতেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে কাহারও

কোন বিষয় কষ্টবোধ্য হইলে তিনি সযত্নে তাঁহাকে উহা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। এই প্রকারে রাত্রির পর রাত্রি স্বামিজী মহারাজ স্বরচিত পুস্তকাবলী সংশোধন করিয়া মুদ্রণের উপযুক্ত করিতেছিলেন। তিনি যে এই প্রকারে ভিতরে ভিতরে মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখনও কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই।

৯

র

৫ই আশ্বিন, ১৩৪৫ সন, বৃহস্পতিবার।

নগেন মহারাজ, শম্ভু মহারাজ প্রভৃতি পাঁচজনকে স্বা ঐ অভেদানন্দ মহারাজ সন্ন্যাস দান করিলেন। রাত্রিতে যথাশাঃ বিরজা হোম করিয়া তাঁহাদিগকে সন্ন্যাস দেওয়া হইল।

সম্বুদ্ধচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও স্বামী অভেদানন্দ তাঁহাকে তখন সন্ন্যাস দীক্ষা দিলেন না। "তোর মা আছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে তাঁর অনুমতি প্রয়োজন।" এই কথা বলিয়া তিনি সম্বুদ্ধচৈতন্যকে নিরস্ত করিলেন। সম্বুদ্ধচৈতন্য তখন সন্ন্যাস না পাইলেও কিন্তু সর্বক্ষণ স্বামিজী মহারাজের আশে পাশেই রহিলেন। তাঁহার সম্মুখেই স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার ঐ পাঁচজন শিষ্যকে সন্ন্যাসের যাবতীয় নিয়মবিধি প্রদান করিলেন।

পরদিবস ব্রাহ্মমুহূর্তে সন্ন্যাসপ্রাপ্ত গুরুভ্রাতৃগণ গঙ্গাস্নান করিয়া যখন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে প্রণাম ও গুরুদক্ষিণা প্রদান করিলেন, তখন স্বামিজী মহারাজ নিকটে দণ্ডায়মান সেবক-শিষ্য সম্বুদ্ধচৈতন্যকে সস্নেহে বলিলেন, "এবার আমাকে তোর আবদার রক্ষা করতে হবে।"

কিছুক্ষণ পরে তিনি তাঁহাকে পুনরায় সহাস্যে বলিলেন, "তা তোরও একরকম সব হয়ে গেল। তুই লুকিয়ে সব মন্তর শুনে নিলি।"

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের এই ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্য শ্রবণে সম্বুদ্ধচৈতন্য আনন্দে আত্মহারা হইলেন। অন্যান্য সকলের ন্যায়

তিনিও শ্রীগুরুদেবকে বস্ত্র, ফল এবং গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজও শিষ্যের এই ব্যবহারে পরম পরিতুষ্ট হইয়া সেদিন স্বহস্তে সম্বুদ্ধচৈতন্যকেও গেরুয়া প্রদান করিলেন। গেরুয়া বস্ত্র সন্ন্যাসের প্রতীক। মহাশিষ্যকে মহাগুরু গেরুয়া প্রদানপূর্বক ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন, "এখন শুধু তোর নামটা বাকি রইল।"

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর দার্জিলিং হইতে কলিকাতা ত্যাবর্তনের পথে বাতাসিয়া লুপে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এক ন দুর্ঘটনায় পতিত হন। ইহার পর হইতেই তাঁহার শরীর সুস্থ াইতেছিল না এবং স্বাস্থ্যও ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। এই ট্রেন দুর্ঘটনার পর তিনি কলিকাতা পৌঁছিয়া সম্বুচৈন্যকে বলিয়াছিলেন, "আমি দার্জিলিং হতে অগস্ত্য যাত্রা করে এসেছি।" বস্তুত ইহার পর স্বামিজী মহারাজ আর দার্জিলিং গমন করেন নাই এবং তিনি আর মাত্র এক বৎসর এগার মাস কাল মর্ত্যকায়ায় বিদ্যমান ছিলেন। মহাকালের ইঙ্গিত তিনি ধরিতে পারিয়াছিলেন। তিনি যেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন-নাট্যের শেষ দৃশ্য এইবার অভিনীত হইবে, তাঁহাব মহাযাত্রার মহালগ্ন সমাগত। তাড়াতাড়ি করিয়া তিনি তাঁহার আরব্ধ কর্মগুলি একে একে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। সম্বুদ্ধচৈতন্যও এই এক বৎসর এগার মাস কাল ছায়ার ন্যায় সর্বদা শ্রীশ্রীগুরুদেবের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে লাগিলেন।

এই সময় হইতে পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ স্বীয় ব্যক্তিগত সেবার জন্য তাঁহার একনিষ্ঠ সেবক-শিষ্য সম্বুদ্ধচৈতন্যকে সর্বক্ষণ তাঁহার কাছে কাছে রাখিতেন,—এক রাত্রির জন্যও তাঁহাকে অন্য কোন স্থানে যাইতে দেন নাই। সম্বুদ্ধচৈতন্যও এই এক বৎসর এগার মাস কাল প্রাণভরিয়া তদীয় শ্রীশ্রীগুরুদেবের সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন। সম্বুদ্ধচৈতন্যের আন্তরিক সেবা ব্যতীত অপর কাহারও সেবা স্বামী অভেদানন্দজীর পছন্দ হইত না।

ঐ সময় জামসেদপুরের শ্রীবীরেন্দ্রনাথ হাজরা মহাশয় একবার স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে দেখিতে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে আসিয়াছিলেন। তিনি তদীয় গুরুভ্রাতা সম্বুদ্ধচৈতন্যকে কয়েক দিনের জন্য তাঁহার সহিত জামসেদপুর লইয়া যাইতে চাহিলেন। বিষয়টি স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কর্ণগোচর হইলে তিনি শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ হাজরাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বীরেন্, আমি অসুস্থ। রবি গেলে আমার সেবার অসুবিধে হবে। তোমরা কি আমার অসুবিধে চাও ?"

অতঃপর স্বামিজী মহারাজের এই কথায় বীরেনবাবু তাঁহার ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন।

"আমি অসুস্থ। রবি গেলে আমার সেবার অসুবিধা হবে।" —স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মুখনিঃসৃত এই কয়েকটি মাত্র কথায় সহজেই অনুমান করা যায় যে সেবক-শিষ্য সম্বুদ্ধচৈতন্যের ঐকান্তিক সেবার উপর স্বামিজী মহারাজ কতখানি নির্ভর করিতেন এবং ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্যও কতখানি তদ্গতপ্রাণ হইয়া পরম নিষ্ঠার সহিত স্বীয় আচার্যদেবের সেবাশুশ্রূষা করিতেন। বস্তুতঃ এই এক বৎসর এগার মাস কাল ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্যের নিকট এই গুরু সেবাই ছিল তাঁহার একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান ও তপস্যা !

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এক সময় স্বীয় সেবক-শিষ্য সম্বুদ্ধচৈতন্যকে উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "গুরুকে সর্বস্ব জ্ঞান করতে হয়, তবেই শক্তি সঞ্চার হয়। শিষ্যকে গুরুর নিকট শক্তি চাইতে হয় না, আপনিই শিষ্যের মধ্যে flowing (প্রবাহিত) হয় তার ভক্তির জোরে। শিষ্য মন-প্রাণ ঢেলে গুরুর সেবা ও আজ্ঞা পালন করবে। গুরু ও বেদান্তবাক্যে যার শ্রদ্ধা আছে, তারই জ্ঞান হয়। শঙ্করাচার্য তাঁর এক শিষ্যের ভিতরে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। সেই শিষ্য প্রাণমন ঢেলে তাঁর সেবা করত, আজ্ঞা পালন করত। সে কিন্তু শঙ্করাচার্যের নিকট শক্তি চায়নি।

লাট্টু ভাইতো মূর্খ ছিলেন। তাই বলে কি ঠাকুর তাঁকে কৃপা করেন নি?"

বোধহয় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের এই কথা কয়টির মধ্যেই গুরুগত প্রাণ সম্বুদ্ধচৈতন্য তাঁহার গুরুসেবার যাবতীয় প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের উল্লিখিত উক্তির মর্মার্থ অনুধাবন করিলে আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, পরমগুরু স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর গুরুশক্তি নিশ্চয়ই তাঁহার গুরুগত-প্রাণ একনিষ্ঠ সেবক-শিষ্য সম্বুদ্ধচৈতন্যের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইয়াছে এবং এই গুরুশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়াই তিনি পরবর্তীকালে শত সহস্র ত্রিতাপদগ্ধ নরনারীর মনে শান্তি-বারি সিঞ্চন করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাঁহার তপঃ-ক্ষেত্র এক অজ্ঞাত অখ্যাত নগণ্য গ্রামকে আজ জগদ্বিখ্যাত মহাতীর্থে পরিণত করিয়াছেন।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার সেবক-শিষ্য সম্বুদ্ধচৈতন্যকে কেবলমাত্র তাঁহার একনিষ্ঠ গুরুভক্তি ও ঐকান্তিক গুরুসেবার জন্যই স্নেহ করিতেন না। সম্বুদ্ধচৈতন্যের শিশুসুলভ সরলতাও তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। একদিবস স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ কথাপ্রসঙ্গে সম্বুদ্ধচৈতন্যকে বলিয়াছিলেন, "তুই খুব সরল। তুই সরল বলেই তোকে আমি এত ভালবাসি। আমি খুব সরল ছিলাম বলে ঠাকুরও আমাকে খুব ভালবাসতেন।"

২০শে ভাদ্র, বুধবার; ইংরাজী ১৯৩৯ সন। জন্মাষ্টমী তিথি।

সেদিন কলিকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষ এবং কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিস্টার শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী অসুস্থ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে দেখিতে আসিয়াছিলেন।

স্বামিজী মহারাজ তাহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। শৈলেন্দ্রনাথকে তিনি বলিলেন, "আপনার সঙ্গে বহুদিন পর দেখা।"

শৈলেন্দ্রনাথ ইহাতে কুণ্ঠিত হইয়া স্বামিজী মহারাজকে করজোড়ে বলিলেন, "মহারাজ, আমি আপনাদের সেই শৈলই আছি।"

ব্যারিস্টার শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বহুকালাবধি স্বামী অভেদানন্দের বিশেষ পরিচিত। সেইজন্যই তিনি স্বামিজী মহারাজের ঐরূপ সাদর সম্ভাষণে বিশেষ কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের অসুস্থতার কথা উঠিল। তিনি তাঁহাদিগকে কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের আমার দ্বারা যে যে কাজ করাবার ছিল, তা করিয়েছেন। এখন আর আমার কোন কাজ নাই। এখন এ দেহ থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি। আমি যাত্রা করে বসে আছি। ঠাকুর যখনই ডাকবেন, তখনই চলে যাব।"

ইহা শুনিয়া ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সে কি মহারাজ! আপনি আমাদের মাথার মণি! আপনারতো এখনও কাজ বাকি আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনাকে দিয়ে কত কাজ করাবেন।"

স্বামিজী মহারাজ সস্নেহে তাঁহাদিগকে বলিলেন, "দেখুন, তাঁর কি ইচ্ছা!"

অতঃপর স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহাদের সহিত স্বীয় জীবনের অনেক স্মৃতিকথাই বলিলেন। এক সময় বোধহয় তাঁহার কি মনে পড়িল। তিনি ব্যারিস্টার শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে বলিলেন, "শৈলেন, তোমার মনে আছে? তোমার মা আমাকে 'কালী মা' বলে ডাকতেন।"

দিগ্বিজয়ী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ যেন ক্রমশঃ অন্তর্মুখী হইয়া পড়িতেছেন। আজকাল সমস্ত বিষয়েই তাঁহার মধ্যে শিশুসুলভ একটি নিরাসক্ত ভাব প্রকট হইয়া উঠিতেছে। সর্বক্ষণের সেবক-শিষ্য সম্বুদ্ধচৈতন্য ইহা দেখেন আর

গোপনে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অশ্রুবিসর্জন করেন। অভেদানন্দহীন জীবন তিনি যে কল্পনাও করিতে পারেন না। স্বামী অভেদানন্দই যে তাঁহার গুরু-ইষ্ট-জীবনসর্বস্ব!

২২শে ভাদ্র, শুক্রবার; ইংরাজী ১৯৩৯ সন।

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের দেবোত্তর সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র লইয়া ব্রহ্মচারী বসন্ত আসিয়াছেন। স্বামী অভেদানন্দ দলিলে স্বাক্ষর করিলেন এবং নূতন ঘরের বিষয়ে বিভিন্ন নির্দেশ দান করিলেন। অতঃপর তিনি উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এখন তোমরা সব দেখেশুনে কর। আমায় আর বিরক্ত করোনা।"

ওপারের ডাক তিনি শুনিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামিজী প্রভৃতি যেন তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন! এপারের খেলা আর তাঁহার ভাল লাগেনা। তাঁহার আচারে-ব্যবহারে, কথাবার্তায় এই বিরক্তিই যেন ফুটিয়া উঠে! সম্বুদ্ধচৈতন্য নীরবে শ্রীরামকৃষ্ণের অবশিষ্ট এই শেষ সন্তানের অন্তিম জীবনের লীলাভিনয় দুই চক্ষু ভরিয়া দর্শন করেন এবং আসন্ন বিরহশোকে অশ্রুমোচন করেন।

সম্বুদ্ধচৈতন্য এই সময় একদিন তিনখানি ফটোতে স্বামী অভেদানন্দের স্বাক্ষর করাইয়া রাখিলেন। ফটোগুলির প্রথমখানি ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের, দ্বিতীয়খানি শ্রীশ্রীমায়ের এবং তৃতীয়খানি কালীতপস্বীর।

১৬ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার; ১৩৪৫ সন।

সেবক-শিষ্য সম্বুদ্ধচৈতন্য সম্মুখে বসিয়া স্বামিজী মহারাজের আহারের তদারক করিতেছেন। স্বামিজী মহারাজ রাত্রিকালীন আহার করিতে করিতে কিছুটা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে

বলিলেন, "আমার কোন বাসনা নাই। এই আশ্রম শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে দেবোত্তর করে দিয়েছি। এখন সব তাঁর। আমার আর কোন আশ্রম করা, কি অন্য কোন কাজ করা, সে বাসনা নাই। বাসনা থাকলেই জন্মাতে হবে। এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের যদি এ শরীরকে দিয়ে তাঁর কাজ করবার উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে আমাকে তিনি বাঁচিয়ে রাখবেন, আর তা' না হলে মেরে ফেলবেন। তিনি যা করবেন, তাই হবে। আমার নিজের কোন ইচ্ছা নাই। এখন আমার ভাব হচ্ছে, "প্রভু ম্যাঁয় গোলাম, ম্যাঁয় গোলাম তেরা।"

সম্বুদ্ধচৈতন্য বুঝিলেন, স্বামিজী মহারাজের ইহ জীবনের কার্য সমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদের লীলাখেলা শেষ। এখন পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের অসীম অনন্ত মহাশূন্যে পক্ষবিস্তার করিতে যা' বিলম্ব। সম্বুদ্ধচৈতন্যের চক্ষে জল আসিল। সেই সমাসন্ন নিদারুণ ভবিষ্যতে অভেদানন্দহীন নিরানন্দ জগতে একা তিনি কি অবলম্বন করিয়া থাকিবেন, সম্বুদ্ধচৈতন্য নীরবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অন্তর্যামী শ্রীশ্রীগুরুদেব যেন গুরুগতপ্রাণ শিষ্যের মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সম্বুদ্ধচৈতন্যকে বলিলেন, "রবি, অনেক দেশভ্রমণ তো করে দেখলি। এবার অন্তর্জগতে ডুব দে! সাধন ভজন কর। বল-বুদ্ধি-ভরসা, তিন ফুরুলেই ফরসা।"

দেশগৌরব শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর আকাঙ্ক্ষা হইল বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জ্বলকারী এই জাতীয় নেতাকে একবার দর্শন করেন। স্বামিজী মহারাজের শরীর তখন এতই অসুস্থ যে তিনি মঠেই থাকেন, কোথায়ও যাতায়াত করেন না। দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র

বসুকে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের আকাঙ্ক্ষার কথা জ্ঞাপন করা হইল।

একদিবস সন্ধ্যার পর রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বক্সীকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে আসিয়া স্বামিজী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সুভাষচন্দ্র স্বামিজী মহারাজকে প্রণাম করিলে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, "জয় রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু কি, জয়!" অতঃপর দুর্বলতাবশতঃ তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "সুভাষ, তুমি রাষ্ট্রপতি হয়েছ, তোমাকে দেখবার খুব ইচ্ছা ছিল, তাই আজ আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। তোমার হরিপুরা কংগ্রেসে যাবার পূর্বরাত্রে আমি স্বপ্ন দেখি, তুমি সভাপতি হয়েছ, তোমার গলায় ফুলের মালা, আর আমি তোমায় আলিঙ্গন করছি……

স্বপ্নে যা দেখেছি, এতদিনে তা বাস্তবে হোক! এসো, তোমায় আলিঙ্গন করি।"

এই কথা বলিতে বলিতে স্বামিজী মহারাজ আসন ত্যাগপূর্বক উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দণ্ডায়মান সুভাষচন্দ্রকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। স্বামিজী মহারাজের পরিধেয় বস্ত্র কটিদেশ হইতে বারংবার স্খলিত হইয়া পড়িতেছিল, সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। সুভাষচন্দ্রও বিস্মিত এবং পুলকিত; তাঁহার দুই নয়ন হইতে প্রেমাশ্রু বহিতেছে।

উভয়ে আসন গ্রহণ করিলেন। স্বামিজী মহারাজ বলিলেন, "সুভাষ, তুমি বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির গৌরব। সমস্ত ভারতের তুমি মুখ উজ্জ্বল করেছ। British Government তোমাকে কি কষ্টই না দিয়াছে! আমার কান্না আসত। যা হোক, এখন All is well that ends well. আমাদের এই ক্ষুদ্র আশ্রমে তোমার পদার্পণে আমরা সকলেই আনন্দিত হয়েছি!"

সুভাষচন্দ্র বলিলেন, "এখন জগদ্দল পাথর সরাতে পারলে হয়!

তারপর দেশ স্বাধীন হলে অন্যান্য problem সমাধান করতে পারব। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পৃথিবীতে British-দের সুখ শান্তির আলো নিভে আসছে। তারা এখন যুদ্ধ করতে চায় না, চায় শুধু নিজেদের আত্মরক্ষা।”

স্বামিজী মহারাজ বলিলেন, “British Government defence-এর দিকে যাচ্ছে, ওদের শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে; তবুও কি ওরা এই India ছাড়বে? এই জগদ্দল পাথর সরাবার একটি উপায় আছে, একতার দ্বারা। যাতে ভারতে সকল মানুষের মধ্যে একতা আসে, তুমি তার চেষ্টা কর।·· ···স্বরাজের আশা আছে কি?”

স্বামিজী মহারাজের এই প্রশ্নে সুভাষচন্দ্র আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে বলিলেন, “আশা না থাকলে এত খাটছি কেন? আশা আছে বৈ কি! ভারত স্বাধীন হবেই!”

এই প্রকার কিছুক্ষণ আলোচনান্তে সুভাষচন্দ্র স্বামিজী মহারাজের পদধূলি গ্রহণপূর্বক বলিলেন, “আমি আবার আসব, এখন খুব ব্যস্ত।”

স্বামিজী মহারাজ তাঁহাকে সস্নেহে বলিলেন, “আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি। তোমার স্বাস্থ্য অটুট থাকুক! তোমার যখন সময় হবে তখন তুমি আবার আস্‌বে।”

গভীর রাত্রে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সম্বুদ্ধচৈতন্যকে বলিলেন, সুভাষবাবুর সর্বদাই হাসিভরা মুখ। বেশ হাস্যবদন অথচ কেমন গম্ভীর! শান্তিময় পুরুষ! ভিতরে ত্যাগের ভাব রয়েছে কিনা! সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করছেন, মহাত্যাগী! সুভাষ ভারতে অদ্বিতীয় পুরুষ।”

সুভাষচন্দ্রও স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে সুগভীর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন। স্বামিজী মহারাজের দেশোন্নয়নমূলক বিভিন্ন গঠনমূলক কার্যের তিনি সর্বদা প্রশংসা করিতেন। দার্জিলিংয়ে

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম স্থাপন করিলে সুভাষচন্দ্র একদিন কথা প্রসঙ্গে সম্বুদ্ধচৈতন্যকে বলিয়াছিলেন, "স্বামিজীর এই কাজটি খুব ভাল হয়েছে। এর ফলে সেখানকার পার্বত্য জাতিগুলির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার হবে এবং তাদের মধ্যে জাতীয়তা-বোধ জাগবে।"

৭ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ।

এই দিবস সন্ধ্যার দিকে অকস্মাৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জ্বর হয় এবং তাঁহার শরীরের তাপ ১০৪° ফাঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। অবিলম্বে চিকিৎসককে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি আসিয়া স্বামিজী মহারাজকে পরীক্ষা করিলেন এবং প্রয়োজনীয় ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। সম্বুদ্ধচৈতন্য প্রায় রাত্রি বারটা-একটা পর্যন্ত জাগিয়া স্বামিজী মহারাজের সেবা করিলেন। শান্ত মহারাজ, প্রজ্ঞা মহারাজ, চণ্ডী মহারাজ, সুধন্য মহারাজ, লক্ষ্মণ মহারাজ ও অন্যান্য মহারাজগণ সারারাত্রি সেবা করিলেন।

শেষরাত্রের দিকে স্বামিজী মহারাজের শরীরের তাপমাত্রা প্রায় স্বাভাবিক হইয়া আসিল। তিনি শয্যায় বসিয়া জলপান করিলেন।

ধীরে ধীরে রাত্রি প্রভাত হইল।

৮ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার; ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ।

মঠের সন্ন্যাসীবৃন্দ সারারাত্রি স্বামিজী মহারাজের সেবা করিয়াছিলেন। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রাজনিত ক্লান্তি দূর করিবার জন্য স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের অন্যান্য সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী সন্তানগণ প্রভাতে নীচে বিশ্রাম করিতে গেলেন। সম্বুদ্ধচৈতন্য, নগেন মহারাজ ও ব্রহ্মচারী গোবরা স্বামিজী মহারাজের সেবায় নিযুক্ত রহিলেন।

ক্রমে সকাল আটটা বাজিল।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শবাসনে ধ্যানস্থ হইয়া নশ্বর দেহ

ত্যাগ করিবার মানসে স্বীয় ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে আজ্ঞাচক্রে দৃষ্টিস্থাপন করিলেন।

সম্বুদ্ধচৈতন্য স্বামিজী মহারাজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। মহাযোগীর মহাসমাধি যাহাতে সকলে স্বচক্ষে দেখিতে পারেন সেই-জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ নীচে নামিয়া মঠস্থ গুরুভ্রাতাদিগকে ডাকিয়া আনিলেন।

সকলে সমবেত কণ্ঠে "হরি ওঁ রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ স্বীয় নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপনপূর্বক ঈষৎ মধুর হাস্যমুখে ধীরে ধীরে শ্বাস-বায়ু ত্যাগ করিয়া মহাযোগীর ন্যায় মহাসমাধিতে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেন।

স্বামিজী মহারাজের দেহত্যাগের এই অপূর্ব এবং অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্যের স্মরণ হইল গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই উক্তি—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথাবিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরানি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

দেহত্যাগের মাত্র কয়েকদিন পূর্বের কথা। সম্বুদ্ধচৈতন্য স্বামিজী মহারাজের পায়ে তেল মালিশ করিতেছেন। স্বামিজী মহারাজ চেয়ারে বসিয়া আছেন। অকস্মাৎ তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি ছবির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আমি সতেজে দেহত্যাগ করব। ঠাকুর কি আমার এই প্রার্থনা শুনবেন না? আমি invalid হয়ে পড়ে থাকব, বেড-প্যানে পায়খানা যাব, পাঁচজনে সেবা করবে, তোদের কষ্ট দেব,—এ আমি চাই না।"

১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে যেদিন পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যা গৌরীমা দেহত্যাগ করেন, সেইদিন প্রাতে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ কথা-প্রসঙ্গে শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ মিত্র ও সম্বুদ্ধচৈতন্যকে বলিয়াছিলেন, "আমাকে কাশীপুর শ্মশানে ঠাকুরের চরণতলে রেখো।"

স্বামিজী মহারাজের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁহার নশ্বর দেহ কাশীপুর মহাশ্মশানেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্মশানের পার্শ্বে দাহ করা হয়।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার দেহত্যাগের চৌদ্দ বৎসর পূর্বেই কলিকাতা বিডন স্ট্রীটে থাকাকালে সম্বুদ্ধচৈতন্যকে বলিয়াছিলেন, "আমি ধ্যানস্থ হয়ে যোগাসনে দেহত্যাগ করব।" সত্যদ্রষ্টা ঋষির কথাগুলি যথাসময়ে অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইয়াছিল। দেহত্যাগের ঠিক নয়দিন পূর্বে গভীর রাত্রে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সম্বুদ্ধচৈতন্যকে বলিয়াছিলেন, "এ শরীর আর বইছে না। শিগ্‌গীর চলে যাব।"

মহাযাত্রার পূর্বে স্বামিজী মহারাজ এই প্রকারে তাহার সেবক-শিষ্যের নিকট হইতে পরোক্ষভাবে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার এইরূপ আকস্মিক দেহত্যাগের কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ এবং লীলাসহচর শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ মানব লীলা সংবরণ করিলেন। যে সদানন্দময় দেবমানবটির সেবা করিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য তাঁহার জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিতেছিলেন, তিনি আজ আর নয়ন সম্মুখে নাই। চিরদিনের জন্য তিনি মহাশূন্যের যবনিকান্তরালে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন। আর কোনদিন সম্বুদ্ধচৈতন্য তাঁহার কমল-সদৃশ-কোমল চরণ দুইখানি সেবা করিতে পারিবেন না। হৃদয়মথিত দীর্ঘশ্বাসে তাঁহার হৃৎপিণ্ডটা যেন ভাঙ্গিয়া শতধা হইয়া যাইতে লাগিল। এই উত্তাল উদ্বেল শোকসাগরে নিমজ্জিত হইয়াও স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের দিব্য জীবনের কত সুমধুর স্মৃতি বিদ্যুদ্‌স্ফুরণের মত মধ্যে মধ্যে সেবক-শিষ্য সম্বুদ্ধচৈতন্যের মনে উদয় হয়।

একদিনের স্মৃতি :

১৩৩৭ সনের শীতকাল।

কলিকাতা ২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে শ্রীযুক্তা সুধালতা বসুর বাড়ীতে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ অবস্থান করিতেছেন। স্বামিজী মহারাজের সেবার জন্য সম্বুদ্ধচৈতন্য, নগেন মহারাজ, নীলমণি মহারাজ এবং নন্দ তখন তথায় ছিলেন।

৪ঠা মাঘ, রবিবার। রাত্রি তখন বারটা বাজিয়া গিয়াছে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার রাত্রিকালীন আহারপর্ব সমাধা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট সম্বুদ্ধচৈতন্য এবং নন্দ উপস্থিত। স্বামিজী মহারাজ আরাম কেদারায় বসিয়া আনন্দোৎফুল্ল মনে হাসিয়া হাসিয়া গান গাহিতেছেন,—

“ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে।
টানে প্রাণ যায়রে ভেসে,
কোথায় যে যায় কে জানে।
কোথাও বিষম ঘুরণ-পাঁক,
চুবন খেয়ে হাঁপিয়ে উঠে,
দুনিয়া দেখে ফাঁক !
কোথাও তর্‌তরে ধায়,
ভাসিয়ে নে যায়,
টান পড়েছে কি টানে।”

স্বামিজী মহারাজ গানখানি গাহিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য এবং নন্দের দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া সস্নেহ বাক্যে বলিলেন, “তোদের জীবনে একটা স্মৃতি থেকে যাবে! এসব স্বপ্নবৎ! মনে হবে, একজন স্বামী ছিলেন, সদানন্দ! তাঁর সর্বদাই হাসি মুখ দেখেছি! জীবনে কখনও তাঁর মুখে দুঃখের চিহ্ন দেখিনি। আমাদের সঙ্গে হাসতেন, খেলতেন, কত ঠাট্টা-তামাসা করতেন! তোরাও-বা কোথায় চলে যাবি, আমি কোথা চলে যাবো! আর কি দেখা

হবে? তোদের একটা লাভ হল যে, আমার সঙ্গ করে নিলি, সেবা করলি। এইটেই তোদের জীবনের মস্ত বড় লাভ। যখন জীবনে দুঃখ কষ্ট পাবি তখন এই দিনগুলির কথা তোদের মনে হবে যে! তখন ভাব্‌বি, আহা, স্বামিজীর সঙ্গে থেকে কি আনন্দই না পেতুম! কি মধুময় দিন ছিল!—তখন এই স্মৃতিগুলি মনে জেগে কি আনন্দই না দেবে! পরে বুঝবি।"

সম্বুদ্ধচৈতন্য স্বভাবতঃই স্বল্পভাষী। তিনি কিছুই বলিলেন না; কিন্তু নন্দ স্বামিজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের কারো উপর কি আপনার টান নাই?"

স্বামিজী মহারাজ উহাতে সকরুণ স্মিতহাস্যে বলিলেন, "আমার যখন তোরা অভাব বোধ করবি, তখন বুঝবি যে আমি তোদের কত ভালবাসি! তোদের উপর আমার প্রাণের টান কত!"

পাঠক, তুমি কি তোমার জীবনের কখনও এমন ভালবাসা পাইয়াছ? না, পাও নাই। সংসারের আত্মীয়-পরিজনের ভালবাসার সহিত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। আত্মীয়-পরিজনের, এমন কি পিতামাতার ভালবাসাও কদাপি এমন অকপট, সুগভীর এবং নিঃস্বার্থ হইতে পারে না। জীবন্মুক্ত পুরুষের ভালবাসা সূর্যের মত প্রচণ্ড, আকাশের মত উদার, সমুদ্রের মত গভীর এবং বাতাসের মত ব্যাপক। সম্বুদ্ধচৈতন্য জীবন্মুক্ত পুরুষ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নিকট যে ভালবাসা পাইয়াছেন তাহার তুলনা নাই, তাহা অবর্ণনীয়, তাহা কেবল উপভোগই করা চলে।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের অদর্শনে শোকাকুল সম্বুদ্ধচৈতন্য ম্রিয়মান হইয়া রহিলেন। সর্বক্ষণ তাঁহার দুই চক্ষুর জলধারায় গণ্ডদেশ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। জীবন যেন তাঁহার নিকট অর্থহীন বলিয়া, একটা দুর্বিসহ বোঝা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি স্তব্ধভাবে প্রচণ্ড এই শোকের বেগ ধারণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে শারদীয়া মহাপূজা আসিয়া পড়িল।

৩রা কার্তিক, ১৩৪৬ সাল। শারদীয়া মহাসপ্তমী। সেদিন রাত্রিশেষে ব্রাহ্মমুহূর্তে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গলারতি, স্তবপাঠ এবং সঙ্গীত হইল। সম্বুদ্ধচৈতন্য শত চেষ্টা করিয়াও কোনমতেই আরতিতে অংশ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অনর্গল ধারায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের তৈলচিত্র খানির দিকে তিনি যতই দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহার চক্ষু দুইটিতে অশ্রুর ধারা ততই যেন প্রবল হইতে থাকে। সম্বুদ্ধচৈতন্যের কেবলই মনে হইতে লাগিল স্বামিজী মহারাজের সুগভীর স্নেহ, অপরিসীম করুণা এবং হাসিমাখা মুখের মধুর কথার বিষয়। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এক বৎসর পূর্বেও এমন দিনে শারদোৎসবের সময় স্বামিজী মহারাজ তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। বিগত দিনের স্মৃতি সম্বুদ্ধচৈতন্যকে ভীষণ ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তিনি নীরবে কেবল অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

সম্বুদ্ধচৈতন্য স্বীয় কক্ষে আসিয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন। রাত্রি পাঁচটার পর তাঁহার এক অলৌকিক দর্শন হয়। অর্ধ জাগ্রত এবং অর্ধ ঘুমন্ত চক্ষে তিনি দেখিলেন,—

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ যেন কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। অতঃপর তিনি তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া স্বীয় হস্তস্থিত লাঠিখানি যথাস্থানে রাখিয়া জামা ও চাদর ছাড়িয়া খালি গায়ে, শয়নকক্ষের যে চেয়ারখানিতে তিনি সাধারণতঃ বসেন, তথায় উপবেশন করিলেন। অতঃপর তিনি তামাক খাইতে লাগিলেন। এমন সময় স্বামী সদাত্মানন্দ আসিয়া স্বামিজী মহারাজকে বলিলেন, "কয়েকজন ভক্ত অপনাকে দর্শন করতে এসেছেন।"

স্বামিজী মহারাজ তদবস্থাতেই বলিলেন, "তামাকটা খেয়ে নিই। বস্‌তে বল্।"

অতঃপর স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সম্বুদ্ধচৈতন্যের দিকে চাহিয়া তাঁহার স্বভাবসুলভ হাস্যে বলিলেন, "কে বলে রে আমি মরেছি? সেদিন তোরা খেলি না কেন রে? কাগজে কি বেরিয়েছিল?"

সম্বুদ্ধচৈতন্যের তখন খুব আনন্দ হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল স্বামিজী মহারাজের দেহত্যাগ হয় নাই। উহা ভুল। তিনি পরদিনই স্বামিজী মহারাজের আগমন সংবাদ সকলকে জানাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

তামাক খাইয়া স্বামিজী মহারাজ চাদর গায়ে দিলেন এবং তাঁহার বসিবার ঘরে যাইয়া অপেক্ষমান ভক্তদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহাদের সহিত কথাবার্তা শেষ করিয়া তিনি পুনরায় শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিলেন, জামা পরিধান করিলেন, চাদরখানি গায়ে দিলেন এবং তাঁহার লাঠিখানি হাতে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। সর্বক্ষণের সেবক শিষ্য সম্বুদ্ধচৈতন্যও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

এমন সময় তিনজন ভক্ত আসিয়া তিনটি পুষ্পমাল্য স্বামিজী মহারাজের গলায় পরাইয়া দিল। তিনি স্মিতহাস্যে মস্তক নত করিয়া প্রত্যেকের পুষ্পমাল্য গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ভক্তগণ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে প্রণাম করিলেন। স্বামিজী মহারাজ তাহাদিগকে বলিলেন, "আচ্ছা, এস এখন। আমি বেড়াতে যাচ্ছি।"

এমন সময় জনৈক ব্যক্তি আসিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্যের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিলেন এবং অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সুইচ্ (Switch) টিপিয়া আলো জ্বালিলেন। ইহাতে সম্বুদ্ধ-চৈতন্যের দর্শন ভাঙ্গিয়া গেল।

পরদিবস মহাষ্টমী।

ঐ দিবস সম্বুদ্ধচৈতন্য শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের প্রিয়

বিভিন্ন প্রকার ফুল, ফল, ফুলের মালা প্রভৃতি কিনিয়া আনিলেন। স্বামিজী মহারাজের শয়নকক্ষে যে চেয়ার খানিতে সম্বুদ্ধচৈতন্য তাঁহার দিব্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন, সেই চেয়ারখানিকেই পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত করিলেন এবং স্বামিজী মহারাজের পাদুকায় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। স্বামিজী মহারাজের প্রিয় ফল দ্বারা তাঁহাকে ভোগ দিলেন। অতঃপর সদাশিব মহারাজ ও সম্বুদ্ধচৈতন্য গুরুস্তব, গুরুগীতা প্রভৃতি পাঠ করিলেন। পাঠশেষে সদাশিব মহারাজ, শান্ত মহারাজ, প্রজ্ঞা মহারাজ, চণ্ডী মহারাজ, সম্বুদ্ধচৈতন্য প্রভৃতি সকলে পুনরায় সদ্যঃ লোকান্তরিত স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের উদ্দেশ্যে পাদুকায় অঞ্জলি প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণ মহারাজ পাশের ঘরে (office room) বসিয়া ধ্যান করিলেন।

৫ই কার্তিক, শনিবার, ১৩৪৬ সন। মহানবমী।

সেদিন রাত্রি তিন ঘটিকায় পুনরায় স্বামিজী মহারাজ তাঁহার সেবক শিষ্য সম্বুদ্ধচৈতন্যকে দর্শন দান করিলেন! সম্বুদ্ধচৈতন্য দেখিলেন যে কাশীপুরের মহাশ্মশানে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তদীয় পবিত্র চিতার উপর সর্বদেহ চাদরে ঢাকিয়া শায়িত রহিয়াছেন এবং মধুর হাস্য করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং পট্‌-এ (Pot) প্রস্রাব করিলেন। অতঃপর স্বামিজী মহারাজ তাঁহার পবিত্র চিতার মধ্যস্থলে যোগাসনে বসিয়া কি সুন্দর হাস্য করিতেছেন! তিনি কোন কথা বলিতেছেন না, কিন্তু ইঙ্গিতে যেন জানাইতেছেন,—চিতাভস্ম, অস্থি প্রভৃতি কোথায় গেল? উহা সকলে লইয়া গেলে কি হইবে? এই যে আমি রহিয়াছি!

অতঃপর তিনি বলিলেন, "আমার কি বিনাশ আছে?—না, ধ্বংস আছে? আমি অনন্তকাল রয়েছি।"

পরে স্বামিজী মহারাজ গীতার শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বলিলেন,—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বাঽভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥”

(এই আত্মা কখনও জাত বা মৃত হন না। কারণ, পূর্বে না থাকিয়া পরে বিদ্যমান হওয়ার নাম জন্ম এবং পূর্বে থাকিয়া পরে না থাকিবার নাম মৃত্যু ; আত্মাতে এই দুই অবস্থার কোনটিই নাই। অর্থাৎ, আত্মা জন্মমৃত্যুরহিত, অপক্ষয়হীন এবং বৃদ্ধিশূন্য ; শরীর নষ্ট হইলেও আত্মা বিনষ্ট হয় না।)

সম্বুদ্ধচৈতন্য রাত্রি চারি ঘটিকায় শয্যাত্যাগ করিলেন এবং স্নান করিলেন। অতঃপর তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া কলিকাতার বিভিন্ন গুরুভ্রাতা, গুরুভগ্নী এবং ভক্তদিগকে সংবাদ দিলেন যে কাশীপুর মহাশ্মশানে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পূজা হইবে। অনেক ভক্ত সম্বুদ্ধচৈতন্যকে এই জন্য ফল ফুল ও টাকা দিলেন।

অতঃপর সকলে কাশীপুর মহাশ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অর্ধ শতাধিক ভক্ত ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। সকলে মিলিয়া পূজার যোগাড় করিয়া ফেলিলেন। সম্বুদ্ধচৈতন্য স্বহস্তে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী এবং স্বামিজী মহারাজের পবিত্র চিতায় শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পূজা ও ভোগদান করিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মহাসমাধির পর এই তাঁহার অনাড়ম্বর প্রথম পূজা এবং এই পূজা করিলেন তাঁহারই প্রিয়তম সেবক-শিষ্য সম্বুদ্ধচৈতন্য।

১০

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মহাসমাধির পর সম্বুদ্ধচৈতন্য আশ্রম-মঠের কাজকর্ম কমাইয়া দিলেন। বৎসরের অধিকাংশ সময় তিনি তীর্থপর্যটনে ও তপস্যায় অতিবাহিত করিতেন। প্রায় প্রতি বৎসরই তিনি কাশীধাম, গয়াধাম, দেওঘর-বৈদ্যনাথধাম, বৃন্দাবনধাম, অযোধ্যা ও হিমালয়ের বিভিন্ন তীর্থস্থানে গমন করিতেন। এই সকল তীর্থদর্শনের ফাঁকে ফাঁকে স্বদেশ-প্রেমিক সম্বুদ্ধচৈতন্য ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিভিন্ন স্থান, যথা—দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুরসিক্রী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, লাহোর প্রভৃতি পরিদর্শন করিতেন। কলিকাতা হইতে যতবার তিনি উত্তর ভারত ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, কাশীধামে তিনি অবশ্যই কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া বিশ্বনাথকে দর্শন এবং পূজাদি করিতেন। হরিদ্বার এবং হিমালয়ের বিভিন্ন তীর্থস্থানেও তিনি মধ্যে মধ্যে ভ্রমণ করিতেন এবং তপস্যাদিতে বেশ কিছুকাল মগ্ন থাকিতেন।

সম্বুদ্ধচৈতন্যের এক সময় আমেরিকা এবং পৃথিবীভ্রমণের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তদীয় শিষ্যের এই মনোভিলাষের কথা জানিতে পারিয়া একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "রবি, তোর আমেরিকা যেয়ে কি হবে? তুই আমেরিকা গেলে তোর অনেক student (ছাত্র) হবে। তুই যা' যোগ, আসন, প্রাণায়াম জানিস্, তাতে তোর অনেক ছাত্র হবে। কিন্তু পার্থিব মান, প্রতিষ্ঠা দিয়ে কি হবে? তারচেয়ে সাদাসিধে ভাবে

থাক্‌বি। ভগবানের নাম করবি। তবেই জীবনে আনন্দ পাবি। মধ্যে মধ্যে ঘরে দরজা দিয়ে বা কোন তীর্থস্থানে যেয়ে নির্জনে ধ্যান-জপ-তপস্যাদি করবি। আর মধ্যে মধ্যে লোকালয়ে আস্‌বি। তোর দ্বারা বহু লোকের উপকার হবে।"

সম্বুদ্ধচৈতন্য এখন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের এই উপদেশ-গুলিই পালন করিতে লাগিলেন।

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দ।

এই বৎসর সম্বুদ্ধচৈতন্য কাশ্মীর ভ্রমণ করিতে গমন করেন। এই কাশ্মীরের সহিত শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ এবং শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পুণ্যস্মৃতি বিশেষভাবে জড়িত।

আমেরিকার চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের পর স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া সর্বত্র বেদান্ত প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই বেদান্তপ্রচার এবং জনসেবার উদ্দেশ্যেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করিলেন। দেবতাত্মা হিমালয় পর্বতমালার কোলে কোন উপযুক্ত স্থানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার বাসনা তাঁহার বহুকালের।

এই সময় তিনি কাশ্মীর ভ্রমণ করিতে গমন করেন এবং ভূস্বর্গ কাশ্মীরের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিশেষ মুগ্ধ হন। কাশ্মীর তখন একটি দেশীয় স্বাধীন রাজ্য। একজন হিন্দু মহারাজা ইহার শাসনকর্তা। স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা হইল, এই কাশ্মীরেই তিনি একটি সংস্কৃতভাষা এবং অদ্বৈত-বেদান্ত চর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবেন। কাশ্মীরের তদানীন্তন মহারাজারও ইহাতে বিশেষ আগ্রহ ছিল। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের অপরিসীম দেশপ্রেম ও অকুতোভয়তা দর্শনে ভীত হইয়া কাশ্মীর রাজ্যের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট উহাতে বাদ সাধিতে লাগিলেন। কাশ্মীরের মহারাজার উপর তিনি নানাপ্রকার চাপ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এইজন্যই

কাশ্মীরের মহারাজা আর স্বামিজীকে সাহায্য করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, স্বামী বিবেকানন্দ পরবর্তীকালে তদীয় আমেরিকান শিষ্য ক্যাপ্টেন সেভিয়ার দম্পতীর সহায়তায় হিমালয়ের কোলে মায়াবতীতে ঐ অদ্বৈত-আশ্রম, প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতাকে সঙ্গে করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ কাশ্মীরের পুণ্যতীর্থ অমরনাথ দর্শন করেন। অমরনাথ শিব। এই অমরনাথ বিগ্রহের নিকটই স্বামী বিবেকানন্দ ইচ্ছামৃত্যু বর লাভ করিয়াছিলেন।

কাশ্মীরের অপর পীঠস্থান ক্ষীরভবানী। ক্ষীরভবানী দর্শন ও তথায় দেবীর দৈববাণী শ্রবণ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই দৈববাণী শ্রবণের পরেই জ্ঞানযোগী এবং কর্মযোগী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার জীবনের শেষ অঙ্কে ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সংসারের যাবতীয় কর্ম হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে হাত গুটাইয়া লইলেন।

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে আমেরিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বেলুড় মঠে উঠেন এবং ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যভাগে কাশ্মীর ও তিব্বত ভ্রমণ মানসে কলিকাতা ত্যাগ করেন।

স্বামিজী মহারাজ রাওয়ালপিণ্ডি হইতে দোমেল ও বারমূলা হইয়া কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ কাশ্মীরের তদানীন্তন মহারাজা প্রতাপ সিং-এর অতিথি হিসাবে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। মহারাজ প্রতাপ সিং-এর সহিত স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয় ছিল। কাশ্মীরে অবস্থানকালে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজও বিখ্যাত অমরনাথ তীর্থ এবং পীঠস্থান ক্ষীরভবানী দর্শন করেন। অতঃপর তিনি তথা হইতে পদব্রজে হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বত গমন করিয়াছিলেন।

কাশ্মীর যাইবার জন্য সম্বুদ্ধচৈতন্য প্রথমতঃ রাওয়ালপিণ্ডি গমন

করেন। রাওয়ালপিণ্ডি বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্থানের অন্তর্গত। পরে তথা হইতে তিনি কাশ্মীরের পথে দোমেল নামক একটি স্থানে আগমন করেন। দোমেলের উচ্চতা ২১৭১ ফুট। ইহার অদূরে কৃষ্ণগঙ্গা এবং বিতস্তা নদী মিলিত হইয়াছে। "দোমেল" কথাটির অর্থ হইতেছে "দুই নদীর সম্মেলন।" সেইজন্যই স্থানটির নাম দোমেল হইয়াছে। শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজও এই পথেই কাশ্মীর গমন করিয়াছিলেন।

দোমেল হইতে সম্বুদ্ধচৈতন্য বারমূলা আগমন করেন। ইহা কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি বিখ্যাত সহর। বারমূলা সহরটি বিতস্তা নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। ইহা কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর হইতে এক হাজার ফুট নিম্নে অবস্থিত। "বরাহমূল" কথাটি হইতে "বারমূলা" নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কাশ্মীরের হিন্দুগণের বিশ্বাস, ভগবান্ বিষ্ণু বরাহ অবতাররূপে এইস্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তজ্জন্যই স্থানটির ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে।

বারমূলা হইতে সম্বুদ্ধচৈতন্য শ্রীনগর আগমন করেন। শ্রীনগর কাশ্মীর রাজ্যের মহারাজার গ্রীষ্মাবাস। ইহার উচ্চতা ৫২০০ ফুট। শ্রীনগর হইতে সম্বুদ্ধচৈতন্য কাশ্মীরের গুলমার্গ, খিলনমার্গ, ক্ষীরভবানী প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন।

কাশ্মীরের গুলমার্গ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। ইহা শ্রীনগর হইতে সাতাশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত। ইহার উচ্চতা ৮৫০০ ফুট। "গুলমার্গ" কথাটির অর্থ "গোলাপ মাঠ।" এই স্থানে অসংখ্য নয়নাভিরাম ফুল ফোটে বলিয়া মোগল সম্রাট শাজাহান এই স্থানটির এইরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন।

কাশ্মীরের ক্ষীরভবানী তথাকার হিন্দুদের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ-স্থান। তুলমূল নামক একটি গ্রামের প্রান্তদেশে ক্ষীরভবানী দেবীর মন্দির অবস্থিত। একটি আশী-নব্বুই হাত লম্বা ত্রিকোণ জমির

তিন দিকে দশ-বার হাত প্রশস্ত একটি খালদ্বারা স্থানটি পরিবেষ্টিত। এই জমির মধ্যস্থলে প্রায় পনের-ষোল হাত দীর্ঘ বর্গাকৃতি একটি জলের কুণ্ড আছে। কুণ্ডটির মধ্যে ক্ষীরভবানীর মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটি শ্বেতপাথরের। মন্দিরাভ্যন্তরে মূর্তিটি শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের যুগলমূর্তি। তিনদিকের খালটিকে "ক্ষীরসাগর" বলে। খালের জল স্বচ্ছ, স্রোতযুক্ত। ইহা তিন মাইল দক্ষিণে যাইয়া সিন্ধুনদের সহিত মিলিত হইয়াছে। কাশ্মীরের মহারাজা প্রতাপ সিং এই শ্বেতপাথরের মন্দিরটি নির্মাণ করেন। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ যখন ক্ষীরভবানী দর্শন করেন, তখন এই মন্দিরটি ছিল না। একটি অতি প্রাচীন, জীর্ণ, ভগ্ন মন্দির তথায় বিদ্যমান ছিল। মন্দিরের বিগ্রহমূর্তিটি নাকি এই কুণ্ডের জলেই পাওয়া গিয়াছে। কুণ্ডের জল মধ্যে মধ্যে রং বদলায়। কাশ্মীরের হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন যে এই কুণ্ডের জলে স্নান করিলে মানুষ সর্বব্যাধি হইতে মুক্ত হয়। ক্ষীরভবানীর মূল মন্দিরের আশে-পাশে আরও কতকগুলি মন্দির আছে। এই মন্দিরগুলিতে মহাবীর হনুমান, দুর্গা, বুদ্ধদেব প্রভৃতির মূর্তি রহিয়াছে।

শ্রাবণী পূর্ণিমায় অমরনাথ তীর্থ দর্শনের উদ্দেশ্যে সম্বুদ্ধচৈতন্য পহেলগাঁও উপস্থিত হইলেন। পহেলগাঁও-এর উচ্চতা ৭২০০ ফুট। কাশ্মীরের গুলমার্গ প্রভৃতি উচ্চ স্থানসমূহের ন্যায় এই স্থানে অতিরিক্ত বর্ষা হয় না। এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। কাশ্মীরের নয়নাভিরাম স্থান সমূহের মধ্যে পহেলগাঁও সহরটিকেই অনেকে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন। সহরের নিম্নে নীলগঙ্গা নদী প্রবাহিত। উহার তীরদেশে ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেক মাঠ আছে। নীলগঙ্গার জল স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ। এইস্থান হইতে সোনাসর, শেষনাগ, অমরনাথ, হরনাগ, লীদারবৎ এবং কোলোহাই তুষারনদী (glacier) দেখিতে যাইবার পথ আছে।

পহেলগাঁও হইতে সম্বুদ্ধচৈতন্য পদব্রজে চন্দনবাড়ী নামক একটি

স্থানে আসিলেন। স্থানটি পহেলগাঁও হইতে উত্তর-পূর্ব কোণে নয় মাইল দূরে অবস্থিত। স্থানটির উচ্চতা ৯৫০০ ফুট।

অতঃপর শেষনাগ। হিমালয়ের কোলে ১২০০০ ফুট উচ্চে “শেষনাগ” একটি সরোবরের নাম। উহার আয়তন কলিকাতার হেদুয়ার ন্যায়। ইহার দুই পার্শ্বে চিরতুষারাবৃত পর্বতমালা শোভা পাইতেছে। ঐ সকল পর্বতের পুঞ্জীভূত এবং চিরস্থায়ী তুষারনদী সমূহ (glacier) সরোবরটির জল স্পর্শ করিতেছে। সরোবরের জল উজ্জ্বল সবুজ বর্ণ। উপরের পথ হইতে হ্রদটির দৃশ্য অতীব মনোরম। এই স্থানের অপরূপ সৌন্দর্য দর্শনে সম্বুদ্ধচৈতন্য বিস্ময়াভিভূত হইলেন। তাঁহার মনে হইল যে সরোবরটি যেন স্বর্গের অপ্সরাদিগের স্নানের স্থান ; পার্শ্বস্থ তুষারমণ্ডিত হিমাদ্রিশৃঙ্গ যেন রজতগিরিনিভ ধ্যানমগ্ন মহেশ্বরের মস্তক এবং নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত তুষারনদী-সমূহ যেন তাঁহার প্রলম্বিত জটাজাল। অনন্তের বুকে সান্তের এই অপূর্ব রূপমাধুরীতে সম্বুদ্ধচৈতন্য আনন্দে দেশকালপাত্র ভুলিয়া গেলেন। কাশ্মীর সত্য সত্যই ভূস্বর্গ।

শেষনাগ সরোবরে সম্বুদ্ধচৈতন্যের তিনবার ডুব দিবার অভিপ্রায় ছিল ; কিন্তু প্রচণ্ড শীতের জন্য তিনি তাহা পারিলেন না। সেখানে শীত এত প্রচণ্ড যে দুইবার ডুব দিতেই তাঁহার সর্বাঙ্গ অবশ ও আড়ষ্ট হইয়া গেল। তিনি যেন ঠাণ্ডায় জমিয়া শক্ত হইয়া যাইতে লাগিলেন। শেষপর্যন্ত তিনি তৃতীয়বার ডুব না দিয়াই কোনক্রমে উপরে উঠিয়া আসিলেন।

শেষনাগ হইতে সম্বুদ্ধচৈতন্য পঞ্চতরণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পঞ্চতরণী শেষনাগ হইতে এগার মাইল দূরে অবস্থিত। পঞ্চতরণীর নদীর পাঁচটি ধারা অতিক্রম করিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য ভৈরব-ঘাট পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত নাতিবৃহৎ একটি মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাই পঞ্চতরণী। এইস্থানে আসিতে পাঁচবার

নদী অতিক্রম করিতে হয় বলিয়াই স্থানটির এই প্রকার নামকরণ হইয়াছে। পঞ্চতরণী হইতে অমরনাথ একবেলার পথ।

অমরনাথ দর্শনের পূর্বদিন তীর্থযাত্রীদল পঞ্চতরণীতে রাত্রি যাপন করিলেন। তথায় সন্ধ্যার সময় শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ অমরনাথের প্রতীকের আরতি করিলেন। আরত্রিকের পর উপস্থিত সকলের অনুরোধে ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্য পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের বেদান্তপ্রচার সম্পর্কে হিন্দী ভাষায় এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করিলেন।

সম্বুদ্ধচৈতন্যের ভাষণ শ্রবণে মহাদেবানন্দ গিরি, উজ্জয়িনীর সন্ধ্যাপুরী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের বহু সাধু-সন্ন্যাসী বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। "শেরকা বাচ্চা শের" বলিয়া তাঁহারা সকলে সম্বুদ্ধ-চৈন্যকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কলিকাতার ইস্ট বেঙ্গল সোসাইটির শ্রীযুত বিপিনবিহারী মোদক মহাশয়ও ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতাশেষে সম্বুদ্ধচৈতন্য যখন তাঁবু হইতে বহির্গত হইয়া স্বীয় আবাসে আসিতেছিলেন তখন বিপিনবাবু আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে শূন্যে তুলিয়া ধরিলেন। গদগদ কণ্ঠে তিনি সম্বুদ্ধচৈতন্যকে বলিলেন, "স্বামিজী, আপনি আজ এই পঞ্চতরণীতে যে ভাষণ দিলেন, তাতে সমগ্র বাঙ্গালী সাধুসমাজের মুখোজ্জ্বল করলেন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি যখন কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শনে যাব তখন আপনাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাব। আপনার যাবতীয় খরচ আমি বহন করব।"

পঞ্চতরণী হইতে পরদিবস ব্রাহ্মমুহূর্তে সম্বুদ্ধচৈতন্য অমরনাথের দিকে রওনা হইলেন। পথটি উত্তুঙ্গ পর্বতমালার গা ঘেঁষিয়া অমরাবতী নদীর কূলে কূলে গিয়াছে। কোন পর্বতেই উদ্ভিদের চিহ্নমাত্র নাই। চতুর্দিকে এক ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা এবং ভীষণ অনুর্বরতা বিরাজ করিতেছে। স্থানটি উহার ভয়াল-গম্ভীর সৌন্দর্যের জন্য

কবি, দার্শনিক, চিত্রকর এবং তপস্বীদিগের নিকট আকর্ষণীয়। শিবভাবে বিভোর সম্বুদ্ধচৈতন্য সম্মুখের দিকে হস্তদ্বয় ঈষৎ প্রসারিত করিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে অনুচ্চকণ্ঠে শিবস্তোত্র পাঠ করিতে করিতে চলিয়াছেন,—

"নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্তে
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্তে।
নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য
নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥
প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ
মহাদেব শম্ভো মহেশ ত্রিনেত্র।
শিবকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে
ত্বদন্যো বরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ ॥"

বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাধক চট্টগ্রামের তারাচরণ পরমহংস তখন অমরনাথ দর্শন করিয়া পঞ্চতরণীর পথে অবতরণ করিতেছেন। ভাবে বিহ্বল শিবভক্ত সম্বুদ্ধচৈতন্যকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া তিনি স্বহস্তে তাঁহার অশ্রুসিক্ত নয়নদ্বয় মার্জনা করিয়া দিলেন। সম্বুদ্ধচৈতন্যকে তিনি মিনতি করিয়া বলিলেন, "আপনি আমার নামেও অমরনাথজীকে একটি বিল্বপত্র দিবেন।"

ভাবে বিভোর সম্বুদ্ধচৈতন্য শিবনাম করিতে করিতে অমরনাথ গুহার সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি অমরগঙ্গা মনে করিয়া ভুলক্রমে অন্য এক নদীতে স্নান করিলেন। স্নানান্তে সিক্তদেহে তিনি উপরে উঠিয়া আসিতেই তাঁহার সঙ্গী স্বামী সুখানন্দ মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "ওটা নয়, এটা অমরগঙ্গা।" এই বলিয়া তিনি সম্বুদ্ধচৈতন্যকে অমরগঙ্গা দেখাইয়া দিলেন। সম্বুদ্ধচৈতন্যও তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড শীত সত্ত্বেও পুনরায় উলঙ্গ হইয়া "জয়, অমরনাথজী কি জয়" বলিয়া অমরগঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং স্নান করিলেন। যে নিদারুণ অসহ্য শীতে সাধারণ মানুষ

মোটেই স্নান করিতে চাহে না, মহাযোগী সম্বুদ্ধচৈতন্য সেখানে সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুই দুইবার স্নান করিলেন। পার্শ্বে দণ্ডায়মান সঙ্গী স্বামী সুখানন্দ মহারাজ বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া সম্বুদ্ধচৈতন্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বাঙ্গালী সন্ন্যাসী স্বামী সুখানন্দ যৌবনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম গৃহীশিষ্য পরমশ্রদ্ধেয় "মাস্টার মশাই"-এর (শ্রীম—) সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সন্ন্যাসী স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্বামী ব্রহ্মানন্দও বাঙ্গালী ছিলেন এবং তিনি কাশ্মীরের শ্রীনগরে রামবাগ রোডে "নারায়ণ মঠ" নামে একটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্বুদ্ধচৈতন্য যখন কাশ্মীর ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন স্বামী সুখানন্দ এই নারায়ণ মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন।

অমরগঙ্গায় স্নানশেষে সম্বুদ্ধচৈতন্য অমরনাথের গুহায় প্রবেশ করিলেন। ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে তিনি শিবস্তোত্র আবৃত্তি করিতেছেন,—

"জগদুদ্ভবপালননাশকরং
ত্রিদিবেশশিরোমণিঘৃষ্টপদম্।
প্রিয়মানবসাধুজনৈকগতিঃ
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥
অনাথং সুদীনং বিভো বিশ্বনাথ
পুনর্জন্মদুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো।
ভজতোঽখিলদুঃখসমূহহরং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥

অমরনাথ গুহাটির মধ্যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কয়েকটি ঝরণা জমিয়া বরফের স্তূপে পরিণত হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা বড় স্তূপটির নামই "অমরনাথ লিঙ্গ"। স্তূপটি বর্তুলাকার এবং ইহার পরিধি প্রায় ছয় হাত এবং উচ্চতা তিন হাত। প্রতিটি তুষার স্তূপের উপর গুহার ছাদ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছে। শিবলিঙ্গটি চন্দ্রের

হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস-বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং প্রতি বৎসর শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে উহা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শতাধিক বৎসর পূর্বে জনৈক পাহাড়ী মুসলমান রাখাল এই স্থানটি সর্বপ্রথম দেখিতে পায় এবং হিন্দুদিগকে জানায়।

অমরনাথ গুহাটি স্বাভাবিক। উহা মনুষ্যখোদিত নহে। গুহাটি দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে এবং উচ্চতায় পঞ্চাশ গজ করিয়া। উহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩০০০ ফুট উচ্চে একটি পর্বতগাত্রে অবস্থিত। এই পর্বতটি ১৮০০০ ফুট উচ্চ এবং চিরতুষারাবৃত। গুহার এক কোণে বরফের ছোট ছোট দুইটি চাঁই আছে। উহাদের একটি পার্বতী এবং অপরটি গণেশ। গুহায় কোন মন্দির নাই। গুহার নিম্নেই অমরাবতী নদী প্রবাহিত হইতেছে। অনেকগুলি খড়িপাথরের পাহাড় ধৌত করিয়া নদীটি প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া উহার জল ঈষৎ শ্বেতাভ। এইজন্য নদীটির অপর নাম "দুধগঙ্গা"।

স্থানীয় হিন্দুগণের বিশ্বাস, এই অমরনাথ গুহার মধ্যেই দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার স্ত্রী পার্বতীকে "অমর কথা" বলিয়াছিলেন। "অমর-কথা" শ্রবণ করিতে করিতে পার্বতী নিদ্রাভিভূতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। অন্তরালে অবস্থান করিয়া একটি পাখী এই "অমর কথা" শুনিতে পায়। পার্বতী মহাদেবের স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিয়া নিদ্রাভিভূতা হইয়া পড়িলে পাখীটি পার্বতীর কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া মহাদেবকে প্রতারিত করিয়াছিল। "অমর কথা" সমাপ্ত হইলে মহাদেব পার্বতীকে নিদ্রাভিভূতা দেখিয়া সমগ্র ব্যাপারটি বুঝিতে পারিলেন। তিনি তখন পাখীটির দিকে রোষ-কষায়িত নয়নে দৃষ্টিপাত করিলে পাখীটি প্রাণভয়ে উড়িয়া যায় এবং আত্মরক্ষার্থে মহামুনি বেদব্যাসের পত্নীর গর্ভে প্রবেশ করে। এই পাখীটিই স্বয়ং শুকদেব।

সম্বুদ্ধচৈতন্য অমরনাথজীকে পঞ্চোপচারে পূজা করিলেন। বেলা দুই ঘটিকা পর্যন্ত গুহামধ্যে অবস্থান করিয়া তিনি জপ-ধ্যান

করিলেন। এই সময় তিনি তথায় দুইটি কবুতরও দর্শন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে কবুতর দুইটি বাবা অমরনাথের ভৈরব। উহারা গুহা রক্ষা করে। এই ভৈরবদ্বয়কে দর্শন না করিলে অমরনাথ দর্শনের পুণ্য হয় না।

অমরনাথ তীর্থ দর্শনান্তে সম্বুদ্ধচৈতন্য পুনরায় শ্রীনগর আসিলেন। এইবার তিনি কাশ্মীরের নিম্নলিখিত স্থানসমূহ দর্শন করিলেন।

শ্রীনগর সহরের পূর্বাংশ শঙ্করাচার্য পর্বত নামে ৬২০০ ফুট উচ্চ একটি পর্বত আছে। উহার শীর্ষে জগদ্‌গুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত একটি মঠ আছে। এই মঠটিতে স্থায়ীভাবে কোন সাধু বাস করেন না। পর্বতের শীর্ষে উঠিবার জন্য পাথরের সিঁড়ি আছে। এইস্থান হইতে কাশ্মীরের দৃশ্য অতি মনোরম।

এই পর্বতটির উপরে সম্রাট অশোকের অন্যতম পুত্র জালক খ্রীস্টপূর্ব দুইশত অব্দে সর্বপ্রথম একটি বৌদ্ধমন্দির নির্মাণ করেন। খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতকে কাশ্মীরাধিপতি রাজা গোপাদিত্য উহাকে জ্যেষ্ঠেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে পরিণত করেন এবং তথায় একটি স্বতন্ত্র মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শেষোক্ত মন্দিরটির কোন কোন অংশের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীনগরের অন্যতম দর্শনীয় স্থান হইতেছে ডাল হ্রদ (Dal lake)। এই হ্রদটি শ্রীনগরের উপকণ্ঠে উত্তর-দক্ষিণে পাঁচ মাইল দীর্ঘ এবং পূর্ব-পশ্চিমে দুই মাইল বিস্তৃত। হ্রদটির পশ্চাতে ৪০০০ ফুট উচ্চ কয়েকটি পর্বত আছে। ডাল হ্রদের তীরে একস্থানে হজরৎবল নামে একটি বৃহৎ মসজিদ আছে। এইস্থানে হজরৎ মহম্মদ সেল্লেল্লা আলেহেসেল্লামের দুইগাছি মাথার কেশ আছে।

ডাল হ্রদে স্বর্ণলঙ্কা এবং রূপালঙ্কা নামক দুইটি দ্বীপ আছে। স্বর্ণলঙ্কা দ্বীপটি অতীব সুন্দর। উহা প্রায় চল্লিশ গজ দীর্ঘ।

সম্বুদ্ধচৈতন্য ডাল হ্রদে নৌকা ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই দেশে দুই মাঝির ছোট ছোট চ্যাপ্টা নৌকাকে শিকারা বলে। এই ডাল

হ্রদে এবং ঝিলাম নদীতে অনেক হাউস্ বোট (House boat) আছে। অনেক পর্যটক এবং মুসলমান মাঝি পুরুষানুক্রমে এই সকল হাউস বোটে বাস করে। ঝিলাম নদীটি শ্রীনগর সহরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। সাত-আটটি সেতুদ্বারা শ্রীনগর সহরের এই দুই অংশ সংযুক্ত।

শ্রীনগরে সম্বুদ্ধচৈতন্য কয়েকদিন নাগিন হ্রদে এক হোটেলের মালিকের অতিথি হিসাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। একদিন যখন তিনি নাগিন হ্রদ হইতে নৌকায় সহরে আসিতেছিলেন, তখন ঐ নৌকাতেই এক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ উঠিয়াছিলেন। সম্বুদ্ধচৈতন্য পূর্বেই নৌকায় উঠিয়া এক উচ্চ আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিটি নৌকায় উঠিলে সম্বুদ্ধচৈতন্যের সঙ্গী, ঐ হোটেলের মালিকের ভাই বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং সম্বুদ্ধচৈতন্যকে নীচে নামিয়া বসিতে ও আসনটি ঐ শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। ইহাতে পুরুষসিংহ সম্বুদ্ধচৈতন্যের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। তিনি জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "Why ? I am an Indian. I am not a slave. Why do you bear such a slave mentality ?" ("কেন ? আমি একজন ভারতীয়। আমি ক্রীতদাস নই। তুমি এমন দাস-মনোভাব পোষণ কর কেন ?")

শ্বেতাঙ্গ মহোদয় তখন বাধ্য হইয়াই নিম্নে অন্যান্য সকলের সঙ্গে উপবেশন করিলেন।

ঘটনাটি অতি সামান্য। কিন্তু ইহা ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্যের অসামান্য স্বদেশপ্রেম, আত্মমর্যাদাবোধ এবং তেজস্বিতার পরিচায়ক।

ডাল হ্রদের তীরে কয়েকটি নয়নানন্দকর উদ্যান আছে। সম্বুদ্ধচৈতন্য এই উদ্যানগুলি দর্শন করিয়াছিলেন।

হজরৎবল মসজিদের অদূরে নাসিমবাগ নামে একটি মনোরম

উদ্যান আছে। দিল্লীর সম্রাট মোগলকুলতিলক আকবর এই উদ্যানটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

স্বর্ণলঙ্কার সন্নিকটে সালিমারবাগ নামে প্রায় এক মাইল দীর্ঘ অপর একটি উদ্যান আছে। কয়েকটি পর্বতের পাদদেশে একটি সুবৃহৎ ঢালু ভূমিখণ্ডে এই উদ্যানটি অবস্থিত। উহার মধ্যে প্রায় একশতটি ফোয়ারা আছে। পার্শ্বস্থিত পার্বত্য ঝরণাসমূহ এই ফোয়ারাগুলিতে জল সরবরাহ করিতেছে। ঐ সকল ঝরণা-ধারাকে সুকৌশলে লুকায়িতভাবে আনয়ন করিয়া এই সকল ফোয়ারার মধ্য দিয়া পরিচালিত করা হইয়াছে। ফোয়ারাগুলির প্রবল জলরাশি ছয় সাতটি বৃহৎ ও উচ্চ সিঁড়ি দিয়া জলপ্রপাতের ন্যায় নিম্নে অবস্থিত হ্রদে যাইয়া পতিত হইতেছে। উদ্যানটির মধ্যে নানাবিধ ফল ও ফুলের গাছ রহিয়াছে। উদ্যানের মধ্যস্থলে একটি নানাবিধ কারুকার্যখচিত কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত বিশ্রামাগারও আছে। ১৬১৯ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীশ্বর সম্রাট জাহাঙ্গীব তদীয় পত্নী নূরজাহানের জন্য এই অপূর্ব-সুন্দর প্রমোদ-উদ্যানটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

ইহার অনতিদূরে নিশাৎবাগ নামক অপর একটি উদ্যান আছে। ইহা সম্রাট জাহাঙ্গীরের শ্বশুর এবং প্রধানমন্ত্রী আসফ খাঁ কর্তৃক নির্মিত। ইহা সালিমারবাগ হইতে সৌন্দর্যে কোন অংশে ন্যূন নহে।

রূপালঙ্কার সন্নিকটে সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক নির্মিত চশমাশাই নামক আরও একটি মনোরম উদ্যান আছে। "চশমা" কথাটির অর্থ "ঝরণা।" চশমাশাইতে সুস্বাদু জলের কয়েকটি ঝরণা আছে বলিয়া ঐ উদ্যানটির এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

সম্বুদ্ধচৈতন্য যখন চশমাশাই এবং নিশাৎবাগ দর্শন করেন তখন কলিকাতার প্রখ্যাত অধ্যাপক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সম্বুদ্ধচৈতন্য ডক্টর সরকারকে জিজ্ঞাসা

করিলেন, "আপনি ত সম্প্রতি ইটালী, জার্মানী ও সুইজারল্যাণ্ড ঘুরে এলেন। ওখানকার আল্পস্ ও ভারতের হিমালয় দেখে আপনার কি মনে হয়?"

অধ্যাপক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার ইহার উত্তরে বলিলেন, "হিমালয়ের সঙ্গে আল্পসের কোন তুলনাই হয় না। আল্পসের সৌন্দর্য এক রকম, হিমালয়ের সৌন্দর্য অন্য রকম। আল্পস্ যেন হিমালয়ের একটা peak (পর্বতশৃঙ্গ)। এদের তুলনাই হয় না।"

কাশ্মীরে অবস্থান কালে সম্বুদ্ধচৈতন্য মার্তণ্ড তীর্থস্থানটিও দর্শন করিয়াছিলেন। উহা শ্রীনগর হইতে ষাট মাইল দূরে অবস্থিত। মার্তণ্ডকে কাশ্মীরের গয়াধাম বলা যাইতে পারে। এইস্থানে কাশ্মীরী হিন্দুগণ তাহাদের পূর্বপুরুষের শ্রাদ্ধ, তর্পণ এবং পিণ্ড-দানাদি করিয়া থাকে। এই স্থানের সূর্যমন্দির বিখ্যাত। "মার্তণ্ড" কথাটির অর্থ "সূর্য।" সেইজন্যই স্থানটির এইপ্রকার নামকরণ হইয়াছে।

কাশ্মীরে সম্বুদ্ধচৈতন্য চব্বিশ-পঁচিশ দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সম্বুদ্ধচৈতন্যের শিশুসুলভ সরলতা, চৈতন্যের মত প্রেম এবং নারদের ন্যায় ভক্তি কাশ্মীরের বহু ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। শ্রীনগরের নারায়ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী সুখানন্দ মহারাজ তাঁহাকে এক বৎসর তাঁহার মঠে যাইয়া অবস্থান করিতে সাদর নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। গুলমার্গে অকস্মাৎ এক সময় সম্বুদ্ধচৈতন্য ঘোড়া হইতে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া যান। কাশ্মীরী পণ্ডিতগণ তখন তাঁহাকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া গিয়া চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা দ্বারা আরোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। ঐ পতনের ফলে সম্বুদ্ধচৈতন্য মস্তকে ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি যখন কাশ্মীর ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া দেশে ফিরিতে চাহিলেন, তখন কাশ্মীরী পণ্ডিতগণ তাঁহাকে ছাড়িতে

চাহেন নাই। মাত্র চব্বিশ-পঁচিশ দিনের মধ্যে তিনি স্বীয় চরিত্র-মাধুর্যে তথাকার সকলকে একান্ত আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাকে পরম আত্মীয় বলিয়া মনে করিত।

সম্বুদ্ধচৈতন্যের কাশ্মীর ভ্রমণের প্রায় কুড়ি-বাইশ বৎসর পরে বর্তমান গ্রন্থের লেখক যখন কাশ্মীর ভ্রমণে গিয়াছিল, তখন সে নারায়ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী সুখানন্দ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। সম্বুদ্ধচৈতন্য (তখন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ) লেখকের সহিত স্বামী সুখানন্দকে তল্লিখিত একখানি পুস্তক উপহারস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের সহিত লেখকের সম্পর্কের কথা জানিয়া স্বামী সুখানন্দ লেখককে বিশেষভাবে আদরযত্ন করিয়াছিলেন এবং খুঁটিয়া খুঁটিয়া স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত বেলানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম সম্পর্কে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সেদিন স্বামী সুখানন্দ কথাপ্রসঙ্গে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ সম্পর্কে লেখকের নিকট বলিয়াছিলেন, "ও রকম সাধু এবং প্রেমিক পুরুষ আমি খুব কমই দেখেছি। আপনি অশেষ ভাগ্যবান্ যে তাঁকে গুরুরূপে লাভ করেছেন।"

কেবলমাত্র স্বামী সুখানন্দই নহেন, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের সহিত এই গ্রন্থের লেখকের সম্পর্কের কথা জানিতে পারিয়া আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের মঠাধ্যক্ষ স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ মহারাজ লেখককে বলিয়াছিলেন, "আপনার গুরুদেবের কাছে আমরা বিশেষ ভাবে ঋণী। বেলুড় মঠ হতে যখনই আমরা বেদান্তমঠে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে দর্শন ও প্রণাম করতে যেতাম, আমাদের তখন মোটেই কোন বেগ পেতে বা দেরী করতে হত না। আপনার গুরুদেব তাড়াতাড়ি করে আমাদের দর্শনের সব ব্যবস্থা করে দিতেন। রবি মহারাজের মধুর ব্যবহারের কথা ভোলবার নয়।"

কাশ্মীর-শ্রীনগর হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে বানিহাল পাশ অতিক্রম করিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য জম্মু, অমৃতসর, লাহোর, কুরুক্ষেত্র,

পাঞ্জাসাহেব, আম্বালা, তক্ষশীলা এবং পাঞ্জাবের অন্যান্য স্থান পরিভ্রমণ করেন। অতঃপর তিনি দেরাতুনে আগমন করেন। দেরাতুনে সম্বুদ্ধচৈতন্য শ্রীযুক্তা মিত্রের আতিথ্য গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্তা মিত্র কাশ্মীরের ভূতপূর্ব মন্ত্রী-এ. টি. মিত্রের বিধবা পত্নী। এ. টি. মিত্র মহাশয় যখন কাশ্মীরের মন্ত্রী ছিলেন, তখন স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজজী কাশ্মীর পর্যটনে গিয়াছিলেন। সেই সময় এই মহীয়সী মহিলা স্বামী বিবেকানন্দকে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা মিত্র তখন প্রত্যহ নানাবিধ সুস্বাদু ব্যঞ্জনাদি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া স্বামিজীর হাউস-বোটে পাঠাইয়া দিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইতেন।

সম্বুদ্ধচৈতন্য যখন দেরাতুন গিয়াছিলেন শ্রীযুক্তা মিত্রা তখন বৃদ্ধা। তিনি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে সম্বুদ্ধচৈতন্যের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাহিত্য এবং তাঁহাদের ভাবাদর্শ সম্পর্কে নানাপ্রকার আলোচনা করিতেন।

দেরাতুনে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য কাশীধাম গমন করেন এবং বিশ্বনাথকে দর্শন ও পূজাদি করিয়া তথা হইতে তিনি শারদীয়া পূজার পূর্বে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ বৎসর (১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দ) কলিকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের দুর্গাপূজায় সম্বুদ্ধচৈতন্য পৌরহিত্য করিয়াছিলেন।

১১

১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে সম্বুদ্ধচৈতন্য পুনরায় তীর্থপর্যটনে বহির্গত হইলেন। তিনি সঙ্কল্প কবিলেন যে আসন্ন শিবরাত্রি উপলক্ষে তিনি নেপালের বিখ্যাত পশুপতিনাথকে দর্শন করিবেন।

কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য প্রথমে নেপালের বীরগঞ্জ নামক একটি স্থানে গমন করেন; পরে তথা হইতে ছোট ট্রেনে কিয়দ্দূর গমন করিয়া অবশেষে পদব্রজে কাঠমুণ্ডু শহরে উপস্থিত হইলেন। কাঠমুণ্ডু নেপাল রাজ্যের রাজধানী।

কাঠমুণ্ডু হইতে সম্বুদ্ধচৈতন্য পশুপতিনাথ গমন করিয়া বিগ্রহ দর্শন করিলেন। সেদিন শিববাত্রি। সম্বুদ্ধচৈতন্য সমস্ত রাত্রি পশুপতিনাথের মন্দিরে অতিবাহিত করিয়া শিবপূজা এবং ধ্যানজপাদি করিলেন। সর্বক্ষণ শিবভাবে বিভোর থাকিয়া তিনি শিবস্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন,—

"পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং
গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং বসানং বরেণ্যম্।
জটাজুটমধ্যে স্ফুরদ্ গঙ্গাবারিং
মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরারিম্॥
মহেশং সুরেশং সুরারাতিনাশং
বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষম্।
বিরূপাক্ষমিন্দ্বর্কবহ্নিত্রিনেত্রং
সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্ত্রম্॥

মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় একদিন গভীর নিশীথে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পঞ্চপাণ্ডবকে বধ করিবার মানসে তাঁহাদের শিবিরে গমন করেন। ঐ সময় স্বয়ং মহাদেব পাণ্ডবদের শিবিরদ্বার রক্ষা করিতেছিলেন। অশ্বত্থামা পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করিতে গেলে প্রহরারত মহাদেব তাঁহাকে বাধা দিলেন। তখন উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হয়। যুদ্ধে অশ্বত্থামা পরাজিত হইয়া মহাদেবের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। আশুতোষ অশ্বত্থামার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শিবিরের দ্বার ছাড়িয়া দিলেন। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম মহাদেবের এই ব্যবহার দর্শনে ভীষণ ক্রুদ্ধ হন এবং মহাদেবকে বধ করিবার জন্য খড়্গহস্তে তৎপ্রতি ধাবিত হন। মহাদেবও আত্মরক্ষার জন্য এক মহিষমূর্তি ধারণপূর্বক দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে থাকেন এবং শেষপর্যন্ত একটি পর্বতকন্দরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভীমও ঐ মহিষের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া অনতিবিলম্বে ঐ পর্বতকন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হস্তস্থিত খড়্গাঘাতে মহিষটিকে হত্যা করেন। তখন ঐ মহিষের মুণ্ডহীন দেহটি কেদারনাথ শিবে, মুণ্ডটি পশুপতিনাথ শিবে এবং একটি পদ তুঙ্গনাথ শিবে রূপান্তরিত হয়।

প্রবাদ আছে যে, এই তিন শিব দর্শন না করিলে সম্পূর্ণ কেদারনাথ শিবকে দর্শন করা সার্থক হয় না। সম্বুদ্ধচৈতন্য এই তিন শিবই দর্শন করিয়াছেন।

পশুপতিনাথে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য এক দিবস প্রায় এক মাইল দূরে এক অরণ্যে বাবা শিবপুরীকে দর্শন করিতে গমন করেন। বাবা শিবপুরীর সন্ন্যাস-আশ্রমের প্রকৃত নাম স্বামী গোবিন্দানন্দ পুরী। স্থানীয় একটি পর্বতশিখরের নাম শিবপুরী। স্বামী গোবিন্দানন্দ পুরী বহু বৎসর ঐ পর্বত-শিখরে অবস্থান করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ তাঁহাকে “বাবা শিবপুরী” নামেই অভিহিত

করিয়া থাকেন। সম্বুদ্ধচৈতন্য যখন বাবা শিবপুরীকে দর্শন করেন তখন তাঁহার বয়স একশত আটাশ বৎসর। গৃহাশ্রমে বাবা শিবপুরী দক্ষিণ ভারতের কেরল দেশের অধিবাসী ছিলেন। তিনি তথাকার নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

বাবা শিবপুরী সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকেও দর্শন করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকার চিকাগো শহরে বেদান্ত প্রচার করিতেছিলেন, বাবা শিবপুরীও তখন তথায় ছিলেন। চিকাগো শহরেই বাবা শিবপুরী স্বামী বিবেকানন্দজীকে দর্শন করিয়াছিলেন।

সম্বুদ্ধচৈতন্য বাবা শিবপুরীকে করজোড়ে প্রণাম করিয়া অনুরোধ করিলেন, "আপনি কৃপা করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিছু বলুন।"

স্বামী বিবেকানন্দের নাম শ্রবণমাত্র বাবা শিবপুরীর শরীরখানি যেন বারংবার শিহরিত এবং রোমাঞ্চিত হইল। শ্রদ্ধাপ্লুত সুগম্ভীর কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ! স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় অবতার।"

এই কথা বলিয়া বাবা শিবপুরী স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ করজোড়ে প্রণাম করিলেন; অবশেষে গভীর ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন।

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথি দিবসে সম্বুদ্ধচৈতন্য বাবা শিবপুরীকে বলিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে কিছু বলুন।"

তদুত্তরে বাবা শিবপুরী সম্বুদ্ধচৈতন্যকে বলিলেন, "প্রত্যেক দিনই শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মদিন বলে মনে করতে হবে; তবেই তাঁকে সর্বদা স্মরণ-মনন করা হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর দেশ ও কালের অতীত। একটি বিশেষ দিনে তাঁর জন্মোৎসব পালন করে তাঁকে স্মরণ করা কেন? তিনি তো আমাদের সর্বদা স্মর্তব্য।"

সম্বুদ্ধচৈতন্যকে উপদেশ-প্রদান-সম্পর্কে বাবা শিবপুরী আরও বলিলেন, "এই সংসারে এসে শরীরকে পালন করা আর আত্মাকে পালন করা,—এ দুটো জিনিস জানা বিশেষ দরকার। এ দুটো জানাতেই জীবের পূর্ণতা লাভ হয়।"

বাবা শিবপুরী আরও বলিলেন, "সব কাজ ছেড়ে এখানে জঙ্গলে এসেছি চিত্তকে স্থির রাখবার জন্য! নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মত, নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপ শিখার মত ভগবানকে সর্বদা স্মরণ-মনন করে যেতে হবে। মনটাকে স্থির করে, তাঁর যে কোন একটি নাম ধরে ডাকতে পারলেই তাঁকে জানতে পারা যায়। সাধককে সর্বাবস্থায় তৈলধারার ন্যায়, নিষ্কম্প প্রদীপ-শিখার ন্যায় থাকতে হবে।"

বাবা শিবপুবীব উপদেশ শ্রবণে সম্বুদ্ধচৈতন্যের মনে হইল গীতার কথা। গীতায় ধ্যানযোগের কথাপ্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, মনটাকে স্থির করিতে হইবে। সাধনা দ্বারা মনকে যদি ভগবানের চিন্তায় সম্পূর্ণ স্থির করা যায়, তাহা হইলেই ভগবান্ লাভ হয়। মনকে কি প্রকারে স্থিব করিতে হইবে?—একটি পাত্র হইতে অপর একটি পাত্রে তৈল ঢালিবার সময় সেই তৈলের ধারা যেমন নিরবচ্ছিন্ন হয়, আমাদের চিন্তার ধারাকেও তদ্রূপ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ভগবানের দিকে প্রবাহিত করিতে হইবে। যেস্থানে বায়ু-প্রবাহ নাই, তথায় প্রদীপের শিখা যেরূপ নিষ্কম্প থাকে, মনকে তদ্রূপ নিষ্কম্প করিতে হইবে।—"যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে।" মন এই প্রকার একাগ্র হইলেই ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

এই চঞ্চল মনকেও স্থির করা যায়,—যদিও ইহা বড়ই শক্ত ব্যাপার। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চঞ্চল মনকে স্থির করা সম্ভব। যোগসূত্রে মহর্ষি পতঞ্জলিও এই কথা বলিয়াছেন,—"অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।"

"ধারা" শব্দটি উল্টাইলে "রাধা" হয়। বৃন্দাবনের রাধা পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে ঐরূপ তৈলধারার মতই স্মরণ-মনন করিতেন বলিয়াই তিনি রাধা।

নেপাল হইতে সম্বুদ্ধচৈতন্য কাশীধাম আগমন করিলেন।

কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা।
ভক্তিঃ শ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজগুরুচরণধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ॥
বিশ্বেশোঽয়ং তুরীয়ঃ সকলজনমনঃ সাক্ষিভূতোঽন্তরাত্মা।
দেহে সর্বং মদীয়ে যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যৎ কিমস্তি॥

সেদিন ১লা বৈশাখ, ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ। সম্বুদ্ধচৈতন্য পদ্মফুল দ্বারা কাশী বিশ্বনাথকে পূজা করিলেন।

ভূতাধিপং ভুজগভূষণভূষিতাঙ্গং
ব্যাঘ্রাজিনাম্বরধরং জটিলং ত্রিনেত্রম্।
পাশাঙ্কুশাভয়বরপ্রদশূলপাণিং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্॥
শীতাংশুশোভিতকিরীটবিরাজমানং
ভালেক্ষণানলবিশোষিতপঞ্চবাণম্।
নাগাধিপারচিতভাস্বরকর্ণপূরং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্॥

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শনের নিমিত্ত সম্বুদ্ধচৈতন্য একদিন কাশী হইতে যাত্রা করিলেন। তিনি আলমোড়া হইয়া লিপুলেক পাস (গিরিবর্ত্ম) অতিক্রম করিয়া কৈলাস ও মানস সরোবরে আগমন করেন। মানস সরোবর হইতে কৈলাস ষোল মাইল দূরে অবস্থিত। কৈলাস-মানস সরোবর পরিক্রমায় সম্বুদ্ধচৈতন্যের বার দিন লাগে। মানস সরোবরের দুর্গম পথের কষ্ট, আহারাদির কষ্ট, সমস্তই দূর হয় সরোবরের

অপরিসীম ও অতুলনীয় সৌন্দর্য দর্শনে। এই আনন্দ যেন বন্ধ্যা নারীর পুত্রমুখ দর্শনের আনন্দের ন্যায়।

গুরুপূর্ণিমার রাত্রে মানস সরোবরের তীর হইতে গুরলা মান্ধাতা পর্বতের সৌন্দর্য সম্বুদ্ধচৈতন্যের নিকট অপরূপ মনে হইতেছিল। সেদিন রাত্রে মানস সরোবরের তীরে সম্বুদ্ধচৈতন্য যখন ধ্যান করিতেছিলেন তখন তাঁহার এক অপূর্ব দর্শন ও বিচিত্র অনুভূতি হয়। মানস সরোবর চওড়ায় প্রায় ষোল মাইল এবং উহার পরিধি চুয়ান্ন মাইল। মানস সরোবর পরিক্রমায় সম্বুদ্ধ-চৈতন্যের আট দিন লাগে। এই আট দিন তিনি কখনও প্রাতে, কখনও মধ্যাহ্নে সরোবরে স্নান করিতেন।

মানস সরোবর হইতে সম্বুদ্ধচৈতন্য যেদিন কৈলাস পৌঁছাইলেন, সেদিন তিনি একুশ হাজার ফুট পর্বতারোহণ করেন। কৈলাস পর্বত ২২০২৮ ফুট উচ্চ। পথে সূর্যাস্ত হইয়া আসিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রায় দশ মিনিট তথায় প্রচণ্ড তুষারবৃষ্টি হইল। অতঃপর জমাট বরফ গলিয়া রাস্তা জলময় হইয়া গেল। এইরূপ পিচ্ছিল জলময় পার্বত্য পথ অতিক্রম করা একপ্রকার দুঃসাধ্য। সম্বুদ্ধচৈতন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেন ঐ পথ অতিক্রম করিতে; কিন্তু কৃতকার্য হইলেন না। এইরূপ প্রচণ্ড স্রোত সেখানে! অতঃপর নিরুপায় হইয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য কাতরভাবে কৈলাসপতির নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—

কৈলাসশৈলনিবাস বৃষাকপে হে
মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্নিবাস।
নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥
বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশিত বিশ্বরূপ
বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈকগুণাধিবাস।
হে বিশ্ববন্দ্য করুণাময় দীনবন্ধো
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥

প্রার্থনান্তে সম্বুদ্ধচৈতন্য "জয় কৈলাসপতি কি জয়" বলিয়া লাঠিতে ভর দিয়া দুই লাফে ঐ মহাদুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া গেলেন। ইহাতে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রাদি সব জলে ভিজিয়া গেল। তিনি ভীষণ শীতে আড়ষ্ট হইয়া পড়িলেন।

আড়ষ্ট শরীর লইয়াই কোনক্রমে দশ-বার মিনিট হাঁটিবার পর সম্বুদ্ধচৈতন্য একটি পার্বত্য স্রোতস্বতী নদীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ নদীটি তখন গলিত বরফের জলে কাণায় কাণায় পূর্ণ। ঐ নদীর জল এতই ঠাণ্ডা এবং সেখানে এমন প্রচণ্ড স্রোত যে উহা অতিক্রম করা একপ্রকার অসাধ্য। উহা অতিক্রম করিবার জন্য জলে পা দিতেই সম্বুদ্ধচৈতন্যের পা যেন ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হইয়া গেল। অথচ নদীর অপর তীরে একজন সাধু সম্বুদ্ধচৈতন্যকে লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় সম্বুদ্ধচৈতন্য এই তীরে বসিয়া ভাবিতেছেন। এমন সময় অকস্মাৎ তিনি দেখিলেন, একজন অপরিচিত তিব্বতী ডাবা (ব্রহ্মচারী) সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই অসময়ে জনবিরল এই পার্বত্য প্রদেশে তিনি যেন স্বয়ং ঈশ্বরপ্রেরিত দেবদূতের ন্যায় সম্বুদ্ধচৈতন্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। সম্বুদ্ধ-চৈতন্য তাঁহাকে কাছে পাইয়া বলিলেন, "আমাকে নদী পার করে দাও, তোমাকে বকশিস্ দেব।"

আগন্তুক তিব্বতী ডাবা নীরবে সম্বুদ্ধচৈতন্যকে তাঁহার পিঠে লইয়া নদী পার করিয়া দিলেন। নদীতে তখন এমন প্রচণ্ড স্রোত যে তাঁহার হাতের লাঠিটি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল এবং তিনিও যেন মধ্যে মধ্যে ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিতেছিলেন। তথাপি সম্বুদ্ধচৈতন্যকে পিঠে লইয়া অতি সন্তর্পণে তিনি নির্বিঘ্নেই নদী পার হইয়া আসিলেন।

নদী পার হইয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য ঐ তিব্বতী ডাবাকে কিছু কিস্‌মিস্ ও আখরোট দিলেন। তিনিও তাহা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর

সম্বুদ্ধচৈতন্য তাঁহাকে কিছু পয়সা দিতে গেলে তিনি কিন্তু তাহা গ্রহণ করিলেন না। সম্বুদ্ধচৈতন্যের নিকট বিদায় লইয়া তিনি স্বীয় গন্তব্য পথের দিকে চলিতে লাগিলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই পাহাড়েব অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

সম্বুদ্ধচৈতন্যের নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল। কে এই তিব্বতী ডাবা? লোকালয়হীন নির্জন পার্বত্য প্রদেশে এই অসময়ে কে এই ব্যক্তি সম্বুদ্ধচৈতন্যের সাহায্যেব জন্য ছুটিয়া আসিয়াছেন? ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করিতে পারিতেন না। এই তিব্বতী ডাবাও সম্বুদ্ধচৈতন্যের নিকট হইতে কোন পয়সা গ্রহণ করিলেন না। সম্বুদ্ধচৈতন্যের চকিতে মনে হইল, ইনিই কি তিনি? তিব্বতী ডাবা-রূপী শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উদ্দেশ্যে অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন।

নদী পার হইয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য অপেক্ষমান সাধুর স্কন্ধে ভর দিয়া কৈলাসে তাঁহাদের তাঁবুতে আগমন করিলেন। তথায় কৈলাসপতিকে দর্শন হইল। তিনি সত্য, তিনি শিব, তিনি সুন্দর। এখানে তাঁহার সৌন্দর্য সর্ব আভরণহীন, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। দিগন্ত প্রসারিত উদার গম্ভীর নীল আকাশের নিম্নে দণ্ডায়মান কৈলাসপতি যেন বিশ্বজগৎকে অনাহত নাদে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, "দেখ, দেখ, আমার নগ্ন সৌন্দর্য দেখ।" কৈলাসপতির এই নিরাভরণ অপার্থিব সৌন্দর্য দর্শনে সম্বুদ্ধচৈতন্যের মন অন্তর্মুখী হইয়া পড়িল। বস্তুতঃ, অন্তর্লোকে মন যেখানে লয় হইয়া থাকে, সেখানেই কৈলাসপতির যথার্থ দর্শন লাভ হয়।

পরদিবস সম্বুদ্ধচৈতন্য গৌরীকুণ্ড দর্শন করিলেন। অত্যধিক ঠাণ্ডা এবং তুষারবৃষ্টি হইতেছিল বলিয়া তিনি আর উহাতে স্নান করিলেন না; উহার জল মস্তকে লইলেন। তথাপি তুষারবৃষ্টিতে সম্বুদ্ধচৈতন্যের পরিধেয় বস্ত্রাদি ভিজিয়া গেল।

সম্বুদ্ধচৈতন্য যে দলের সহিত কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শনে

গিয়াছিলেন, সেই দলে ডাক্তার সেন নামে এক ব্যক্তিও ছিলেন। তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা সকলে অশ্বপৃষ্ঠে কিংবা জব্বুতে কৈলাস দর্শনে গমন করেন, তিনি সমগ্র পথ পদব্রজে গমন করিয়া তাহা দর্শন করিবেন। দর্পহারী নারায়ণ। পথে ডাক্তার সেনের ভীষণ শৈলপীড়া (Hill diarrhoea) দেখা দিল। পেটে অসহ্য ব্যথায় তিনি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অন্যতম সঙ্গী জনৈক মাদ্রাজী সাধু স্বামী মাধবানন্দের সহিত কিছু মৃগনাভি কস্তুরী ছিল। তিনি ডাক্তার সেনকে উহা বার দুই তিন সেবন কবাইয়া দিলেন। দলের অন্যান্য সকলেও উহা একবাব করিয়া সেবন করিলেন। ইহাতে সকলের আড়ষ্ট শরীর উষ্ণ হইল বটে, কিন্তু ডাক্তার সেনের পেটের পীড়ার কোন উপশম হইল না।

সেদিন সম্বুদ্ধচৈতন্য প্রভৃতি সকলে সারাদিন চড়াই-উৎরাই করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক গুম্ফাতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাত্রিতে ডাক্তার সেনের পেটব্যথা তীব্র আকার ধারণ করিল। পেটের বেদনা তাঁহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে এই নিদারুণ ব্যথা উপশমের জন্য কয়েকবার ঔষধ সেবন করান হইল। কিন্তু কোন ঔষধেই উহার উপশম হইল না।

পরদিবস প্রভাতে সম্বুদ্ধচৈতন্য প্রভৃতি সকলে গুম্ফা পরিত্যাগ করিয়া রওনা হইলেন। পীড়িত ডাক্তার সেনের জন্য ঘোড়া ভাড়া করা হইল। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। ডাক্তার সেনের মনে একটি প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার ছিল, রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামিজীরা ঘোড়ায় চড়িয়া কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শন করেন, তিনি তাহা পদব্রজেই পর্যটন করিবেন। আজ দর্পহারী নারায়ণ যেন তাঁহার সকল অভিমান এবং অহঙ্কার চূর্ণ করিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতেই ডাক্তার সেন অশ্বপৃষ্ঠে রওনা হইলেন, বারংবার বলিতে লাগিলেন, "আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হল না! আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হল না।"

সম্বুদ্ধচৈতন্য পায়ে হাঁটিয়াই চলিলেন। তাঁহাদের দলের সঙ্গে দুইজন পথপ্রদর্শক (guide) ছিল। ডাক্তর সেনের অবস্থা দর্শনে সম্বুদ্ধচৈতন্যের বারংবার মনে হইতেছিল, তাঁহাদের কৈলাস এবং মানস সরোবর পরিক্রমা বোধহয় মধ্যপথেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাঁহাদের এই তীর্থপর্যটন যাহাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য সম্বুদ্ধচৈতন্য কৈলাসপতির নিকট মনে মনে পুনঃ পুনঃ সকাতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এইবার যে স্থানে তাঁবু পড়িল, তথায় ডাক্তার সেনকে পুনরায় ঔষধ সেবন করান হইল ; কিন্তু তাঁহার ব্যথার কোন উপশম হইল না। তিনি ব্যথায় পূর্ববৎ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি বলিলেন, "যদি মরতে হয়, এখানেই যেন মরি ! মানস সরোবরের তীরে যদি মরিতো ভালই !" সমস্ত দিন তিনি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়াছেন, এখন রাত্রিতেও ছট্‌ফট্ করিতেছেন !

রাত্রি তখন প্রায় সাতটা-আটটা হইবে। সম্বুদ্ধচৈতন্য প্রভৃতির দলে একজন মাদ্রাজী এ্যাড্‌ভোকেট্ (advocate) ছিলেন। তাঁহার সহিত কিছু কবিরাজী ঔষধ ছিল। তিনি একট ঔষধ বাহির করিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্যের হাতে দিয়া বলিলেন, "ডাক্তার সেনকে এই কবিরাজী ঔষধটা খাইয়ে দেখেন তো !" সেই রাত্রিতে ডাক্তার সেনকে ঐ কবিরাজী ঔষধটা দুই তিনবার খাওয়াইয়া দিতেই তাঁহার যন্ত্রণার ও কষ্টের উপশম হইল। তীর্থস্থানে অহঙ্কার করিবার জন্য ডাক্তার সেনের প্রায়শ্চিত্ত এতক্ষণে সম্পূর্ণ হইল। তীর্থস্থানে দেবতার কৃপাভিক্ষু কাহারও অহঙ্কার করা উচিত নয়।

পরিক্রমার পথে সম্বুদ্ধচৈতন্য প্রভৃতি সকলে পুনরায় মানস সরোবরের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তথায় তিন-চারিদিন বাসও করিলেন। তাঁহাদিগকে কৈলাস ও মানস সরোবর পরিক্রমা সম্পূর্ণ করিতে মোট বারদিন অতিবাহিত হইয়াছিল। মানস সরোবরের তীরে সম্বুদ্ধচৈতন্যের মন সর্বদাই

অন্তর্মুখী হইয়া থাকিত। রাত্রিতে যখন সকলে তাঁবুতে নিদ্রাভিভূত থাকিত, তখন সম্বুদ্ধচৈতন্য সরোবরের তীরে ধ্যান-ধারণায় মগ্ন থাকিতেন। কৈলাস পর্বতে পাঁচটি গুম্ফা আছে। এই পাঁচটি গুম্ফাকে কল্পনা করা হইয়াছে শিবের পঞ্চ আনন, কৈলাসপতির আনন। তাই শিবের এক নাম পঞ্চানন।

সম্বুদ্ধচৈতন্য প্রভৃতি সকলে মানস সরোবর পরিক্রমা করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। পথে তিব্বতের তাক্‌লাকোট হইতে তাঁহারা সকলে একদিন খেচরনাথ তীর্থ দর্শনে গমন করিলেন। খেচরনাথ তিব্বতীদের প্রধান তীর্থ। তথায় সম্বুদ্ধচৈতন্য খেচরনাথের মন্দিরে বুদ্ধদেব ও প্রজ্ঞাপারমিতা, মঞ্জুশ্রী, কালী, বোধিসত্ত্ব প্রভৃতির মূর্তি দর্শন করিলেন। খেচরনাথ মন্দিরে এই কালীমূর্তি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই মন্দির দর্শনের পর অপরাহ্নে প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁহাদের পথপ্রদর্শক (guide) বলিল, "আপনারা একটু ধীরে ধীরে চলুন। আমি গ্রাম থেকে একবার ঘুরে আসি।"

ক্রমে তাঁহারা একটি নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকালের দিকে খেচরনাথ তীর্থ গমনের পথে এই নদীটিতে এক-হাঁটু জল ছিল, এখন প্রত্যাবর্তনের পথে এখানে এক-বুক জল হইয়াছে। পাহাড়ের বরফ-গলা জল। ভীষণ শীতল। দলের সদানন্দ স্বামী অশ্বপৃষ্ঠে নদীটি অতিক্রম করিতে উদ্যত হইলেন। কিছুদূর গমন করিবার পর পার্বত্য নদীর প্রচণ্ড স্রোতে সদানন্দ স্বামীর অশ্বটি আর ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারিল না। স্রোতের প্রচণ্ড বেগে অশ্বসহ সদানন্দ স্বামী ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। গ্রাম হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পথপ্রদর্শক (guide) কিস্‌খাম্বা দূর হইতেই এই দৃশ্য দেখিতে পাইল। সে তখন দৌড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়া নদীতে ঝম্প প্রদান করিল এবং নিজের প্রাণ উপেক্ষা করিয়া অশ্বসহ সদানন্দ স্বামীকে রক্ষা করিল।

পার্বত্য নদীর প্রস্তরাঘাতে সদানন্দ স্বামীর দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাকে কিঞ্চিৎ সুস্থ করিয়া পুনরায় ঘোড়ায় চড়াইয়া কিস্‌খাম্বা ও তাহার ভাই দুই পাশে থাকিয়া বিরাট বিকট চড়াই উত্তীর্ণ করাইয়া এক ময়দানে লইয়া আসিল। (পাহাড়ের উপর সমতল স্থানকে ময়দান বলে।) ময়দানে আসিয়া সদানন্দ স্বামীকে মাটিতে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। সেবাশুশ্রূষা করিয়া তাঁহার শরীর উত্তপ্ত করা হইল। কিস্‌খাম্বা নিজের শুষ্ক পরিধেয় বস্ত্র এবং আলখাল্লা সদানন্দ স্বামীকে পরাইয়া দিল। অতঃপর সকলে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাক্‌লাকোট ফিরিয়া আসিলেন।

কৈলাস ও মানস সরোবর তীর্থ পর্যটন কালে সম্বুদ্ধচৈতন্য প্রভৃতি তাঁহাদের মালপত্রগুলি প্রতিদিন সকালে গুছাইয়া দিতেন। পথপ্রদর্শক (guide) কিস্‌খাম্বা জব্ব ও ঘোড়াতে ঐ সকল মালপত্র গুছাইয়া লইত। তাহার এই কার্যে একদিন কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল। ইহাতে দলের জনৈক সাধু বিরক্ত হইয়া রূঢ় কণ্ঠে কিস্‌খাম্বাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "তোমার এত দেরী হল কেন?"

যে সাধু কিস্‌খাম্বাকে এই রূঢ়বাক্য বলিলেন, তিনি ইহার পূর্বে পাঁচ-ছয়বার কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শন করিয়াছেন। কিস্‌খাম্বা ইহা জানিত। নিরক্ষর পথপ্রদর্শক (guide) কিস্‌খাম্বা উক্ত সাধুকে তখনই গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "আপনারা মহাত্মা! আপনারা তীর্থদর্শন করবেন একবার। বার বার তীর্থদর্শন করে লাভ কি? সাধু বার বার তীর্থে যাবেন কেন? সাধু-মহাত্মারা সব তীর্থ একবার করে দর্শন করে বুঁদ হয়ে এক জায়গায় বসে থাকবেন,—ধ্যান-ধারণা করবেন।"

কিস্‌খাম্বার মুখে এই রূঢ় সত্যবাক্য শ্রবণে উক্ত সাধু লজ্জায় অধোবদন হইলেন।

কৈলাস ও মানস সরোবর তীর্থ পর্যটন কালে একদিনের একটি ঘটনা সম্বুদ্ধচৈতন্যের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। "যেখানে

বাঙ্গালী, সেখানে দলাদলি।”—পথে একদিন সামান্য একটা বিষয় লইয়া ইস্ট বেঙ্গল সোসাইটীর বিপিনবাবু এবং ডাক্তার সেনের মধ্যে প্রথমে কথা কাটাকাটি, পরে ভীষণ ঝগড়া বাঁধিয়া যায়। তাঁহাদের এই ঝগড়ায় তীর্থযাত্রীদলের সকলের দুই দলে বিভক্ত হইবার ইচ্ছা জাগিল।

আপন ভাবে-বিভোর সম্বুদ্ধচৈতন্য এই ঝগড়ায় অংশগ্রহণ করিলেন না। তিনি সকলের আগে হাঁটিয়া তাঁহাদের গন্তব্যস্থল ধারচুলা ডাকবাংলোতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করিবার জন্য তিনি একটী খাটে শুইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

ক্রমে দলের অন্যান্য সকলে ডাকবাংলোতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে বিপিনবাবু সম্বুদ্ধচৈতন্যকে স্নানাগারে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, “আজ হতে আমরা পৃথক খাবো, ওরা পৃথক খাবেন।”

সম্বুদ্ধচৈতন্য বুঝিলেন, ইহা পূর্বোক্ত কলহের পরিণতি! বিপিনবাবুর মুখে এই কথা শুনিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। “পৃথক খাবেন! সে কি! এক তীর্থে এসে......” বলিতে বলিতে সম্বুদ্ধচৈতন্য অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আবেগকম্পিত দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। প্রস্তরনির্মিত মেঝে পড়িয়া গেলে তিনি মস্তকে ভীষণ আঘাত পাইবেন,—এই আশঙ্কায় সকলে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। বিপিনবাবু চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন,—“স্বামিজী, আমি মহাপাপী! স্বামিজী, আমি মহাপাপী! আমি কি করলাম!”—চীৎকার ও কান্না শুনিয়া বারান্দা হইতে ডাক্তার সেন ছুটিয়া আসিলেন। তিনি সম্বুদ্ধচৈতন্যের নাড়ি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, উহা অতি ক্ষীণ! তিনি সম্বুদ্ধচৈতন্যকে মাটিতে শোয়াইয়া দিয়া বাতাস করিতে বলিলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সম্বুদ্ধচৈতন্যের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তাঁহাকে তখন সকলে ধরাধরি করিয়া খাটে আনিয়া শোয়াইয়া দিলেন। ডাক্তার সেন তাঁহাকে তিনদিন শয্যাশায়ী থাকিয়া পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিতে বলিলেন।

সম্বুদ্ধচৈতন্য দিনের বেলায় শয্যাশায়ী থাকিলেও গভীর রাত্রে, সকলে যখন নিদ্রিত থাকিত তখন সকলের অগোচরে পার্শ্ববর্তী একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে বাঁধান বেদীতে বসিয়া ধ্যান-জপ করিতেন এবং কাতরে কৈলাসপতির নিকট প্রার্থনা করিতেন, তিনি যেন নির্বিঘ্নে তীর্থ পরিক্রমা সম্পন্ন করিতে পারেন। এই ঘটনার পরেই সকলের মনের পরিবর্তন হইল এবং সমস্ত বিবাদ মিটিয়া গেল।

এদিকে ধারচুলা ডাকবাংলোতে সম্বুদ্ধচৈতন্যের এই অবস্থা! তীর্থযাত্রীদলের কয়েকজন পথের কষ্ট লাঘব ও অসুবিধা দূর করিবার জন্য স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "যে কৈলাসপতি কলকাতা হতে টেলিগ্রাম করে আপনাদের এ পথে নিয়ে এসেছেন, তিনিই নির্বিঘ্নে পৌঁছে দেবেন। কেবল তাঁর শরণাগত হোন।"

যাহা হউক, চতুর্থ দিন তাঁহারা সকলে ধারচুলা ডাকবাংলো ত্যাগ করিলেন। পথের নানাবিধ দুঃখকষ্টের জন্য যাত্রীদের মধ্যে কোন মনোমালিন্য দেখা দিলে জিতেনবাবু সম্বুদ্ধচৈতন্যকে বলিতেন, "স্বামিজী, আবার ঐরকম করুন। সব মিটমাট হয়ে যাবে।"

সম্বুদ্ধচৈতন্য হাসিয়া বলিতেন, "সে কি! আমি নিজে ইচ্ছে করে কি ওই রকম করেছি?"

যাহা হউক, ঐরূপ মনোমালিন্য আর তীব্র আকার ধারণ করিতে পারিত না। উহা ধীরে ধীরে দূর হইয়া যাইত এবং আর কখনও বিবাদ হইত না।

কৈলাস ও মানস সরোবরের এই তীর্থ পর্যটনে সম্বুদ্ধচৈতন্যের অভিজ্ঞতা এই যে, তীর্থ পর্যটনকালে দুঃখকষ্টময় পথে বন্ধুব সহিত মনোমালিন্য হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু উহা সহ্য করা উচিত। প্রত্যেকেরই সহিষ্ণু ও উদার হওয়া কর্তব্য।

কৈলাস ও মানস সরোবর তীর্থ পর্যটনান্তে সম্বুদ্ধচৈতন্য উত্তর প্রদেশের শাজাহানপুরে আগমন করেন। তথায় তিনি ডাক্তার রায়সাহেব শ্রীশচন্দ্র সেনের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সম্বুদ্ধ-চৈতন্য যখন শাজাহানপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে।

শাজাহানপুরে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য লাক্ষ্মৌ হইয়া নৈমিষারণ্যে আগমন করেন। দধীচি মুনি এই নৈমিষারণ্যে থাকিয়াই তপস্যা করিতেন। বৃত্রাসুরকে বধ করিবার জন্য দধীচি মুনি সানন্দে দেবরাজ ইন্দ্রকে তাঁহার দেহাস্থি দান করিয়াছিলেন।

নৈমিষারণ্যে অবস্থানকালে সম্বুদ্ধচৈতন্য স্থানীয় গৌড়ীয় মঠে ছিলেন। গৌড়ীয় মঠের সাধুরা সম্বুদ্ধচৈতন্যকে বিশেষ যত্ন করেন। নৈমিষারণ্যে যে পবিত্রস্থানে ঋষিরা একত্র হইয়াছেন,—শুক ভাগবত পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন,—সেইস্থান ও চক্রতীর্থ সম্বুদ্ধচৈতন্য দর্শন করেন। এইস্থানে অবস্থানকালে সম্বুদ্ধচৈতন্য পার্শ্ববর্তী তীর্থ-স্থানাদিও দর্শন করিয়াছিলেন। এই নৈমিষারণ্যের কাছেই লবকুশ রামায়ণ গান কবিয়াছিলেন এবং এইস্থানেই সীতাদেবী পাতালে প্রবেশ কবিয়াছিলেন। সেখানে একটি ছোট জলাশয় আছে। সম্বুদ্ধচৈতন্য একদিন সীতার পাতাল প্রবেশের স্থানটি দর্শন করিয়া আসিলেন।

নৈমিষারণ্য হইতে সম্বুদ্ধচৈতন্য গোরক্ষপুর আগমন করেন। তিনি গোরক্ষপুর হইতে নৌতনুয়া গমন করেন। তথা হইতে সম্বুদ্ধচৈতন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভাগিনেয় বিষ্টুকে সঙ্গে লইয়া হস্তিপৃষ্ঠে নেপালে গমন করেন। তাঁহারা নেপালের লুম্বিনী উদ্যানে

গমন করেন। এই লুম্বিনী উদ্যানেই তথাগত বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। সম্বুদ্ধচৈতন্য ভক্তিনম্র চিত্তে বুদ্ধদেবের জন্মস্থান দর্শন করেন।

অপর একদিন গোরক্ষপুর হইতে সম্বুদ্ধচৈতন্য নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রের ভাগিনেয়ী প্রতিমা মিত্রের সহিত কুশীনগর গমন করেন। এই কুশীনগরেই বুদ্ধদেব আশী বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। বুদ্ধদেবের নশ্বরদেহ যেস্থানে সৎকার করা হয়, সম্বুদ্ধচৈতন্য সেই স্থান দর্শন করেন। বুদ্ধদেব তাঁহার মহানির্বাণের পূর্বে তদীয় শিষ্য আনন্দকে এই স্থানেই শেষ উপদেশ দিয়াছিলেন,—"তোমরা চরিত্রবান হও, দীপস্বরূপ হও। আত্মদীপা বিহরত,—আপনার আলোকে পথ চল।" গোরক্ষপুর হইতে সম্বুদ্ধচৈতন্য জনকপুরে যান এবং সেখানে মা সীতা দেবীর লীলাস্থল দর্শন করেন। তাঁহার অপূর্ব লীলা কাহিনী, জনক রাজার জীবনের অনেক ঘটনা তিনি শুনিলেন ও জানিলেন। তখন সম্বুদ্ধচৈতন্যের হৃদয়তন্ত্রীতে সীতা দেবীর সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ধ্বনিত হইল। স্বামিজী বলিতেন,—"সীতা মহাশুদ্ধা, অপাপবিদ্ধা, জ্যোতির্ময়ী, পূর্ণস্বরূপা, তিতিক্ষার প্রতিমূর্তি, মহত্ত্বের প্রতিমা, সাধ্বী সহধর্মিণী, অতুলনীয়া, নারীকুলের চিরন্তন আদর্শ। সীতা আমাদের মাতৃ-স্বরূপা বিশ্বজননী। সীতার কথা আর কি বলব! অতীতের যত সাহিত্য আছে সব পড়ে নিঃশেষ কর, আর পৃথিবীতে ভবিষ্যতে যত সাহিত্য রচিত হবে তাও যদি মথিত কর,— তবু নিঃসংশয়ে বলছি,—দ্বিতীয় সীতাকে পাবে না। সীতা অনন্যা, ও শুধু একবারই আঁকা হয়েছে। রাম হয়ত আরো হবে,— সীতা কদাপি না। ঐ একটি জীবনের উৎস থেকে, ভারতীয় নারীর যত কিছু আদর্শের ধারা নেমে এসেছে, ভারতীয় নারীর পূর্ণপ্রতীক তিনি। এই হাজার বছর ধরে সমস্ত আর্যাবর্তের প্রতিটি নরনারীর পূজাবেদীতে তিনি প্রতিষ্ঠিতা হয়ে আছেন,

চিরকাল থাকবেন।—অনন্ত ধৈর্য, অনন্ত ক্ষমা, পবিত্রতার মূলাধার, মহিমান্বিতা সীতা। জীবনব্যাপী যন্ত্রণাকে বিনাবাক্যে, পরম প্রশান্তিতে যিনি বরণ করেছিলেন, সেই নিত্যসাধ্বী, নিত্যশুদ্ধা সীতা কেবল নরলোকের নয়, দেবলোকেরও আদর্শ প্রতিমা।... আমাদের জাতির মজ্জায় তিনি প্রবেশ করেছেন,—তিনি হিন্দু নরনারীর হৃদয়-শোণিতের তুল্য। সীতা আমাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী,—আমরা সকলে তাঁর সন্তান।"

১২

গোরক্ষপুর হইতে সম্বুদ্ধচৈতন্য পুনরায় কাশীধাম আগমন করেন। কাশীতে তিনি পদ্মফুল এবং মানস সরোবরের জলে ৺বিশ্বনাথকে পূজা করিলেন। কাশীধামে আসিলেই সম্বুদ্ধচৈতন্য সকালে, সন্ধ্যায়, কখনও কখনও রাত্রিতে হরিহরবাবার সঙ্গ করিতেন। এই যাত্রায় সম্বুদ্ধচৈতন্য একদিন হরিহরবাবার নিকট গমন করিয়া তাঁহার মস্তকে মানস সরোবরের জল এবং ললাটে কৈলাসের বিভূতি পরাইয়া দিলেন।

হরিহরবাবা সম্বুদ্ধচৈতন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈলাসে শীত কেমন?"

সম্বুদ্ধচৈতন্য উত্তরে বলিলেন, "ভীষণ শীত! কাশীতে আমরা তা কল্পনাও করতে পরি না।"

সম্বুদ্ধচৈতন্যের কথা শেষ হইলে হরিহরবাবা বালকবৎ আনন্দের সহিত কহিলেন,—"কাশী ভি কৈলাস,—কাশী ভি কৈলাস।"

উপদেশপ্রার্থী সকলকেই হরিহরবাবা উপদেশ দিতেন,— "রামনাম কর, রাম নামেই মুক্তি হবে।"

বিহারের ছাপরা জেলায় আনুমানিক ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে হরিহর-বাবা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার গৃহাশ্রমের নাম সেনাপতি। তিনি জাতিতে তেওয়ারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। শৈশবেই হরিহর বাবা তাঁহার পিতামাতা এবং এক ভ্রাতাকে হারাইয়াছিলেন। পরম প্রিয় এই

আত্মীয়গণের মৃত্যু হরিহরবাবার মনে সংসারের অনিত্যতাবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

মাত্র আঠার বৎসর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করেন। শোনপুরে হরিহর ছত্রের মেলায় এক মহাপুরুষের নিকট তিনি রাম-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন স্থানে তপস্যা করিয়া তিনি কাশীধামে আসিয়া স্থায়ীভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই কাশীধামে অবস্থান করিয়াই রামভক্ত সাধক তুলসীদাস তাঁহার "রামচরিত মানস" গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন। কাশীধামে ধীরে ধীরে হরিহরবাবার মাহাত্ম্য প্রচারিত হইতে লাগিল। এক-দল ভক্তের অনুরোধে তিনি তখন নাগোয়ায়, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে এক বজরায় দিন কাটাইতেন। তাঁহার বজরার আশ্রমটি ছিল পবিত্র রামনামের এক উৎসস্থল। সারা দিনরাত উহা ভজন, কীর্তন, রামধুন গানে মুখরিত থাকিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় দুষ্ট ছাত্রের উৎপাতে হরিহরবাবা শেষপর্যন্ত তাঁহার বজরা অসিঘাটে লইয়া যান এবং সেইখানেই জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করেন।

হরিহরবাবা শিবধাম কাশীতে কখনও মলমূত্রাদি ত্যাগ করিতেন না। প্রতিদিন শেষরাত্রে সাঁতরাইয়া গঙ্গার পরপারে যাইয়া তিনি শৌচাদি করিয়া আসিতেন। পরে তিনি অত্যধিক বৃদ্ধ হইয়া পড়িলে তাঁহাকে নৌকা করিয়া শৌচাদি কার্যের জন্য পরপারে লইয়া যাওয়া হইত।

ত্রৈলঙ্গস্বামীর উলঙ্গত্ব লইয়া কাশীতে যেমন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল, তদ্রূপ হরিহরবাবার উলঙ্গত্ব লইয়াও কাশীতে আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছিল।

হরিহরবাবা অগণিত মুমুক্ষু নরনারীকে রামনামের উদ্দীপনা জোগাইয়াছেন, পরম পথের সন্ধান দিয়াছেন, কিন্তু কাহাকেও

দীক্ষামন্ত্র দান করেন নাই। রামনামের মহিমা প্রচারের মধ্য দিয়াই এক বৃহৎ ভক্তগোষ্ঠী তিনি তৈরী করিয়া গিয়াছেন, কাশীধামের অধ্যাত্মজীবনে সঞ্চারিত করিয়াছেন নূতন ভাবতরঙ্গ এবং নূতন অনুপ্রেরণা।

হরিহরবাবা সর্বদাই প্রায় অর্ধবাহ্য অবস্থায় থাকিতেন। ঐ সময়ে তাঁহাকে যে যাহা খাওয়াইয়া দিত, তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন। একবাব কতিপয় দুষ্ট বালক কিছু পরিমাণ কাকবিষ্ঠা হরিহর বাবাকে খাওয়াইয়া দেয়। ঐদিন রাত্রেই তাহাদের প্রত্যেকের ভেদবমি ও কলেরা হয়। বালকগণ তখন ভয়ে ভয়ে স্ব স্ব অভিভাবকের কাছে তাহাদের কুকীর্তির কথা প্রকাশ করিযা দেয়। অভিভাবকগণ হরিহরবাবার কাছে ছুটিয়া আসেন এবং তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়েন। সব শুনিয়া হরিহর বাবা তাঁহাদিগকে বলিলেন, "ওরা অপরাধ করেছে প্রভু রামজীর কাছে। যে যা ভোজনের জন্য এগিয়ে দেয়, এই দেহে থেকে প্রভু রামচন্দ্রজীই তা গ্রহণ করেন। তোমরা ওদের জন্য তাঁরই কৃপাভিক্ষা কর, রামনাম কীর্ত্তন কর। প্রভু আমার পরম দয়ালু, অবোধ বাচ্চাদের তিনি নিশ্চয় নিরাময় করে তুলবেন।"

উপদেশপ্রার্থীকে হরিহরবাবা বলিতেন, "নিরন্তর রামনাম জপে যাও। সংসারচক্রের আবর্তনের মধ্যে এ নামকে কষে ধরে থাকো। সর্ব অভাব ঘুচে গিয়ে জীবনে ফুটে উঠবে অমৃত জ্যোতি।"

কখনও কখনও তিনি উপদেশ দিতেন,—

"অসারে খলু সংসারে সারমেতৎ চতুষ্টয়ম্।
কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গঃ গঙ্গাভ্যঃ শম্ভুপূজনম্॥"

১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের ১লা জুলাই মহাসাধক হরিহর বাবা মহাসমাধিমগ্ন হন। কাশীধামের অধ্যাত্মপুরীতে হরি এবং হরের মিলিত সত্তাকে মহাসাধক হরিহরবাবা স্বীয় সাধনায় মূর্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

১৩

১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দ।

সদ্যোস্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে এই বৎসর লণ্ডন হইতে তথাগত বুদ্ধদেবের অন্যতম শিষ্যদ্বয় সারিপুত্র এবং মোদ্‌গল্ল্যায়নের পূতাস্থি ভারতবর্ষে আনীত হয়। এতদুপলক্ষে সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বহু ব্যক্তি ভারতে আগমন করেন। এতদুপলক্ষে ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভারতীয় মহাবোধি সোসাইটির উদ্যোগে সাঁচিতে এক উৎসব হয়। পশ্চিমবঙ্গ হইতে সম্বুদ্ধচৈতন্য মহাবোধি সোসাইটির ডেলিগেট্ (deligate) হিসাবে উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সাঁচীতে ভগবান বুদ্ধদেবের উক্ত শিষ্যদ্বয়ের পূতাস্থি একটি নবনির্মিত মন্দিরে রক্ষিত হয়। ঐ উৎসব উপলক্ষে একদিন অপরাহ্ণে সাঁচী পাহাড়ে এক মহতী জনসভার অনুষ্ঠান হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে আগত বহু নরনারী এবং বহু বৌদ্ধসন্ন্যাসী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান্ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। ভারতবর্ষের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, ভারতীয় মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উক্ত সভায় ভাষণ দান করিয়াছিলেন। ঐ সভায় নিমন্ত্রিত ডেলিগেটবৃন্দের (deligates) মধ্যে সম্বুদ্ধচৈতন্যও উপস্থিত ছিলেন।

সাঁচী হইতে সম্বুদ্ধচৈতন্য ভূপাল এবং তথা হইতে ইন্দোর, উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। উজ্জয়িনী ভারতবর্ষের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে কুম্ভমেলা হইয়া থাকে। উজ্জয়িনীতে সম্বুদ্ধচৈতন্য মহাকাল শিবমন্দির, শ্রীকৃষ্ণের গুরু সন্দীপন মুনির আশ্রম, রাজা ভর্তৃহরির বাসস্থান প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন করেন।

সম্বুদ্ধচৈতন্য উজ্জয়িনীর প্রখ্যাত সাধক সন্ধ্যাপুরীর আশ্রমেও গমন করেন। সন্ধ্যাপুরী তাঁহার আশ্রমে সম্বুদ্ধচৈতন্যকে বিশেষ আদর-যত্ন করিয়াছিলেন। এই সাধকপ্রবর সন্ধ্যাপুরীর সহিত সম্বুদ্ধচৈতন্য কয়েক বৎসর পূর্বে কাশ্মীরের অমরনাথ তীর্থে পরিচিত হইয়াছিলেন।

অতঃপর সম্বুদ্ধচৈতন্য শোণ এবং নর্মদার উৎপত্তিস্থান দর্শন করিতে গমন করেন। নর্মদার উৎপত্তিস্থানে সম্বুদ্ধচৈতন্য ধ্যান-জপাদি করেন। পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন নর্মদার উৎপত্তি স্থানে জলের মধ্যে শীর্ষাসনে তিনি ধ্যানজপ করেন। পর্বতগাত্র অমরকণ্টক হইতে নর্মদা নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারও এক মাইল দূরে শোণ নদের উৎপত্তি স্থান। সম্বুদ্ধচৈতন্য কিছুকাল অমরকণ্টকে থাকিয়া তপস্যাদি করিয়াছিলেন। এই স্থানে এক যুবক সাধুর সহিত সম্বুদ্ধ-চৈতন্যের পরিচয় হইয়াছিল। সাধুটি দিনরাত্রি সর্বক্ষণ নাম কীর্তন করিতেন,—

"শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে।
হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবায়॥"

১৪

ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্যের সিংহল ভ্রমণ সম্পর্কে পূর্বে কিছু বলা হইয়াছে। এখানে উহা বিস্তারিত ভাবে বলা হইতেছে।

১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দের ৫ঠা ফেব্রুয়ারী সিংহল স্বাধীনতা লাভ করে। সম্বুদ্ধচৈতন্য ঐ সময় সিংহলে অবস্থান করিতেছিলেন। সিংহলের স্বাধীনতা উৎসবে যোগদানের নিমিত্ত তিনি মাদ্রাজ হইতে বিমান-যোগে কলম্বো গমন করেন। কলম্বো সিংহলের রাজধানী। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সিংহলের স্বাধীনতা উৎসবের দিন কলম্বো রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ মহারাজের সহিত তিনি ঐ উৎসব দর্শন করেন। গলফেস্ গ্রীণে স্বাধীনতা উৎসব দর্শন করিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য অভূতপূর্ব আনন্দ লাভ করেন।

অপর একদিবস তিনি কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর হেমচন্দ্র রায়ের সহিত কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর প্রভৃতিও দর্শন করিলেন। গলফেস্ গ্রীণের আর্ট গ্যালারীতে তিনি সিংহলের কলম্বো, ব্যাট্টিকোলা, ত্রিনকমোলী, ক্যাণ্ডী, রত্নাপুরা, ম্যালাভিয়া, জাফনা, সিগারিয়া প্রভৃতি স্থানের শিল্পকলা এবং ইণ্ডাস্ট্রীর বহু নিদর্শন দর্শন করেন। তখন সন্ধ্যা আসন্নপ্রায়। সম্বুদ্ধচৈতন্যের চোখে পড়িল ভারত মহাসাগরে সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্য। দিনশেষে দিননাথ ধীরে ধীরে অস্ত যাইতেছেন। সম্বুদ্ধচৈতন্যের মনে হইল যেন

একখানি জ্বলন্ত স্বর্ণগোলক মহাবারিধিতে ডুবিয়া গেল। এইরূপ দৃশ্যের কথা সম্বুদ্ধচৈতন্য অদ্যাবধি ভুলিতে পারেন নাই।

১৩ই ফেব্রুয়ারী অনুরাধাপুরে উৎসব হয়। সিংহলের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক সমাগম হইয়াছিল এই উৎসবে। সেদিন প্রাতঃকাল হইতেই সহস্র সহস্র বৌদ্ধভক্ত বোধিবৃক্ষে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছেন, ভগবান বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। নানাবিধ পুষ্পসামগ্রীকে অবলম্বন করিয়া বুদ্ধদেবকে তাঁহারা হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছেন। তাঁহারা পবিত্র বোধিবৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিতেছেন, রুভেনা বালিসিয়ার ডাগোবা প্রদক্ষিণ করিতেছেন। অদ্য অনুরাধাপুর উৎসব আনন্দে মুখরিত। কত শোভাযাত্রা, কত নৃত্য হইতেছে। শোভাযাত্রায় সিংহলের প্রধান মন্ত্রীও ছিলেন। ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্য প্রধান মন্ত্রীকে চন্দন তিলক পরাইয়া দিলেন। ঐ শোভাযাত্রায় একটি সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে নানাবিধ বিচিত্র পোষাকে ভূষিত হইয়া নয়টি বালক উপবিষ্ট ছিল। এই অনুরাধাপুরই একদা সিংহলের রাজধানী এবং সিংহলী সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র ছিল।

অনুরাধাপুর হইতে সাত-আট মাইল দূরে একটি পাহাড় আছে। পাহাড়টির নাম মিহিণ্টাল। সম্বুদ্ধচৈতন্য মিহিণ্টাল পাহাড়েও গিয়াছিলেন। তথায় তিনি সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্রের একটি প্রস্তরমূর্তি দেখিতে পাইলেন। পাহাড়টি নারিকেল, আম্র এবং অন্যান্য বৃক্ষ-ছায়ায় আচ্ছাদিত। পাহাড়টিতে অনেকগুলি ডাগোবাও আছে। উহার সর্বোচ্চ শিখরে একটি শৈল-চৈত্য আছে। এই চৈত্যটিতে তথাগত বুদ্ধদেবের একটি পরিনির্বাণ-মূর্তি আছে। এই মিহিণ্টাল পাহাড় হইতেই একদা সিংহলের সর্বত্র বৌদ্ধধর্ম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই যুগে এই সকল স্থানে অবস্থান করিয়া সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রা দিনের পর দিন ভারতবর্ষের শাশ্বতবাণী প্রচার

করিয়াছিলেন,—ইহা ভাবিতে বিস্ময়ে ও আনন্দে মন স্তব্ধ হয়। সিংহলের বুকে অবস্থিত এই সকল পর্বত, চৈত্য, মন্দির প্রভৃতি যেন ভারতের অতীত গৌরবের কথাই নীরব ভাষায় আজিও ঘোষণা করিতেছে।

মিহিন্টাল পাহাড় হইতে অনুরাধাপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য স্থানীয় যাদুঘরটি পরিদর্শন করিলেন। অনুরাধাপুর শহরটি পাঁচ-ছয় মাইল চওড়া। শহরটি বিবিধ ভগ্নস্তূপে পূর্ণ। রুভেনা বলিসয়ায় ডাগোবাটি সিংহলের সুন্দরতম ডাগোবাগুলির অন্যতম। যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ ভক্ত ইহার মধ্যে প্রচুর হীরামুক্তা, চুনিপান্না প্রভৃতি ঢালিয়াছে। রুভেনা বালিসিয়ার ডাগোবাটি একদা সিংহলের রাজা ধুতুগেমুনু নির্মাণ করিয়াছিলেন। সম্বুদ্ধচৈতন্য দেখিলেন, শত সহস্র ভক্ত ঐ ডাগোবাটি প্রদক্ষিণ করিতেছে এবং মুখে "সাধু" "সাধু" বলিতেছে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী সম্বুদ্ধচৈতন্য ত্রিনকমোলীর রামকৃষ্ণ মিশনের হিন্দু কলেজে অবস্থান করেন। ঐ কলেজে প্রায় ছয়শত ছাত্র অধ্যয়ন করে। ত্রিনকমোলী সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ নৌ-ঘাঁটি (Naval Station)। এই স্থানে অনেক যুদ্ধ জাহাজ থাকে।

হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষের সহিত সম্বুদ্ধচৈতন্য এক দিবস মোটর-যোগে স্বামী পাহাড়টি (Swami Rock) দর্শন করিতে গমন করেন। এই পাহাড়ে একটি সুন্দর মন্দির আছে। ঐ মন্দিরটিও স্বামী পাহাড় নামে পরিচিত। সম্মুখে অনন্ত প্রসারিত মহাসমুদ্র। শীর্ষে দিগন্তবিস্তৃত মহাকাশ! এই অসীমের পটভূমিতে স্বামী পাহাড় মন্দিরের সৌন্দর্য জগতে বিরল। অসীম অনন্তের কোলে অবস্থিত স্বামী পাহাড় মন্দিরের সৌন্দর্য দর্শনে সম্বুদ্ধচৈতন্য আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

মন্দিরের পাশেই সুগভীর সুবিশাল সমুদ্র। পূজারী একস্থানে

বসিয়া ভক্তিবিনম্র চিত্তে দেবাদিদেব মহাদেবের উদ্দেশ্যে ঐ সুগভীর সমুদ্রে পূজার্ঘ অর্পণ করিতেছেন। স্ত্রী, পুরুষ বহু ভক্ত পূজা দিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা অদূরে দাঁড়াইয়া পূজা দেখিতেছেন। পূজারীর সন্নিকটে একখণ্ড প্রস্তরোপরি উপবেশন করিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য নীরবে সমুদ্র দর্শন করিতেছেন। সম্মুখে অনন্ত অম্বর তলে অনন্ত অম্বুরাশির অন্তহীন উর্মিমালা সতত ক্রীড়াচঞ্চল। যুগ-যুগান্ত এই ক্রীড়া চলিতেছে! দিগন্তে দিকচক্রবালে মহাসমুদ্র মহাকাশের কোলে লুটাইয়া পড়িয়াছে!

প্রস্তরোপরি উপবিষ্ট থাকিয়াই সম্বুদ্ধচৈতন্য নিম্নে সমুদ্রের অনন্ত গভীরতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। এই ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য দর্শনে সমুদ্ধচৈতন্যের সর্বশরীর বিস্ময়ে শিহরিত হইল।

প্রস্তরোপরি বসিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য ভাবিতে লাগিলেন, মানুষ কত ক্ষুদ্র! সেই মানুষের কত অহঙ্কার। এইরূপ স্থানে আগমন করিলে মানুষের সকল অহঙ্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায় এবং তাহার মস্তক বিশ্বস্রষ্টার চরণতলে লুটাইয়া পড়ে।

এই মন্দিরটি সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে যে, লঙ্কাধিপতি শিবভক্ত রাবণ এই মন্দিরে আসিয়া প্রত্যহ দেবাদিদেব মহাদেবের অর্চনা করিতেন। প্রত্যহ এই স্থানে আগমন অসুবিধাজনক বলিয়া রাবণ এক সময় এই মন্দিরটি তাঁহার প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে তুলিয়া লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি এই পাহাড়টি ভাঙ্গিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষপর্যন্ত উহা সম্ভব হয় নাই। সেই পাহাড় ভাঙ্গিবার দাগসমূহ অদ্যাপি পর্বতগাত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে।

স্বামী পাহাড়ের উত্তরদিকস্থ রেলিং ধরিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য এবং নটরাজ মহারাজ নিকটবর্তী বাতিঘরে (Light House) গমন করেন। স্থানটি অনেক নীচে অবস্থিত। বিগত মহাযুদ্ধের সময় এই বাতিঘর হইতে সৈন্যগণ অত্যুজ্জ্বল সন্ধানী আলোর (Search

Light) সাহায্যে সকল দিক নিরীক্ষণ করিত। এই বাতিঘরটির নিকটেই সমুদ্রগর্ভে একটি গোলাকার পর্বতখণ্ড দেখা যায়। জনসাধারণ বলিয়া থাকে, ইহা নাকি লঙ্কাধিপতি রাবণের ভগ্নরথ।

স্বামী পাহাড়ে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। সম্বুদ্ধচৈতন্য তথায় একটি ত্রিশূলও প্রোথিত দেখিলেন। গয়ার নিকটে উরুবিল্ব গ্রামে ভগবান বুদ্ধ একটি অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে তপস্যা করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তদবধি পৃথিবীর সকল দেশের বৌদ্ধগণ অশ্বত্থ বৃক্ষকে বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে এবং ইহার পূজা করে।

কেবলমাত্র বৌদ্ধগণের নিকট নহে, হিন্দুদিগের নিকটও অশ্বত্থ বৃক্ষ অতি পবিত্র। স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুগণ অশ্বত্থ বৃক্ষকে পূজা করে। প্রভাসে যে স্থানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ হইয়াছে এবং যে স্থানে তাঁহার নশ্বর দেহের সৎকার হইয়াছে, সেই স্থানেও এই অশ্বত্থ বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। আজিও ঈশ্বরলাভেচ্ছু সাধকবৃন্দের তপস্যা-স্থল পঞ্চবটীর অন্যতম বৃক্ষ এই অশ্বত্থ। দক্ষিণেশ্বরে পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের তপস্যাস্থল পঞ্চবটীতে অশ্বত্থ বৃক্ষটি অদ্যাবধি দৃষ্টিগোচর হয়। বঙ্গদেশের যেখানে যত প্রসিদ্ধ পীঠস্থান এবং সাধকবৃন্দের তপস্যাস্থল আছে, সেখানে এই অশ্বত্থ বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। এই বৃক্ষ অতিশয় পবিত্র বলিয়াই বোধহয় গীতার বিভূতি যোগ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, "বৃক্ষ সকলের মধ্যে আমি অশ্বত্থ"—"অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং"।

স্বামী পাহাড়ে একটি মনুমেণ্ট আছে। এক ওলন্দাজ দুহিতার স্মৃতিরক্ষার্থে উহা স্থাপিত হইয়াছে। জনৈক ওলন্দাজ কর্মচারীর এক কন্যা ছিল। কন্যাটির প্রেমাস্পদ যখন জাহাজযোগে কন্যাটিকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তখন প্রেমাস্পদের বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া সেই কন্যা সমুদ্রে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে। ওলন্দাজ দুহিতার এই মহান প্রেমের স্মৃতিকে স্মরণীয় করিবার জন্যই এই মনুমেণ্টটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্বামী পাহাড়ের দুর্গে সম্বুদ্ধচৈতন্য অনেকগুলি হরিণকে মনের আনন্দে বিচরণ করিতে দেখিয়াছিলেন। কেহ উহাদিগকে শিকার করে না।

পরদিবস বেলা এগারটায় সম্বুদ্ধচৈতন্য শ্রীযুত লক্ষ্মণের গাড়ীতে ত্রিনকমোলী হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্তী এক অরণ্যময় স্থানে আগমন করেন। তথায় সাতটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সেই সাতটি প্রস্রবণের সাতপ্রকার উষ্ণ জলে সম্বুদ্ধচৈতন্য স্নান করিলেন। এই জলের রোগারোগ্যকারী শক্তি আছে। বাতগ্রস্থ রোগী এই উষ্ণ প্রস্রবণের জলে স্নান করিলে বিশেষ উপকার পাইয়া থাকে।

এই উষ্ণ প্রস্রবণগুলি সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, লঙ্কাধিপতি রাবণের মৃত্যু হইলে তাঁহার মাতা এই স্থানে আগমন করিয়া তাঁহার যষ্ঠিটি মাটিতে প্রোথিত করিয়াছিলেন। রাবণ-জননীর তপ্ত অশ্রু-ধারাই পরবর্তীকালে এই সাতটি উষ্ণ প্রস্রবণে পরিণত হয়।

সেই সময় কলম্বো শহরে এক সিন্ধী ভক্তের গৃহে উদাসী সম্প্রদায়ের এক যোগী অবস্থান করিতেছিলেন। যোগীর নাম পূরণ-দাস, বয়স একশত পাঁচ বৎসর। কলম্বো রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দের সহিত ৮ই ফেব্রুয়ারী সম্বুদ্ধচৈতন্য ঐ যোগীকে দর্শন করিতে গমন করেন। তথায় সম্বুদ্ধচৈতন্য শুনিলেন, উক্ত যোগী হরিদ্বারের অধিবাসী। এখানে তিনি একটি কাল রংয়ের আলখেল্লা পরিহিত থাকিলেও তিনি সাধারণতঃ দিগম্বর থাকেন। সম্বুদ্ধচৈতন্য আরও শুনিলেন যে যোগী পূরণদাস সাধারণতঃ বৃক্ষতলে কিংবা উন্মুক্ত আকাশের নীচেই অবস্থান করেন, কখনও কোন গৃহে বাস করেন না। তবে, যোগী তখন যেইস্থানে ছিলেন, তথায় বালুর উপর সাময়িকভাবে একটি অস্থায়ী ছাউনী নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সম্বুদ্ধচৈতন্য এবং স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ যোগীকে সশ্রদ্ধ নমস্কার করিলে তিনিও তাঁহাদিগকে সাদর অভিবাদন জানাইয়া তাঁহার নিকট আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন।

সম্বুদ্ধচৈতন্যকে দেখাইয়া স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ যোগী পূরণদাসকে বলিলেন, "ইনি সম্প্রতি কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শন করে এসেছেন।" স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দের বাক্য শ্রবণমাত্র যোগী পূরণদাস স্বীয় বক্ষোপরি হস্তস্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন, "কৈলাস হিঁয়া হ্যায়। আপনা শিবজীকো হিঁয়া দর্শন করনে হোগা! শিবোঽহম! শিবোঽহম্!"

যোগী পূরণদাসের বাক্য শ্রবণমাত্র স্বীয় গুরু স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ কর্তৃক বর্ণিত এক সাধুর কাহিনী সম্বুদ্ধচৈতন্যের স্মরণ হইল। উক্ত সাধুর নাম কাঠিদাস বাবাজী। তিনি কাঠি বাজাইয়া একটি গান গাহিতেন। গানটি এইরূপ,—

"যদবধি নিজ দেহে না দেখিবে ভাই,
কাশী যাও, মক্কা যাও, কিছু হবে নাই।
চারদিকে চার হীরের ঝুড়ি, মধ্যিখানে লাল,
আজগুবি তার তুনিয়াদারী, আজগুবি তার ফল।
হরিবোল, হরিবোল॥"

সম্বুদ্ধচৈতন্য দেখিলেন, অনেক ভক্ত সেদিন যোগী পূরণদাসকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। যোগী পূরণদাস ইহাতে বড় খুসী। তিনি সানন্দে সম্বুদ্ধচৈতন্যকে বলিলেন, "আমি বড় গেরস্থী! যেখানেই যাই সেখানেই সংসার, বাল-বাচ্চা।" অতঃপর তিনি সকলকে উপদেশ প্রদানপ্রসঙ্গে বলিলেন, "কমল জলে জন্মে; কিন্তু কমল জল থেকে পৃথক থাকে। তেমনি সংসারে থেকেও সংসার থেকে পৃথক থাকবে; কোন বস্তুতেই যেন তোমাদের আসক্তি না থাকে।"

সম্বুদ্ধচৈতন্য এবং স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দের আগমনে যোগী পূরণ দাস বড় খুশী হইয়াছেন। তিনি বাড়ীর মহিলা ভক্তদিগকে বলিলেন, "এদের খাইয়ে দাও।"

তথায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত করিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য এবং স্বামী

সিদ্ধাত্মানন্দ যখন বিদায় চাহিলেন, তখনও যোগী পূরণদাস তাঁহাদিগকে অনেকগুলি ফল প্রদান করিলেন।

সিংহল ভ্রমণকালে সম্বুদ্ধচৈতন্য কাতারগাম এবং সমানকূটও (Adam's Peak) পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ঐ দুই স্থানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্পর্কে তাঁহার দিনলিপি (Diary) হইতে কিছু অংশ উধৃত করা হইতেছে।

সম্বুদ্ধচৈতন্যের কাতারগাম ও সমানকূট ভ্রমণ

(ডায়েরী হইতে)

"১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ২রা মার্চ্চ।

কলম্বো শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে মধ্যাহ্নের আহার সমাপন করিয়াই মিঃ এস. কে. নাগলিঙ্গম্ মহাশয়ের সহিত তাঁহার মোটরকারে বাদুল্লা রওনা হইলাম।

কলম্বো হইতে সাড়ে উনত্রিশ মাইল দূরে রত্নপুরার পথে Avisawella.—এই স্থানে লঙ্কার রাজা রাবণ জনকনন্দিনী সীতা-দেবীকে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখানে নদীর তীরে ভগ্ন মন্দির এবং পুরাতন দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ছাপান্ন মাইল অতিক্রম করিয়া আমরা রত্নপুরা আসিলাম। রত্নপুরা সিংহলের Sabaragamurva প্রদেশের রাজধানী। এই স্থান Gems-এর জন্য প্রসিদ্ধ। রত্নপুরায় সত্যই রত্ন ছড়ান আছে। এখান হইতে দুই মাইল দূরে সমানদেভব (Saman Devab)। এই মন্দিরের দ্বিতলে শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের মূর্তি এবং তাঁহাদের সোনার তীর-ধনুক এখনও আছে। পুরাকালের রৌপ্যনির্মিত ছত্রও আছে। সাধারণ তীর্থযাত্রীরা দ্বিতলে যাইতে পারে না,—তাহারা মন্দিরের নির্দিষ্ট কোন সীমানা হইতে দাঁড়াইয়া দর্শন ও দেবতার উদ্দেশ্যে

প্রণতি জ্ঞাপন করে। মন্দিরের পূজারী বৌদ্ধ। তিনি নিত্য পূজা করেন। পূজার সময় সংস্কৃত স্তবও আবৃত্তি করেন।

পুরাকালে দুইজন নৃপতি একটি মণি-মাণিক্যনির্মিত সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ করেন। তখন এই দ্বীপ রত্নদীপ নামে খ্যাত ছিল। রত্নের দেশ (The land of Gems)। এখনও লোকে কথায় বলে "সোনার লঙ্কা।"

এই সোনার লঙ্কার আব একটি সম্পদেব কথা উল্লেখ করিব। এই সম্পদের নাম Plumbago. Plumbago-র খনি (Mines) এই দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকেই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। এই Plumbago খনিজ পদার্থ; ইহাকে সকলে কালসীসা (Black Lead) বলিয়া জানে। এই খনিজ পদার্থ U.S.S.R, Korea, Germany, Austria এবং Madagascar-এ খনিতে প্রভূত পাওয়া যায়। বর্তমানে সিংহলের পাঁচটি খনি Bogala, Karamdawalte, Kahatagana, Walakalahena এবং Kolongaha-তে কার্য চলিতেছে। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে সিংহলে দুই হাজার Plumbago-র খনি ছিল। যুদ্ধের পূর্বে সিংহল হইতে জাপান, U.S.A., U.K., Germany, Italy, Australia, France, Canada এবং India এই পদার্থ ক্রয় করিয়াছিল। সেই বৎসর ২৭৮৩২ টন Plumbago রপ্তানী হইয়াছিল।

সিংহলে পার্বত্য দেশকে up country বলে। এই পার্বত্য দেশের নানা দৃশ্য, রবারের বাগান ও চায়ের বাগান দেখিতে দেখিতে আমরা Haldummulla, Haputale, Bandarawala, Demodara, Hali-Ela হইয়া রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সময় বাদুলায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

Haputale হইতে পাঁচ মাইল দূরে Diyatalawa. এই Diyatalawa কলম্বো হইতে একশত আঠার মাইল। সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থান; উচ্চতায় চারি হাজার একশত ফুট। এখানে

সিংহল গভর্ণমেণ্টের নেভাল ও মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টের হেড কোয়ার্টার। এই মনোরম স্থানটি গ্রাম্য মিশনারীদের জন্যই নির্মিত হইয়াছিল। Wesleyam Mission-এর Revd. Samuel Langdon এই স্থানটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি Diyatalawa-কে "Happy Valley" বলিতেন। এই স্থানটির আবহাওয়া শুষ্ক এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা। বাতুলা কলম্বো হইতে একশত সাঁইত্রিশ মাইল, কলম্বো হইতে পেরাডেনিয়া হইয়া আসিলে বাতুলা একশত সাতচল্লিশ মাইল রাস্তা পড়িবে। Namana-Kulakande পর্ব্বত, উচ্চতায় ৬৬৭০ ফুট। ইহারই পাদদেশে এই শহর। ইহার উচ্চতা ২১৯৫ ফুট। শহরের চারিদিকেই উচ্চ পাহাড়; পাহাড়ের উপরে Gravelius গাছগুলি দাঁড়াইয়া আছে। পাহাড়ের উপরে মাঝে মাঝে মেঘ আসিয়া সারা পাহাড়গুলিকে ঢাকিয়া দেয়, আবার খানিক পরে আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়া যায়; মেঘগুলি যেন কোথায় লুক্কায়িত হইয়া যায়,—মেঘেব এই লুকোচুরি খেলা দেখিতে বেশ লাগে। পাহাড়েব গায়ে গায়ে চা বাগান। এখানে কনকনে শীতও নাই, গ্রীষ্মও নাই; আবহাওয়া মনোরম। এই শহরের এই উচ্চতায় ধানের ক্ষেত, আম, কাঁঠাল, গ্রেডফ্রুট, কলা, নারিকেল গাছ ইত্যাদি নানা প্রকারের বৃক্ষলতাদি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে কাতারগামের প্রাচীন মন্দিব, প্রাচীন ডাগোবা এবং বিহারে শ্রীবুদ্ধদেবের ধ্যানস্থ এবং পবিনির্বাণের মূর্তি আছে। কাছারীর পাহাড়ের পাদদেশে দুইখানি প্রাচীন পাথর আছে; তাহাতে প্রাচীন আইনকানুন লেখা আছে। বাতুলায় বাজারের একটি রাস্তা দেখিয়া আমার নৈনিতাল শহরের বাজারের একটি রাস্তার কথা স্মরণ হইল। তখন ঠিক মনে হইল যেন নৈনিতালে ভ্রমণ করিতেছি। বাজারের এক সিংহলী ভদ্রলোকের দোকানে গিয়াছিলাম। তাহাদেব সহিত অনেক আলাপ আলোচনা হইল। তাহারা আমাকে গৌরবের সহিত বলিল,—"আমাদের পূর্ব পুরুষ বঙ্গদেশ

হইতে আসিয়াছিল।” এখানে হিন্দুদের একটি গণেশেরও মন্দির আছে।

৪ঠা মার্চ প্রাতঃকালে বাদুল্লা হইতে রওনা হইয়া Parasa হইয়া লুনাগলায় আসিলাম। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের নাগলিঙ্গম্ বিদ্যালয় আছে। সেই বিদ্যালয় আমি পরিদর্শন করিলাম। বিদ্যালয়ে ছিয়ানব্বুই জন বালক-বালিকা অধ্যয়ন করে। এইখানেই মিঃ নাগলিঙ্গমের নিজের বাড়ী। এখানে তাঁহার বাড়ী, বাগান, বেকারী, রেশন সপ ও পেট্রোলের দোকান দেখিয়া চলিলাম। পথিমধ্যে মিঃ নাগলিঙ্গমের কমলালেবু, মোসম্বীর বাগান ও আখের ক্ষেত এবং পাহাড়ের জঙ্গল দেখিতে দেখিতে আমরা পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলাম। এই পথে স্থানে স্থানে নিবিড় জঙ্গল এবং বহু রবারের বাগান আমাদের নয়নপথে পড়িল। অনেক পুরুষ ও মহিলাদেব রবারের বৃক্ষ হইতে বালতি বালতি রস সংগ্রহ করিয়া ফ্যাক্টরীতে লইয়া যাইতে দেখিলাম। বেলা দ্বিপ্রহরে আমরা Wellawaya-তে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে গভর্নমেণ্টের Agriculture Farm আছে। এখানে খাঁটি ঘৃত, Cream ও দধি পাওয়া যায়। আমরা এখান হইতে তিন হাঁড়ি দধি ক্রয় করিলাম। এইরূপ সুস্বাদু দধি সিংহলে কোথাও পাওয়া যায় না। Wellawaya হইতে রওনা হইয়া আমরা আড়াই ঘটিকার সময় এক সেতুর নিকট আসিলাম। পথিপার্শ্বে আমাদের গাড়ী রাখিয়া সেতুর নীচে নদীতে আমরা নামিলাম। নদীতে হাঁটু জল। স্বচ্ছ সলিল প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। নদীর উভয় দিকে বৃক্ষলতাদি। তাহার শীতল ছায়াতে, নদীর মধ্যে উচ্চ প্রস্তর খণ্ডে বসিয়া আমরা মধ্যাহ্নের আহার আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম। আহার সমাপনান্তে আমরা Tissamaharama যাত্রা করিলাম। পথিপার্শ্বে জঙ্গল, সরোবর ও ধানের ক্ষেত দেখিতে দেখিতে আমরা অপরাহ্নে Tissamaharama-য় আসিলাম।

এইস্থান কলম্বো হইতে ১৬৭ মাইল। এখান হইতে উনিশ মাইল দূরে Hambantota শহর। এই শহর লবণ প্রস্তুত করিবার কারখানার জন্য বিখ্যাত। Tissamaharama-য় মহারাজ তিষ্যা মন্দির, ডাগোবা, প্রাসাদ ও সরোবর নির্মাণ করিয়াছিলেন। ডাগোবাটি বড়,—উচ্চতায় ১৬২ ফুট। এখানে সরোবরে অনেক কুম্ভীর বাস করে। এখানে বড় বাজার আছে। বাজার হইতে আমরা পূজা ও ভোগের দ্রব্যাদি, চাউল, আনাজ ও নারিকেল ক্রয় করিয়া কাতারগাম মহাতীর্থের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। এইস্থান হইতে সাড়ে দশ মাইল জনমানবহীন পথ। পথের দুই পার্শ্বে নিবিড় জঙ্গল। হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ; ভল্লুকের ভয়ও আছে। এইরূপ পথ অতিক্রম করিয়া আমরা মাণিক গঙ্গার পাবে আসিয়া পৌছিলাম। মোটরকার এপারেই রহিল! নদীতে হাঁটুজল। আমরা পায়ে হাঁটিয়া নদী পার হইয়া কাতারগামে অপরাহ্নে আসিলাম। নীরব, নিস্তব্ধ গ্রামখানি। অল্পসংখ্যক লোকের বসতি।

অদূরে কাতারগাম পাহাড় কোত্তিক মালাই, উচ্চতায় ১৩৯৫ ফুট। যাত্রীদের জন্য অনেকগুলি বাড়ী আছে। কতকগুলি দোকানও আছে। দোকানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সবই পাওয়া যায়। মিঃ নাগলিঙ্গম্ এই স্থানের গণেশের ও দেবসেনা মন্দিরের একজন অছি (Trustee)। আমরা দেবসেনা মন্দিরের অতিথি হইলাম। স্কন্দপুরাণে আছে, দেবসেনাপতি কার্তিক দেবাসুর যুদ্ধে অসুরদের পরাজিত করেন। তাঁহারই মহিমা প্রচারের জন্য এই মন্দির স্থাপিত হয়। কাতারগাম সিংহলী হিন্দুদের প্রধান তীর্থ। তবে হিন্দু ও বৌদ্ধ, উভয় জাতিই এই কার্তিক স্বামীকে অন্তরের সহিত প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। সিংহল ভ্রমণ করিতে আসিয়া কেহ কাতারগাম তীর্থদর্শন না করিলে এই দেশের হিন্দুরা তার ভ্রমণকে অসম্পূর্ণ মনে করেন। তাহারা আশ্চার্যান্বিত হইয়া বলিবেন,—"কাতারগাম দর্শন করেন নাই?" জুলাই মাসে কয়েকদিন

ধরিয়া এখানে উৎসব হয়। সেই সময় সহস্র সহস্র ভক্তের সমাগম হয়,—যেমন আমাদের দেশে চড়কের সময় তারকেশ্বরে ভীড় হয়। এমন কি তখন দক্ষিণ ভারত হইতেও যাত্রী আসে। এই দেবতা বড় জাগ্রত!

একমনে কেহ মানস করিয়া আসিলে দেবতা তাহার মনস্কামনা পূর্ণ করেন। চড়কের সময় শ্রীশ্রীতারকেশ্বরের নামে সন্ন্যাসীরা যখন পৃষ্ঠে বড়শি ফুঁড়িয়া চড়কে ঘুরিতে থাকে, তখন তাহাদের কিছুই হয় না। ভক্তদের তখন দেবতার নামে অগাধ ভক্তি-বিশ্বাস দেখা যায়। সেইরূপ এখানে মেলার সময় ব্রতধারী ভক্তেরা অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়, তাহাদের পায়ে কোন ক্ষত হয় না।

ভক্তেরা দেবতার নাম স্মরণ করিয়া নিজেদের গলায় ছুরি বসায়; রক্ত পড়ে। সেই রক্তপড়া স্থানে কার্তিক স্বামীর একটু বিভূতি লেপন করিয়া দিলে রক্তপাত বন্ধ হইয়া যায়। কাহারও জ্বর হইলে এই বিভূতি ললাটে লেপন করিয়া দিলে জ্বর বন্ধ হইয়া যায়। এই দেবতার অনেক অলৌকিক ঘটনা শুনিলাম। এই স্থানের মাহাত্ম্য খুব। এই দেবতা কৃপা না করিলে এইস্থানে কেহ আসিতে পারে না। যাত্রাকালে হয়তো কোন বাধা-বিঘ্ন পড়িল। অন্তরে অকপট বিশ্বাস লইয়া যাত্রা করিতে হয়। ভাবের ঘরে চুরি করিলে দেবতা তাহাকে কৃপা করেন না। তিনি দীনের বন্ধু,—দীনবন্ধু। মেলার সময় এই স্থানের অবস্থা যে কিরূপ হয়, তাহা প্রত্যক্ষদর্শীরাই জানেন। এইস্থানের ভাবই বদলাইয়া যায়। মানুষের মন তখন কি এক দিব্য ভাবে পূর্ণ হয়!

নভেম্বর মাসে একদিনের জন্য এই তীর্থে মেলা হয়। সকলেরই মুখে তখন "হরোহরা" ও "মুরকা মুরকা" নাম শুনতে পাওয়া যায়। এই নাম করিতে করিতে ভক্তেরা অস্থির হইয়া যায়। সন্ধ্যার সময় প্রথমে আমরা গণেশের মন্দিরে আরতি দর্শন করিলাম। ইহার পর কার্তিক স্বামীর আরতি দর্শন করি। কার্তিক স্বামীর আরতির পর

তাঁহার প্রথমা স্ত্রী, দেবসেনার আরতি হইল। কিয়দ্দূরে পূর্বদিকে বালী আম্মাদেবীর মন্দির।—বালী আম্মা এই দেবতার দ্বিতীয়া স্ত্রী। তাঁহার আরত্রিক হইল। এই মন্দির দর্শন করিয়া ইহাবই ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বে সন্ন্যাসীবাবার . সমাধিমন্দিরে শিব প্রতিষ্ঠিত।--এখানে মহাদেবের আরতি দর্শন করিলাম। সকল মান্দরেই আরত্রিকের পর আমরা সকলেই দেবাদেবীর বিভূতি, চরণামৃত ও প্রসাদ পাইলাম। বালী আম্মাদেবীর মন্দিরের উভয় দিকে মুসলমানদের একটি দরগা আছে। বালী আম্মাদেবীর মন্দিব হইতে পঞ্চাশ ষাট পা আগাইলেই মরিয়ম আম্মার মন্দির। মরিয়ম আম্মা হইতেছেন শ্রীশ্রীদুর্গাদেবী ॥

এখানে কোন মন্দিরেই দেবতা বা দেবীকে কেহ দর্শন করিতে পারিবেন না। মন্দিরের দরজায় দেবতার বা দেবীব মূর্তি ক্যানভাসে চিত্রিত আছে। তাহাই দর্শন করিতে পাওয়া যায়। অন্তরে দেবতা বা দেবীকে চিন্তা করিতে হইবে এবং ঐ মন্দিরে প্রণাম করিতে হইবে। পূজার সামগ্রী যাহা অর্পণ করিবেন তাহা মন্দিরের পূজারী ভিতরে লইয়া যাইয়া দেবতা বা দেবীকে নিবেদন করিবেন।

কার্তিক স্বামীর ও গণেশের মন্দিরের পশ্চাতে একটি বোধিবৃক্ষ আছে। সেখানে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে পূজা ও মন্ত্র পাঠ করিতে দেখিলাম। একই প্রাঙ্গণে কার্তিক স্বামী ও গণেশেব এবং দেবসেনা দেবীর মন্দির। কার্তিক স্বামী ও গণেশেব মন্দির পাশাপাশি। কার্তিক স্বামীর মন্দিরের কয়েক হাত দূরে একটি প্রাচীর। প্রাচীরের পার্শ্বেই দেবসেনার মন্দির। গণেশ ও দেবসেনার মন্দির পুরাতন ও জীর্ণ হওয়াতে ভক্তেরা নূতন প্রস্তরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে। কার্তিক স্বামীর মন্দির জীর্ণ ও পুরাতন। মন্দির বলিতে কোন জাঁকালো বুঝিবেন না,—সামান্য; আমাদের দেশে যেমন খোলার ঘর হয়, সেইরূপ। মন্দিরের মালিকের ইচ্ছা নয় যে এখানে কোন প্রস্তরের মন্দির হয়। তাই মন্দিরের এই দশা।

মন্দির যেরূপই হউক, তাহাতে দেবতার কিছু আসে যায় না। তাঁহার ইচ্ছা হইলে স্বর্ণমন্দিরও হইতে পারে। এই কাতারগামের মহান তীর্থ রামায়ণ-যুগেরও পূর্বে স্থাপিত হইয়াছিল। গণেশ ও দেবসেনার পূজা-আরতি হিন্দু দশনামী সন্ন্যাসী দত্তগিরি মহারাজ করেন। তিনি নিজেই রন্ধন করিয়া দেবতা ও দেবীকে ভোগ প্রদান করেন। কার্তিক স্বামী ও বালী আম্মাদেবীর পূজা ইত্যাদি বৌদ্ধ পুরোহিতেরা করেন।

সিংহলী বৌদ্ধদের দ্বারা এই প্রধান মন্দির পরিচালিত হয়। কার্তিক স্বামীর মন্দিরের মধ্যে কোন মূর্তি নাই, যন্ত্রেতে পূজা হয়। এই যন্ত্র কেহই নিরীক্ষণ করিতে পারে না। এই যন্ত্রকে সযতনে বিবিধ বস্ত্র দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে।

পরদিন প্রাতে স্বচ্ছসলিলা প্রবাহিতা মাণিক গঙ্গাতে আমরা স্নান করিয়া বেলা সাড়ে দশটার সময় প্রথমে গণেশ দেবতার পূজা, আরতি, ভোগ দর্শন করিয়া কার্তিক স্বামী, দেবসেনা, বালী আম্মা ও শিবের পূজা, আরতি ও ভোগ দর্শন করি। আমরা পরমান্ন ভোগ দিয়াছিলাম। পরমান্ন প্রস্তুত হইয়াছিল নারিকেলের দুগ্ধ দিয়া। সকল মন্দিরেই আমরা প্রসাদ ও আশীর্বাদ পাইয়াছিলাম। কার্তিক স্বামীব দুই সহধর্মিনী (দেবসেনা ও বালীআম্মা) দ্বারা মনে হয় আর্য কৃষ্টি (Aryan culture) এবং দ্রাবিড় কৃষ্টির (Dravidian culture) সমন্বয় সাধন করা হইয়াছিল। এখন সেই স্থানে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মিলন। এখন সকলেরই পূজা ও প্রার্থনার সমান অধিকারের স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মধ্যাহ্নে আমরা দত্তগিরি মহারাজের সুমধুর রন্ধন অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজন করিয়া কাতারগামের পরম দেবতাকে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া বিদায় লইলাম। ফিরিবার পথে আমরা Koslander হইয়া ঠিক সন্ধ্যার সময় বাদুলায় আসিলাম। Koslander হইতে Wellawaya যাইবার প্রায় তিন মাইল পথিমধ্যে আমরা

সিংহলের শ্রেষ্ঠ জলপ্রপাত দর্শন করি। পার্বত্য রাস্তা হইতে ৬২৮ ফুট উচ্চ হইতে এই প্রপাতের জল পতিত হইতেছে। এই জলপ্রপাতের নাম Diya luma। কলম্বো হইতে এইস্থান এক শত সাড়ে বাইশ মাইল দূরে অবস্থিত।

Adam's Peak দর্শন করিবার জন্য ৭ই মার্চ কলম্বো আশ্রম হইতে স্বামী ত্র্যম্বকানন্দ মহারাজজী বাদুলায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

১০ই মার্চ বাদুলা হইতে আমরা প্রাতঃকালে শ্রীপাদ দর্শনের উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। আমরা Hali-Ela, Welimada হইয়া গুরুতালা আসিলাম। গুরুতালা আসিবার সময় পথের দুই পার্শ্বে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত পথে ইউক্যালিপ্‌টাস্ বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। গুরুতালাতে St. Thomas কলেজ অবস্থিত। এই শিক্ষায়তনে নাগলিঙ্গমের পুত্র অধ্যয়ন করে। দেড়শত ছাত্র এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। ছাত্রগণ এইখানেই সকলে বাস করে। লোকালয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। নির্জন মনোরম স্থানে, নিরালায় এই শিক্ষায়তন। চারিদিকে ঢেউ-খেলান পাহাড়ের দৃশ্য, এই স্থানে ছাত্রদের স্বাস্থ্য, মন ও প্রাণ প্রফুল্ল থাকে। তপোবনের ব্রহ্মচর্য আশ্রমের কথা মনে পড়ে। নিত্য প্রকৃতির নানা খেলা দেখিয়া ছেলেদেরও মনের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়। এইস্থানে কিছু সময় অতিবাহিত করিয়া আমরা পুনবায় Welimada হইয়া পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করিয়া Hokgala garden-এ আসিলাম। Hokgala garden হইতে Narwara-Eliya সহর প্রায় ছয় মাইল। এইস্থানের উচ্চতা পাঁচ হাজার ছয়শত ফুট। এই Hokgala বোটানিক্যাল গার্ডেনে আসিলে সত্যই মনে হয় যেন স্বর্গের নন্দন কাননে আসিয়াছি। মন খুবই শান্ত এবং প্রফুল্ল হয়। বাগানটি Hokgala পাহাড়ের উচ্চ রকের (Rock) কোলে অবস্থিত,—সেইজন্যই ছায়াযুক্ত মনোরম আবহাওয়ায় মন সহজে অন্তর্মুখী হয়। বাগানে সুন্দর রঙ্গীন্ কাঁচের জানালাযুক্ত

টিনের বাড়ীগুলিও দেখিতে সুন্দর। আমরা এই বাগানে বিভিন্ন প্রকারের ফুল ও ফলের গাছ দেখিয়া দুই মাইল দূরে সীতা-এলিয়ায় আসিলাম। এই স্থানের মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী, অনুজ লক্ষ্মণ এবং হনুমানজীর মূর্তি আছে। নিত্য হিন্দু পূজারী পূজা করেন। মন্দিরের পশ্চাতে একটি ঝরণার জল ঝর্ ঝর্ করিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। শুনিলাম, জনকনন্দিনী সীতাদেবীর অশ্রুজলে এই ঝরণার উৎপত্তি। এই জল আমরা মস্তকে স্পর্শ এবং পান করিলাম। লঙ্কেশ্বর পবিত্রা সতীসাধ্বী সীতাদেবীকে এইস্থানে অশোকবনে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিলেন। Avisawella হইতে সীতা-এলিয়াই সিংহলে তাঁহার বন্দিনী অবস্থার স্থান প্রসিদ্ধ। এই দুই স্থানের কোন স্থানেই কোন প্রামাণ্য চিহ্ন নাই। রাবণ রাজার কোনই ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন লঙ্কায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহই সেই সম্বন্ধে কোন গবেষণা বা অনুসন্ধান করে না। সমস্ত দ্বীপে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব। সিংহলীদের এইদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। এই দ্বীপে শতকরা বাইশ জন হিন্দু বাস করিতেছে। তাহারা চেষ্টা করিয়া সীতাদেবীর মন্দিরটি সংস্কার করিতে পারে। এদিকে হিন্দুদের ভ্রূক্ষেপ নাই। এই-স্থানে লঙ্কায় সেই অশোকবনের বন্দিনী জানকী দেবীর কথা স্মরণ করিতে করিতে আমরা Nawara-Eliya-তে আসিলাম।

Nawara Eliya-ই হইতেছে সিংহলের সিমলা। উহা ৬০১৯ ফুট উচ্চে পিদ্রুতালাগালা পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। এই পিদ্রুতালাগালা হইতেছে সিংহলের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। ইহার উচ্চতা ৮২৯২ ফুট। সিংহলে হিমালয়ের মত চিরতুষারাবৃত পর্বত নাই। কলম্বো হইতে Nawara-Eliya এক শত সাড়ে পাঁচ মাইল। বাদুলা হইতে ইহা মাত্র সাড়ে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে। এখানে গভর্নরের "কুইন কটেজ" নামক সুন্দর একটি বাড়ী আছে। সহরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং খুব স্বাস্থ্যকর।

এখানে আমরা রেস্‌কোর্স (Race course), সুন্দর পার্ক, গল্‌ফ খেলার মাঠ, হোটেল, ক্লাব প্রভৃতি সবই আছে দেখিলাম। সবগুলি ছবির মত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) যাহারা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদের সম্মানার্থে একটি স্মৃতিস্তম্ভ (Monument) আছে।

আমরা Nawara Eliya হইতে Talawarele, Dimbulg Hatton হইয়া Maskeliya আসিলাম। পথিমধ্যে চায়ের বাগানের পর বাগান দেখিতে দেখিতে আসি। চায়ের বাগানের মধ্যে Gravetrum, Dadab এবং আরও দুই তিন প্রকারের গাছ দাঁড়াইয়া আছে দেখিলাম। গাছগুলি দেখিতে খুবই সুন্দর লাগে। আমাদের সহিত মধ্যাহ্নের আহার্য ছিল। Maskeliya-য় এক তামিল ভদ্রলোকের দোকানের দ্বিতলে বসিয়া আমরা সেই সকল আহার্য গ্রহণ করিলাম।

Maskeliya হইতে আমরা Laxapana Factory-র শেষ গাড়ীর রাস্তায় (Cart Road), Dalhousie Factory-র নিকট আমাদের মোটর গাড়ী রাখিলাম। Hatton হইতে এইস্থান ষোল মাইল। কলম্বো হইতে Hatton প্রায় ৭৭ মাইল। রত্ন-পুরার রাস্তা হইতে Maskeliya-র পথ ধরিয়া শ্রীপাদ যাওয়াই সুবিধাজনক। উহাতে কষ্ট কম হয়। আমরা এইস্থান হইতে সেতু পার হইয়া অল্প চড়াই করিয়া এক মাইল দূরে এক অতিথিশালায় আসিলাম। এই এক মাইল আসিতে কোনই কষ্ট হয় না। অবশিষ্ট দুই মাইল রাত্রিতে চড়াই করিব। তখন অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকা। এই অতিথিশালায় গণেশের মন্দির আছে। তথায় ভগবান্ শ্রীবুদ্ধদেবেরও একটি দাঁড়ান মূর্তি আছে। মস্ত বড় হলঘর। এখানে কত যাত্রী আসিতেছে-যাইতেছে। এখানে বিশ্রাম করিয়া, রান্না করিয়া যাত্রীরা আহারাদি করে। ইহার মধ্যে মস্ত বড় দোকান আছে। চাউল, ডাল, শুক্‌না মাছ, কলা, লেমনেড,

আইস্‌ক্রীম সোডা ইত্যাদি সবই পাওয়া যায়। পানীয় জলেরও কল আছে। এইস্থানে আরও দোকান এবং থাকিবার স্থান আছে। মিঃ নাগলিঙ্গমের পরিচিত এই স্থানটি। দোকানের লোক আমাদের জন্য ভিন্ন একটি বড় পরিষ্কার ঘর দিলেন। আমরা সেই ঘরে আশ্রয় লইলাম। রাত্রির আহার্য দিবার ভার তাহারাই লইল।

সন্ধ্যার সময় গণেশের আরত্রিক হইল। আমরা সকলে তাহা দর্শন করিলাম। রাত্রিতে আমরা ভাত, ডাল, আলুর তরকারীর সঙ্গে পাপড়ও আহার করিলাম। রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় আমরা সকলে শয়ন করিলাম। আমার চক্ষুতে কিন্তু নিদ্রাদেবী আসিলেন না,—আমি কেবল ভাবিতে লাগিলাম, সূর্যোদয়ের পূর্বে যেন ভগবান্ তথাগতের পাদপদ্মে পৌঁছাইতে পারি।

রাত্রি দুইটার সময় জাগরিত হইয়া জিনিসপত্র গুছাইয়া এক গ্লাস মোসাম্বীর রস পান করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম স্মরণপূর্বক রাত্রি আড়াই ঘটিকার সময় আমরা যাত্রারম্ভ করিলাম। তখন শুক্লপক্ষের একাদশীর রাত্রি। চাঁদের জ্যোৎস্না ছিল না। এক মশাল জ্বালান হইল। মশালের আলোতে আমরা পথ চলিতে লাগিলাম।

এইস্থান হইতে পর্বতের শৃঙ্গ দুই মাইল হইবে। কিয়দ্দূর আসিয়া একটি নদীর সেতু পার হইয়া খাড়া চড়াই করিয়া উঠিতে হইবে। সিঁড়ি আছে। অধিকাংশ পথেই পাহাড়ে ভীষণ জঙ্গল; কিন্তু এখানে কোন ভয় নাই। এই জ্যোৎস্না পক্ষে যাত্রীর ভীড় আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ণিমাতে সর্বাপেক্ষা বেশী ভীড় হইবে। এই মার্চ মাস হইতে বৈশাখী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত। বিশেষতঃ জ্যোৎস্না পক্ষে তীর্থযাত্রীরা এখানে দর্শন করিতে আসিয়া থাকে। অনেক সিংহলবাসী সূর্যোদয় দর্শনের অপেক্ষা না করিয়া দিবারাত্রির যে কোন সময় এই পরম তীর্থে যাতায়াত করে। শত শত বালক, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী মায়েরা তাদের শিশু সন্তানদের লইয়া যাইতেছে। অশক্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরও ধরিয়া লইয়া যাইতেছে।—এই দৃশ্য চক্ষুতে

না দর্শন করিলে বুঝিতে পারা যায় না। সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায় "করুণাময়! করুণাময়! সাধু! সাধু!' শান্ত ধ্বনি। 'করুণাময়'কে সিংহলীরা 'করুণায়য়' উচ্চারণ করে। সাধু, সাধু',—'শা' শা'। তাহার অর্থ 'পবিত্র হও, সৎ পথে চল।' কেহ কেহ গান গাহিয়া যাইতেছে। কোন দলের পুরোহিত ছড়া বলিতেছে,—তাহাকে অনুকরণ করিয়া পঁচিশ-ত্রিশজন স্ত্রী-পুরুষ সেই ছড়া আবৃত্তি করিতেছে। এমন কি তিব্বত, বর্মা, শ্যাম, চীন, জাপান হইতেও বৌদ্ধেরা এখানে শ্রীপাদ দর্শন ও পূজার্ঘ্য প্রদান করিতে আসেন। অনেকেরই হস্তে নারিকেল ছড়ার ফুল, ভগবানকে অর্পণ করিবে বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত লইয়া যাইতেছে। কেহ-বা পাহাড়ের পথিপার্শ্বে সূঁচ ও সূতা ভগবানকে অর্পণ করিতেছে। কয়েক স্থানে লোহার রেলিং ও লোহার চেন ধরিয়া সতর্কতার সহিত উঠিতে হয়। কোথাও-বা খাড়া চড়াই,—অতি সাবধানে উঠিতে হয়। পথিমধ্যে লেমোনেড্, চা, ফল, পাঁউরুটীর দোকানও আছে। পাহাড়ের শীর্ষস্থানে বৈদ্যুতিক আলো আছে।

আমরা চারিটা পঁয়ত্রিশের সময় শ্রীপাদে যাইয়া পৌঁছিলাম। আমার এই সমস্ত পাহাড়ের পথ চড়াই করিতে তিন ঘণ্টারও কম সময় লাগিয়াছিল। এই পর্বত Adam's Peak নামে খ্যাত। এইটি সিংহলের দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ। ইহার উচ্চতা ৭৩৬৮ ফুট হইবে। ভগবান বুদ্ধদেব যখন সিংহলে তৃতীয়বার আসিয়াছিলেন তখন তিনি এইস্থানে এই পদচিহ্ন রাখিয়া যান। এই পর্বতে এক পদ রাখেন, আর অন্যপদ রাখেন ভারতবর্ষে। সেই সময় তাঁহার কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। সেইজন্য শ্রীপাদে বৌদ্ধভক্তগণ নূতন কাপড় অর্পণ করেন। তাঁহার কাপড় সেলাই করিবার জন্য ভক্তেরা সূঁচ ও সূতাও অর্পণ করেন।

এই পর্বতের প্রকৃত নাম সমানকূট। 'কূট' অর্থ শৃঙ্গ (Peak)। হিন্দুগণ মনে করে, নটরাজ নৃত্য করিতে করিতে

তাঁহার শ্রীপদ এইস্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন,—ইহা তাঁহারই পদ-চিহ্ন। মুসলমানগণ মনে করে এইটি আদমের (Adam) পদচিহ্ন। সেইজন্যই তাহারা এইস্থানে আদম বাবার পদচিহ্ন দেখিতে আসিয়াছিল।

এইবার একটিমাত্র মুসলমানকে এই তীর্থে আসিতে দেখিয়াছি। মুসলমানগণ পথ চলিতে চলিতে "আল্লা হো আকবর" বলে। হিন্দুরা বলে "হর হর।" এই তীর্থে সিংহলী বৌদ্ধ যাত্রীরই বেশী সমাগম হয়। তাহারা এই শ্রীপাদকে অন্তরের সহিত যে কি অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে, তাহা আমি আমার লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করিতে অক্ষম।

শ্রীপাদের মন্দিরের পার্শ্বেই সমান দেবীও আছেন। সমান দেবীর মূর্তিটি রৌপ্যনির্মিত। তাঁহার কণ্ঠে স্বর্ণ ও বহু মণিমাণিক্য খচিত প্রস্তরের মালা আছে। তাঁহার পার্শ্বে একটি রৌপ্যনির্মিত হস্তীও আছে। হস্তীর গাত্রেও নানা পাথরের ও স্বর্ণহার আছে। এই সমান দেবীর মূর্তিটি দেখিতে সুন্দর। আমার বেশ ভাল লাগিল। আমরা আসিবার সময় সিংহলী স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা নির্বিশেষে সকলের মুখে শুনিতেছিলাম, "সুমন সমান দেহি পিহিটাই",—"হে সুমন দেবতা, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন; আমাকে পরিত্রাণ করুন।" কেহবা বলিতেছে, "আপে বুদ্ধুন।" কেহবা বলিতেছে, "বুদ্ধং শরণে শিরসদ্বারাগেনঃ। ধর্ম্মং শরণে শিরসদ্বারাগেনঃ॥ সঙ্ঘং শরণে শিরসদ্বারাগেনঃ॥"—শ্রীবুদ্ধের চরণ আমাদের শির রক্ষা করিতেছে।

রাজা নিঃশঙ্কমল্লই জনসমাজে সমানকূটে শ্রীপাদের পূজার প্রচার করেন। বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান সকলেই এখানে পূজা প্রদান করেন। তাহারা স্ব স্ব অভিরুচি অনুযায়ী পূজা দেয়। সেই পরম সত্যের কাছে সকলেরই পূজা যাইয়া পৌঁছায়। এখানেই স্মরণ হয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই অমর বাণী,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥"

—হে পার্থ, যে যেমন ভাবে আমার শরণাপন্ন হয়, আমি তাহাকে সেইরূপ অনুগ্রহ করি। মানুষ সকল প্রকারে আমারই পথের অনুসরণ করে।

এই সঙ্গে যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীও মনে হয়, —"যত মত তত পথ।" এখানে ধর্ম-সমন্বয় হইয়াছে।

আমি শ্রীপাদের মন্দিরের এক কোণে দাঁড়াইয়া শ্রীপাদ দর্শন ও সিংহলবাসীদের পূজা-পদ্ধতি দেখিতেছিলাম। কেহ নারিকেল ছড়ার ফুল, কেহ পদ্মফুল, কেহবা নূতন কাপড়, গোলাপ জল ও চন্দন শ্রীপাদে পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত অর্পণ করিতেছে। কাহাকেও-বা দেখিলাম, নবজাত শিশুকে শ্রীপাদ স্পর্শ করাইতেছে। আমি নিজে শ্রীপাদে মস্তক স্পর্শ ও প্রণাম করিলাম। যাঁহারা এই তীর্থে মানস করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের সিংহলী পুরোহিতগণ ঘাড় টিপিয়া মস্তক স্পর্শ করাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র পাঠ করাইতেছে।

আমরা মন্দিরের বাহিরে আসিলাম। হু হু করিয়া হাওয়া বহিতেছে। সেইজন্য আমরা সকলে শীত অনুভব করিতেছিলাম। মন্দিরের পশ্চিম দিকের একস্থানে হোমানল প্রজ্বলিত হইতেছিল। তাহাতে বৌদ্ধভক্তগণ নারিকেল তৈল ও নারিকেল আহুতি দিতেছিল। এইস্থানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া আমরা আমাদের শরীর গরম করিয়া লইলাম। অতঃপর আমি সূর্যোদয় দর্শন করিবার জন্য শ্রীপাদে মন্দিরের উত্তর দিকের দরজার নিকট আমার স্থান করিয়া লইলাম। সূর্যোদয় হইবার পূর্বক্ষণ আকাশে রংয়ের খেলা দেখিলাম। সেই সময় সকলে শীতকে অগ্রাহ্য করিয়া অরুণোদয়ের জন্য একমনে একদৃষ্টিতে পূর্ব গগনে তাকাইয়া আছে। কাহারও কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। পাহাড়ের উপরে ফগ (Fog) পড়িয়া আছে।

অরুণোদয়ের পূর্বক্ষণে কিরণজাল পড়াতে ইহা যেন ঠিক তপ্ত কাঞ্চণের ন্যায় দেখা যাইতেছিল। আহা! এই ক্ষণকাল সকলের মন সেই চিরসুন্দরের নিকট চলিয়া যায়। চতুর্দিকে পাহাড়ের পর পাহাড় ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে। এই স্থানের সকল পাহাড়ের মধ্যে এই সমানকূটের চূড়া সকলের উচ্চ স্থান,—প্রকৃতির এই সুন্দর স্থানে আসিলে মানুষের মনের সকল কালিমা দূর হইয়া যায়। তিনি সুন্দর! তাই তাঁর এই প্রতিচ্ছবি শোভার এত সৌন্দর্য!

যখন দিগন্ত ভেদ করিয়া অরুণোদয় হইল, তখন মনে হইতেছিল যে তরুণ তপন চক্রের ন্যায় ঘুর্ণায়মান্ হইয়া উঠিতেছে। এই দৃশ্য ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

ঠিক এই সময় অদূরে এই পর্বতের চূড়ার ছায়া পশ্চিম দিকে পতিত হয়। এই সময় শত শত সমকণ্ঠে আবার ধ্বনি উঠিল,—"করুণাময়! করুণাময়! সাধু! সাধু!"

১৬ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে পোলানারুয়া স্টেশনে নামিলাম। এখান হইতে তিন মাইল অতিক্রম করিয়া পোলানারুয়ার ধ্বংসাবশেষের নিকটে আসিলাম। এই পোলানারুয়া সিংহলের দ্বিতীয় রাজধানী ও সভ্যতার কেন্দ্র। আমার সঙ্গে একজন সিংহলবাসী ভদ্রলোক ছিলেন। প্রথমেই আমরা রাজা পরাক্রম বাহুর প্রাসাদ, দরবার গৃহ, স্নানের স্থান দেখিলাম। কিয়দ্দূরে যাইয়া দেখিলাম একটি শিবমন্দির। মন্দিরের মধ্যে শিবলিঙ্গ দর্শন করিলাম। পোলানারুয়ায় সর্বত্রই ভারতবর্ষের শিল্পকলার ও সূক্ষ্ম কারুকার্যের ছাপ দেখা যায়—ভারতীয় অনুকরণে প্রস্তুত। স্তুপারামায় নিরেট ইটের কারুকার্যময় বাড়ীটি ও মধ্যে সুন্দর দাঁড়ান মস্তকবিহীন বুদ্ধদেবের মূর্তি আছে। নানাস্থানে প্রাচীন রাজপ্রাসাদ ও ডাগোবা—বিহারের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। একস্থানে দেখিলাম খননকার্য করিয়া একটি প্রাসাদ বাহির করিয়াছে। রাজা পরাক্রম বাহুই এই রাজত্ব এখানে প্রতিষ্ঠা

করেন। ভাটাডাগের বিহারের পিছনে সাতমহল প্রাসাদ এখনও বর্তমান। ভাটাডাগের বিহারের সম্মুখে হাটাডাগে বিহার। এই বিহারটি ছিল দন্ত মন্দিরের। এই বিহারটি নির্মাণ করিয়াছিল নিঃশঙ্কমল। ইহার পার্শ্বেই ২৭ ফুট লম্বা গল্লটা (golpata) বা stone rock—পাথরে লেখা দেখিলাম। ভাটাডাগে বিহারটি গোলাকারে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহার চারিদিকে প্রবেশদ্বার। প্রবেশদ্বারে moon stone আছে। দ্বারের দুই পার্শ্বেই দ্বারপালের সুন্দর কারুকার্যময় মূর্তি আছে। Moon stone হইতে আট-নয়টি ধাপ। প্রতিটি ধাপ কারুকার্যময়। উপরেও শিল্প-কারুকার্য দেখা যায়। ধাপের উপরে উঠিলেই ধ্যানী বুদ্ধ-মূর্তি দর্শন হয়। চারিদিকেই এইরূপ ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি দেখা যায়। একদিকে ধ্যানী বুদ্ধমূর্তির মস্তক নাই। এইরূপ প্রস্তরে শিল্প-কারুকার্যময় গঠন সিংহলে বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ দিকে গেলে পবলু বিহার ও শিবদেবল দেখিতে পাওয়া যায়। এই শিবদেবল সম্পূর্ণ প্রস্তর দিয়া নির্মাণ করিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের এগার শতাব্দীর চোল রাজত্বের শিল্পকারুকার্যের অনুকরণে ইহা গঠিত হইয়াছিল।

এইস্থান হইতে প্রায় এক মাইল হাঁটিয়া গিয়া আমরা রঙ্কোট বিহার ডাগোবা দর্শন করিলাম ও পরিক্রমা করিলাম। পোলানারুয়াতে এই ডাগোবা হইতেছে সর্বাপেক্ষা বড়। ইহা উচ্চতায় ১৮০ ফুট এবং পরিধিতে ৫৫০ ফুট। এই ডাগোবাটি রাজা নিঃশঙ্কমল নির্মাণ করেন।

এইস্থান হইতে আমরা লঙ্কাতিলক ও জেতাবনরামায় গেলাম। এই জেতাবনরামায় একটি ভগ্ন বুদ্ধমূর্তি দেখিলাম। ইহা উচ্চতায় ২৫-৩০ ফুট হইবে। জেতাবনরামার দেওয়ালগুলি এখনও পর্যন্ত দাঁড়াইয়া আছে। ইহার উচ্চতা ৫৫ ফুট। ইহার সম্মুখে সুন্দর

স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ। মণ্ডপের স্তম্ভগুলি সুন্দর কারুকার্যময়, এখনও যেন ঠিক পূর্বের গৌরবকে ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

লঙ্কাতিলকের ঠিক উত্তরেই কিরিবিহার। এই বিহারটি পরাক্রম বাহুর প্রথম রাণী সুভদ্রা দেবী নির্মাণ করেন।

এইস্থান হইতে কিয়দ্দূর উত্তরে গেলে গলবিহার। এখানে ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণ অবস্থার শায়িত একটি প্রস্তরমূর্তি আছে। উহা লম্বায় ৪৪ ফুট। এই মূর্তির পার্শ্বে তথাগতের প্রিয় শিষ্য, তাঁহার সেবক আনন্দ ক্রন্দনরত অবস্থায় দণ্ডায়মান। এই মূর্তিটিও প্রস্তরের এবং ২২ ফুট উচ্চ। ইহা ছাড়াও এই বিহারের আরও দুইটি প্রস্তরনির্মিত ধ্যানী মূর্তি আছে।

বেলা অধিক হইয়াছে। রৌদ্র! তজ্জন্য সম্মুখে বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ডের ছায়ায় বসিয়া এই সকল মূর্তি দর্শন ও চিন্তা করিতে লাগিলাম। এই গলবিহারের এই চারিটি মূর্তি দেখিয়া আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিলাম। হৃদয় ও মন তখন খুবই আনন্দে মস্‌গুল হইয়াছে।

এইস্থান হইতে এক মাইল দূরে আমরা Lotus bath দেখিলাম। এই লোটাস্ বাথটিও প্রস্তরের নির্মিত। ইহাও দেখিতে সুন্দর। এইস্থান হইতে কিছুদূরে এক উচ্চস্থানে থূপারামায় ও লঙ্কাতিলকের ন্যায় মন্দির (shrine) দেখিলাম। ইহাকে নর্দার্ণ টেম্পল বলে। ইহার ভিতরে মস্তকবিহীন এক বুদ্ধমূর্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই মন্দিরের দেওয়ালে অজন্তা ও সিগিরিয়ার ন্যায় চিত্র দেখিলাম। শ্রীবুদ্ধের জীবনের ঘটনা-বলীকে অবলম্বন করিয়া এই চিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়াছিল। চিত্রগুলি সবই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে,—অস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। এখন এই অস্পষ্ট চিত্রগুলি রক্ষা করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পোলোনারুয়ার ধ্বংসাবশেষের ইহাই দ্রষ্টব্যের শেষস্থান।

এখান হইতে ফিরিবার পথে দেড় মাইল দূরে, চারিদিকে

জঙ্গলের মধ্যে উচ্চস্থানে আমরা একটি ডাগোবা দর্শন করিয়া পুনরায় গলবিহারে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

গলবিহারের সন্নিকটে কয়েকজন ইংরেজ পুরুষ ও মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাহাদের সহিত আমার কথাবার্তাও হইল। তাহারাও এই ধ্বংসাবশেষ দেখিতে আসিয়াছেন। সিংহলের এই ধ্বংসস্তূপ দেখিবার জন্য পৃথিবীর নানাস্থান হইতে নানা লোকের আগমন হয়। ভগবান বুদ্ধদেবকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর কত সঙ্ঘারাম, কত গুম্ফা, কত প্যাগোডা, কত মন্দির নির্মিত হইয়াছে! কত শিল্পকলা, কারুকার্য গঠিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভগবান বুদ্ধদেব সমগ্র এশিয়ার আলো। তাঁহারই আলো একদা জগতে বিকীর্ণ হইয়াছিল। এই আলোকধারার উৎস ভারতবর্ষে।

আজ স্বামী বিবেকানন্দের সেই ভবিষ্যদ্বাণীই মনে পড়ে,—"এই ভরতবর্ষই ভবিষ্যতে জগতে আলোক বিতরণ করিবে।" সারিপুত্র ও মদ্‌গল্যায়নের পূতাস্থি অর্পণের উৎসবের দিনে এশিয়ার বিভিন্ন স্থান মঙ্গোলিয়া, চীন, শ্যাম, ভূটান, নেপাল, তিব্বত, সিংহল, বর্মা প্রভৃতি দেশ হইতে প্রতিনিধিগণ, ভিক্ষুগণ, জনগন কলিকাতা মহানগরীর ময়দানে সমবেত হইয়াছিল ভারতশক্তির কোন ধারাকে অবলম্বন করিয়া। সেই ধারাকেই অনুসরণ করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ঐ উৎসবের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। এই ধারাকে অবলম্বন করিয়া যাহাতে সমগ্র এশিয়াতে ঐক্য ও ভ্রাতৃভাব আসে তাহারই তিনি চেষ্টা করিতেছেন।

৩রা ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে সাড়ে সাত ঘটিকার সময় কলম্বো ফোর্ট স্টেশন হইতে Matara রওনা হই ডিজেল ট্রেনে। এই ট্রেন সমুদ্রের তীর দিয়া যাইতে লাগিল। অনবরত মহাসাগর (Indian Ocean) দর্শন করিতে করিতে এবং নারিকেল বৃক্ষ আচ্ছাদিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নগর ও গ্রামগুলি দেখিতে দেখিতে বেলা ১২ ঘটিকার সময় সিংহলের দক্ষিণ দিকের শেষ স্থান, Matara শহরে

আসিয়া পৌঁছিলাম। এই Matara কলম্বো হইতে সাড়ে তিরানব্বুই মাইল। Matara রেল-স্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে Sea Beach. স্টেশন হইতে টাঙ্গা গাড়ীতে সমুদ্রের তীরে আসিলাম। ডাচ্‌রা সমুদ্রের নিকটেই দুর্গ (Fort) নির্মাণ করিয়াছিল। এইস্থানে নীলগঙ্গা নদী সমুদ্রে আসিয়া পতিত হইয়াছে। নদীর মোহনায় অনেক কুম্ভীর দেখা যায়। এখানে কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত করিয়া মোটর বাসে Galle রওনা হইলাম। পথিমধ্যে গ্রামগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখিলাম। আগামীকল্য স্বাধীনতা দিবস। সর্বত্রই লক্ষ্য করিলাম, সকল গ্রাম, সকল নগরবাসী আগামীকল্যের উৎসবের জন্য ব্যস্ত এবং খুব তোড়জোড় আরম্ভ হইয়াছে। সিংহল-বাসিগণ স্বাধীনতার স্বাধীন আনন্দ আস্বাদন করিবার জন্য উৎসুক।

প্রায় আড়াই ঘটিকার সময় Galle-এ আসিয়া পৌঁছিলাম। একটি বালক এই মধ্যাহ্নের রৌদ্রের মধ্যে আমাকে গলের বন্দর (Harbour) ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থান দেখাইতে লাগিল। পরিশেষে বালকটি আমাকে স্টেশনের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া বিদায় লইল।

গল শহরটি যদিও ছোট, তথাপি বেশ সুন্দর। গলের দুর্গ (Fort) ডাচ্‌রা নির্মাণ করে। দুর্গ হইতে সমুদ্রের দৃশ্য দেখিতে খুব মনোরম। এখানে একটি সুন্দর বাগান আছে। ডাচ্‌রা ১৬৪০ খ্রীস্টাব্দে Galle অধিকার করে। সিংহলের মধ্যে সম্ভবতঃ ডাচ্‌দের এই দুর্গ ভালভাবে সংরক্ষিত রহিয়াছে। ১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দে ডাচ্‌রা একটি সুন্দর গীর্জা (Church) নির্মাণ করে। Galle পর্তুগীজদের Fort ছিল। Station-এ আমাকে দেখিয়া অনেক সিংহলবাসী হাত দেখাইবার জন্য উপস্থিত হয়। আমি তাহাদের বলিলাম, "আমি palmist নই।" সিংহলীরা জ্যোতিষশাস্ত্রে খুব বিশ্বাসী। সিংহলীরা মাদুলী, তাবিজে বিশ্বাস করে। এই মাদুলীর ভিতর বৌদ্ধ পুরোহিত মন্ত্র লিখিয়া পূরিয়া দেয়। বৌদ্ধ সিংহলবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই মাদুলী ধারণ করিলে ভূত, প্রেত, পিশাচ, অপদেবতা

ও মহামারীর ভয় থাকে না। তাহারা কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।

রাত্রি ১০টা ১০ মিনিটের সময় Wella welta স্টেশনে আসিয়া পৌঁছাই। তখন শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সেই ঘন অন্ধকারে রেল লাইন ধরিয়া চলিতে চলিতে ভারত মহাসাগরের গর্জন শুনিতে শুনিতে রাত্রি প্রৌণে এগারটার সময় আমাদের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হই।

৫ই ফেব্রুয়ারী কলম্বো মিউজিয়মে যাই। মিউজিয়মের 6th century-র Sigiriya Fresco Art এবং 12th century-র Polonunua-র Art-এর চিত্র দেখিয়া আমি বিশেষ মুগ্ধ ও আনন্দিত হইলাম। এই দুই century-র Art-এর সহিত অজন্তার Art-এর সাদৃশ্য আছে। এই দুই শতাব্দীর শিল্পকলা অজন্তার শিল্পকলার খুবই কাছাকাছি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। Fresco গুলি স্ত্রীলোকের মূর্তি। অনেকগুলি চিত্র দেখিলাম জাতকের গল্পকে অবলম্বন করিয়া অঙ্কিত হইয়াছে। কতকগুলি water colour চিত্র কলম্বো ও সিংহলের বিভিন্ন স্থানের সুন্দর সুন্দর দৃশ্যের চিত্র দেখিলাম। এই চিত্রগুলি একশত বৎসর পূর্বে অঙ্কন করা হইয়াছে ; কিন্তু মনে হয় যেন শিল্পী এখনই, এইমাত্র উহা শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। Sigiriya ও polonunua-র চিত্রগুলি ভারতবর্ষের অজন্তার দেওয়াল চিত্রের ন্যায় প্রসিদ্ধ। মিউজিয়ামে বিভিন্ন শতাব্দীর বিভিন্ন মুদ্রা (coin) দেখিলাম। ডাচ্‌দের ব্যবহৃত furniture দেখিলাম। সেইগুলি এই সিংহলের কাষ্ঠের নির্মিত। রত্নপুরায় অনেক প্রকার gems (মণিমাণিক্য) দেখিলাম। অনেক প্রকার নানা রংয়ের প্রজাপতিও দেখিলাম। আর একটি জিনিস দেখিয়া আমি খুবই আনন্দিত ও উল্লসিত হইলাম। উহা হইতেছে, এই স্বর্ণলঙ্কার স্বর্ণ-সিংহাসন ও স্বর্ণমুকুট। দেখিলাম, মুকুটে বহু মণিমাণিক্য রহিয়াছে। স্বর্ণসিংহাসনের সোনার পা-দানিও আছে। এই স্বর্ণসিংহাস

১৯৩৬ সনে ব্রিটীশ গভর্নমেণ্ট পুনরায় ফেরৎ দেয়। লঙ্কার মহারাজার সোনার তরবারি ও তববারির সোনার খাপ এবং সোনার লাঠিও দেখিলাম। লাঠিখানার মাথায় অনেক মাণিমাণিক্য আছে দেখিলাম। এই স্বর্ণসিংহাসনে শ্রীবিক্রম রাজসিংহ বসিতেন। তাঁহারই শিরে এই মাণিমাণিক্য-হীরা-সংযুক্ত স্বর্ণমুকুট ব্যবহৃত হইত। স্বর্ণ সিংহাসন আসিবার দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে বিনা রক্তপাতে সিংহলের স্বাধীনতা সূর্য তাহার ভাগ্যাকাশে পুনরায় উদিত হইল।

গতকল্য প্রথম বৎসরের স্বাধীনতা-দিবস উৎসব উদ্‌যাপিত হইল। শ্রীভগবানের নিকট একান্ত মনে প্রার্থনা করি, সিংহলের স্বাধীনতা-সূর্য চির অক্ষুণ্ণ থাকুক।

গতকল্য স্বাধীনতা দিবসে পঞ্চাশটি সিংহলী বালিকা "নমো নমো মাতা" বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের সুরে সিংহলী ভাষায় গাহিল। এই গানটি শুনিয়া আমি প্রাণে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম।

১৬ই ফেব্রুয়ারী আমি অপরাহ্নে Polonarua হইতে Batticaloa রওনা হই। সন্ধ্যায় Batticaloa আসিয়া Kalladi Uppodai-তে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন শিবানন্দ বিদ্যালয়ে পৌঁছিলাম। এইস্থানে আসিয়া স্বামী নটরাজানন্দ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি এইস্থানে আসিতেই ছাত্রাবাসের বালকের দল আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহারা একজন নূতন অতিথি পাইয়া ভারী খুশী। তাহারা কে যে কি করিবে, কি ভাবে আমার সেবা করিবে, তাহা ভাবিয়া কূল-কিনারা পায় না। এই শিবানন্দ বিদ্যালয়ের স্বামী বিপুলানন্দ মহারাজের বিশেষ দান আছে। তিনি পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। স্বামী বিপুলানন্দকে এই আশ্রমেই মহাসমাধি দেওয়া হয়। তিনি প্রবুদ্ধ ভারতের editor ছিলেন। সিংহলে যেখানেই গিয়াছি, ট্রেনে যেখানেই ভ্রমণ করিয়াছি, এমন কি নিরক্ষর তামিল-

বাসিগণও সর্বত্রই বিপুলানন্দের নামে অশ্রু বিসর্জন করে দেখিয়াছি। তিনি দক্ষিণ ভারতের ও সিংহলের তামিল ভাষায় মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ে তামিল ভাষার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি তামিল ভাষার অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। সিংহল গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে উচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি তামিল সঙ্গীতের গবেষণা করিয়া "Yoll Nool" নামে একখানি প্রাচীন তামিল সঙ্গীতের পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে তামিল ভাষায় অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তিনি মাত্র পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার দেহত্যাগে সিংহল ও দক্ষিণ ভারতের মহাক্ষতি হইয়াছে। নটরাজানন্দ মহারাজের সঙ্গে Batticaloa (বাট্টিকোলাও) হইতে বহু শহর ও বহু গ্রামে গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম ও অনেক বালক ও বালিকা বিদ্যালয় আমি পরিদর্শন করি। Batticaloa-র Sea-Beach ভ্রমণ করিবার উপযুক্ত স্থান নয়। এই Batticaloa-র লেগুণে (Lake) Singing Fish আছে। আমি কৃষ্ণপক্ষে এখানে আসিয়াছি; তাই আমার মৎস্যের এই মধুর সংগীত শুনিবার সুযোগ হয় নাই। জ্যোৎস্না পুলকিত নিঝুম নীরব রজনীতে গভীর জলে এই মৎস্যদের সংগীত শুনিতে পাওয়া যায়। এই জ্যোৎস্না পুলকিত আকাশের হাসির ফোয়ারা! তন্মধ্যে এই মাছের সংগীত সত্যই দুর্লভ।

সিংহলে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সহিত England-এর ইতিহাসের বিশেষ পরিচয় আছে। কিন্তু তাহারা ভারতের ইতিহাসের কোন খবরই জানে না। সিংহলের সর্বত্রই আমি ছাত্রদের কাছে ছত্রপতি শিবাজী, রাণাপ্রতাপ, ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, অহল্যাবাঈ, রাণী দুর্গাবতী, চাঁদবিবি প্রভৃতির ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কিছুই উত্তর দিতে পারে না। এমন কি

এইসব বীরদের নামও তাহারা জানে না। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্র তাহাদেরই সহিত ভারতের ইতিহাসের সামান্য পরিচয় আছে। আমি সিংহলের ছাত্রছাত্রীদের এই সব বীরদের জীবনকাহিনী শুনাইতাম। আর একটি আশ্চর্য, নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রের নাম সিংহল দ্বীপের কেহই জানে না। সর্বত্রই দেখিয়াছি মহাত্মা গান্ধীজি ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর প্রতিকৃতি। তাহাদের জীবন চরিতের সহিত সকলেরই পরিচয় আছে। আমি সিংহলের সর্বত্রই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনী ও বাণী সকলকে শুনাইতাম। আমি Batticaloa-ই হইতে একদিন মামনঙ্গনা যাই। সেখানে একটি ছোট পুষ্করিণী দেখি। মহাবীর হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করিয়া পিপাসার্ত হইয়া এই পুষ্করিণীব জল পান করিয়াছিলেন।

Batticaloa-এর অনেক গ্রামে, অনেক বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েদের নৃত্য ও গানে আমার চিত্ত মুগ্ধ হইয়াছিল। তখন মনে হইতেছিল আমাদের দেশের স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয়কে ও তাঁহার "ব্রতচারী নৃত্যের" কথা। এই নৃত্য-গান ঠিক সেইরূপ। এই গ্রাম্য বসন্ত নৃত্য-সংগীত Batticaloa-র নিজস্ব সম্পদ। Harvest-এর সময় গ্রামবাসীরা আনন্দের সহিত এই গান ও নৃত্য করে। এই সম্বন্ধে একখানি বই,—"Vasanta Folk Dance Songs" দেখিলাম। Mr. J. T. Sadasiva Iyer এই পুস্তকের সংগীতগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন।

সিংহল ভ্রমণে সর্বত্র রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষা বিস্তারের কার্য দেখিয়া আমি মুগ্ধ ও আনন্দিত হইয়াছি।

২৩শে ফেব্রুয়ারী Colombo Harbour-এ একটি তিমি মাছ ও তাহার বাচ্চা প্রবেশ করিয়া বন্দর তোলপাড় করিতেছিল। তিমি মাছটি ৫০ ফুট লম্বা ও তাহার বাচ্চা ১৫ ফুট। উহাকে কিছুতেই বন্দর হইতে বাহির করিতে পারে নাই। সকলেরই ভীষণ চিন্তা

হইয়াছিল; কিন্তু ২৬শে ফেব্রুয়ারী মাছ দুইটি Harbour হইতে আপনা হইতেই বহির্গত হয় এবং ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ দিকে জলে ভাসিয়া যায়। Harbour-এর মধ্যে এইরূপ জানোয়ার থাকা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। এইরূপ তিমি মাছ সাধারণতঃ ভারত মহাসাগরের দিকে দেখা যায় না। ইহাদিগকে সাধারণতঃ আফ্রিকায় মাদাগাস্কার ও অস্ট্রেলিয়ার দিকে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের Quilion-এর তীরে এইরূপ এক জানোয়ার মৃত অবস্থায় ভাসিয়া আসিয়াছিল। তখন দেখা গিয়াছিল, আর এই এতদিন পর এদিকে ভারতসাগরে দেখা গেল। ২৬শে ফেব্রুয়ারী দ্বিপ্রহরে এই তিমি মাছ দেখিতে পাই আশ্রমের কাছে সাগরতীরে। সেইদিন সাগরতীরে বহু জনসমাগম হইয়াছিল। এই মৎস্য দেখিবার জন্য আবাল বৃদ্ধবনিতা, যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় ছুটিয়া আসিয়াছে ভারত মহাসাগরের তীরে।"

ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্য ৯ই ফেব্রুয়ারী জাফ্না আসিয়া পৌঁছাইলেন। জাফ্না শহরটি কলম্বো হইতে ২৪৯ মাইল দূরে অবস্থিত। জাফ্নাতে সম্বুদ্ধচৈতন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বৈদ্যেশ্বর বিদ্যালয়ে অবস্থান করেন। জাফ্না আগমন করিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য কুমারস্বামীর এক পুত্রের সহিত শহরের দ্রষ্টব্যস্থান সমূহ পরিদর্শন করিতে বাহির হইলেন। এখানে ওলন্দাজদের নির্মিত একটি সুন্দর দুর্গ আছে। উহার নিকটেই লেগুন (সরোবর)। এতদঞ্চলে নেল্লোর পল্লীতে সুপ্রাচীন সুব্রহ্মনিয়া মন্দিরটি তিনি পরিদর্শন করিলেন। সিংহলে হিন্দুধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে অন্যান্য দেবদেবী অপেক্ষা কার্তিক এবং গণেশই সমধিক পূজিত হইয়া থাকেন। এইজন্য সিংহলের হিন্দু-মন্দিরসমূহে কার্তিক-গণেশের মূর্তি অধিক দৃষ্ট হয়।

আমেরিকার চিকাগো শহরে বিশ্ব-ধর্ম সম্মেলনে অভূতপূর্ব

সাফল্যলাভের পর স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তিনি সিংহলের জাফ্‌না শহরে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময় স্থানীয় হিন্দু কলেজে স্বামিজী তত্রত্য অধিবাসিগণ কর্তৃক বিশেষভাবে সম্বর্ধিত হইয়াছিলেন এবং সেখানে তিনি জাফ্‌নাবাসীদের নিকট একটি বক্তৃতাও প্রদান করিয়াছিলেন। সম্বুদ্ধচৈতন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত এই স্থানটি পরিদর্শন করিলেন। পরদিবস তিনি চুমনাকুমে মিঃ পোনিয়ার সহিত রামনাথন কলেজটি পরিদর্শন করেন। এই কলেজে প্রায় এগার শত ছাত্রী অধ্যয়ন করে। কলেজের অধ্যক্ষা মিসেস্ এন. পি. পিল্লাই স্বয়ং ঘুরিয়া ঘুরিয়া সম্বুদ্ধ-চৈতন্যকে কলেজটি দেখাইলেন। সম্বুদ্ধচৈতন্য তাঁহার সহিত কলেজের পদার্থ বিদ্যা এবং রসায়ণ বিদ্যাব পরিক্ষাগার (Laboratory) দুইটিও পরিদর্শন করিলেন। এই কলেজে তাঁতবোনা এবং সেলাইও শিক্ষা দেওয়া হয়। সম্বুদ্ধচৈতন্য দেখিলেন, চল্লিশটি সেলাই কলে বসিয়া চল্লিশজন শিক্ষার্থিণী সেলাই করিতেছে। অধ্যক্ষ মিসেস্ পিল্লাই সম্বুদ্ধচৈতন্যকে কলেজের প্রার্থনা কক্ষেও (Prayer hall) লইয়া গেলেন। কলেজের সমস্ত ছাত্রী এখানে সমবেতভাবে প্রর্থনা করে। প্রার্থনা কক্ষে সরস্বতী দেবীব একটি মূর্তি আছে। এই কলেজের বোর্ডিংয়ে চারিশত ছাত্রী বাস করে। মিসেস্ পিল্লাই নিঃসন্তান। ছাত্রীদিগকে তিনি সমস্ত মনপ্রাণ ঢালিয়া শিক্ষাদান করেন। সম্বুদ্ধচৈতন্যকে তিনি বলিলেন, "এই মেয়েরাই—কন্যা। এদের সেবাতেই আমার দিনরাত্রি কাটে; অন্যদিকে আর মন দেবার সময় থাকে না।"

বাস্তবিকই মিসেস্ পিল্লাই ছাত্রীদিগের নিকট সাক্ষাৎ জননীর ন্যায় ছিলেন। তিনি আদর্শ নারী। মিসেস্ পিল্লাইয়ের স্বামীর সহিতও সম্বুদ্ধচৈতন্যের পরিচয় হইয়াছিল। তিনিও একজন অমায়িক ব্যক্তি। মিঃ পিল্লাই দিনরাত্রি পড়াশুনা লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। পরলোকগত রামনাথের জামাতা মিঃ এস্. নাটসানের

সহিতও সম্বুদ্ধচৈতন্যের পরিচয় হইয়াছিল। তিনি পরমেশ্বরম্ কলেজের অধ্যক্ষ। মিঃ পুনিয়ার গ্রামের বাড়ীতে যাইয়া সম্বুদ্ধ-চৈতন্য মধ্যাহ্ন ভোজন করিলেন। আহার্যের সহিত তাঁহাকে কলম্বো এবং রাঙ্গামাটীর আমও দেওয়া হইয়াছিল। আমাদের দেশে এই সময় পাকা আম পাওয়া যায় না। মিসেস্ পুণিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্য প্রভৃতিকে জননীর ন্যায় আহার্য পরিবেশন করিলেন। আহার সমাপনান্তে মিঃ পুনিয়া সম্বুদ্ধচৈতন্যকে জাফ্‌না বৈদ্যেশ্বর বিদ্যালয়ে পৌঁছাইয়া দিলেন।

জাফ্‌নার রাঙ্গামাটিতে সম্বুদ্ধচৈতন্য এই সময় সর্বত্র তামাকের চাষ হইতে দেখিলেন। এইস্থানে নারিকেল বৃক্ষ অপেক্ষা তালবৃক্ষ বেশী জন্মে। ধান্যও বেশ জন্মে। এইস্থানে তালপাতা দিয়া পাখা, সুন্দর সুন্দর ঝুড়ি, ব্যাগ ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। এইগুলি এইস্থানের শিল্প সম্পদ।

অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার পর সম্বুদ্ধচৈতন্য কলমলয়ামে মিঃ কে. নবরত্নমের গৃহে আগমন করেন। মিসেস্ নবরত্নমের সহিত সম্বুদ্ধ-চৈতন্যের পরিচয় হইল। তিনি শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। শান্তি-নিকেতন সম্বন্ধে তাঁহার সহিত সম্বুদ্ধচৈতন্যের অনেক আলাপ হইল। মিসেস্ নবরত্নম্ সেতার বাজাইয়া সম্বুদ্ধচৈতন্যকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একখানি গান,—

"আমার মাথা নত করে
দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।"

গাহিয়া শুনাইলেন। কিছুক্ষণ পরে গৃহস্বামী মিঃ নবরত্নম্ বাড়ী আসিলেন। তাঁহাকে হাতে একখানা নূতন বই, স্বামী অভেদানন্দ রচিত "Divine Heritage of man." বইখানি সেদিনই কলিকাতা রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ হইতে ডাকযোগে আসিয়াছে। মিঃ নবরত্নম্ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের বই পড়িতে ভালবাসেন। তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের

পরম ভক্ত। তাঁহার গৃহে সম্বুদ্ধচৈতন্য অনেক পুস্তকের সংগ্রহ দেখিলেন। ভদ্রলোক খুব পড়াশোনা করেন। তাঁহার বাড়ীখানি দেখিয়া মনে হয়, এক সুরুচিসম্পন্ন শিল্পীর বাড়ী; সর্বত্র সুসজ্জিত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাড়ীতে কয়েকখানি সুন্দর সুন্দর চিত্রও আছে।

সম্বুদ্ধচৈতন্য গৃহস্বামী মিঃ নবরত্নমের সহিত বিবিধ বিষয়ে আলাপ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে তাঁহার গৃহে প্যারিস্ মিউজিয়মের সহকারী কিউরেটার, মিঃ লুইস্ ড্যামণ্ট্ তাঁহার স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া এবং অস্ট্রিয়ার ডক্টর এ. ফিট্জ পি-এইচ. ডি. আগমন করিলেন।

ইহার কিছুক্ষণ পরেই উপস্থিত হইলেন এক প্রেমিক পুরুষ। তিনি এক জার্মান সাধু। তাঁহার বর্তমান নাম স্বামী গৌরীবালা গিরি। তিনি হিমালয়ের কালীমঠে স্বামী গৌরীদাস গিরি মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পূর্বে ছয় বৎসরকাল তিনি একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন।

সম্বুদ্ধচৈতন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করিলেন কেন? এখন কি আপনি মনে শান্তি পেয়েছেন?"

ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে মনে শান্তি পাইনি। আমি হিমালয়ে গুরুদেবের কৃপা লাভ করে সন্ন্যাস লওয়ার পর এখন আমার মন শান্ত ও স্থির হয়েছে, মনে খুব শান্তি পাচ্ছি।"

ডক্টর এ. ফিট্জ সর্বদা পড়াশুনাতেই ব্যস্ত থাকেন। তিনি অবিবাহিত। জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি কলম্বোতেই অতিবাহিত করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি লামা তারানাথ সম্পর্কে একখানি জার্মান্ পুস্তক ইংরাজীতে অনুবাদ করিতেছেন। পুস্তকখানির নাম "Mystic tales of Lama Taranath." মিঃ লুইস্ ড্যামণ্ট্ দক্ষিণ ভারত এবং সিংহলে আসিয়াছেন তামিল

ভাষা সম্পর্কে গবেষণার জন্য। সিংহল হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তিনি একবার কলিকাতা পরিদর্শন করিতেও যাইবেন। ডক্টর এ. ফিট্জ এবং মিঃ ও মিসেস্ লুইস্ ড্যামণ্ট্ প্রভৃতির সহিত সম্বুদ্ধচৈতন্যের আলাপ-পরিচয় হইল। অতঃপর সকলে গৃহ-স্বামী মিঃ নবরত্নমের নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

সম্বুদ্ধচৈতন্য স্বামী গৌরীবালা গিরির সহিত তাঁহার বাসস্থানে গমন করেন। তাঁহার বাসস্থানের সম্মুখের ঘরে ডক্টর এ. ফিটজ্ বাস করেন। ভিতরের ঘরে স্বামিজী নিজে থাকেন। স্বামিজী শক্তির উপাসক। সম্বুদ্ধচৈতন্য তাঁহার টেবিলের উপর তন্ত্রের বিবিধ গ্রন্থ এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের প্রতিকৃতি ও অনেক পুস্তক দেখিলেন। সম্বুদ্ধচৈতন্য স্বামী গৌরীবালা গিরির নিকট চীনদেশীয় তান্ত্রিক যন্ত্রের চিত্রিত ছবিও দেখিলেন।

সন্ধ্যার পর সম্বুদ্ধচৈতন্য কুমার স্বামীর পুত্রের সহিত তাঁহাদের গৃহে আসিলেন। তথায় রাত্রির আহার সম্পন্ন করিয়া তিনি বৈদ্যেশ্বর বিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্য যখন কলম্বো অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একজন আমেরিকান মহিলা আমেরিকা হইতে কয়েক দিনের জন্য কলম্বো বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। ঐ সময় ভারত মহাসাগর তীরে তাঁহার সহিত সম্বুদ্ধচৈতন্যের পরিচয় হয়। তিনি সম্বুদ্ধচৈতন্যের নিকট ধর্মালোচনা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। উক্ত মহিলা সম্বুদ্ধচৈতন্যের নিকট যোগ-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবসর সময়ে দুইজনে একসঙ্গে ভ্রমণ করিয়া ধর্মালোচনা করিতেন।

উক্ত মহিলা যখন কলম্বো ত্যাগ করেন তখন তিনি সম্বুদ্ধ-চৈতন্যের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসিলেন। যথারীতি বিদায় গ্রহণ করিয়া মহিলা আশ্রমের সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন, সম্বুদ্ধচৈতন্য উপরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন।

হঠাৎ কি মনে করিয়া মহিলাটি সম্বুদ্ধচৈতন্যের দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন এবং বেশ কিছুক্ষণ তাঁহার শিশুর ন্যায় স্নিগ্ধ স্মিত মুখখানির দিকে নীরবে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। শেষে তিনি বলিলেন, "Never did I see in my life such a bright and pure smiling face of a child as I see now in you." (আপনার মুখে যে উজ্জ্বল শিশুসুলভ পবিত্র হাসি এখন দেখছি, আমি আমার জীবনে আর কখনও এমনটি দেখিনি)।

কলম্বোতে সম্বুদ্ধচৈতন্যের সহিত এক ইউরোপীয় খ্রীস্টান ভদ্রলোকের আলাপ হইয়াছিল। তিনি প্রতিদিন ভারত মহাসাগরে স্নান করিবার সময় অনেকক্ষণ সাঁতার কাটিতেন। সম্বুদ্ধচৈতন্য একদিন তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে তিনিও তাঁহার সহিত একদিন ভারত মহাসাগরে স্নান করিবেন এবং সাঁতার কাটিবেন। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে কলম্বো পরিত্যাগের পূর্বদিবস সম্বুদ্ধচৈতন্য তাঁহার সহিত স্নান করিলেন এবং সাঁতার কাটিলেন। সাঁতার কাটিবার সময় উভয়ে কবি বায়রণের "The Ocean" কবিতাটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন,—"Roll on, thou deep and dark blue ocean, roll."

১৫

১৯৫১ খ্রীস্টাব্দ।

সম্বুদ্ধচৈতন্য এই বৎসর উত্তর ভারতে হিমালয়ের চারিধাম পরিক্রমা করেন। এই চারিধাম হইতেছে—কেদারনাথ, বদরীনাথ, গঙ্গোত্রী এবং যমুনোত্রী। ইহার পূর্বে সম্বুদ্ধচৈতন্য ভারতবর্ষের চারিধাম,—বদরীনারায়ণ, রামেশ্বর, পুরীধাম এবং দ্বারকাধাম পরিক্রমা করিয়াছেন। ভগবান শঙ্করাচার্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই চারিটি স্থানে চারিটি মঠও—যোশীমঠ, শৃঙ্গেরীমঠ, গোবর্ধন মঠ এবং সারদা মঠ তিনি পরিদর্শন করিয়াছেন।

হিমালয়ের চারিধাম পরিক্রমা করিবার মানসে সম্বুদ্ধচৈতন্য মুসৌরী পাহাড় হইতে যাত্রা করিলেন। এই পরিক্রমায় তিনি হিমালয়ের ক্রোড়ে অবস্থিত যমুনোত্রী, উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী, বৃদ্ধ-কেদার, ত্রিযুগীনারায়ণ, কেদারনাথ, গুপ্তকাশী, উখীমঠ, তুঙ্গনাথ, বদরীনারায়ণ, বসুধারা প্রভৃতি দর্শন করিলেন। এই সকল তীর্থ-স্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

যমুনোত্রী : ভাটমারী চটি হইতে যমুনোত্রী যাইতে হয়। এই পথটি চতুর্দিকে নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ। যমুনোত্রী যমুনা নদীর উৎস স্থান। এখানে প্রচণ্ড শীত। যমুনোত্রীতে একটি তপ্ত কুণ্ড আছে। স্থানটি চতুর্দিকে পর্বত পরিবেষ্টিত। নিকটে কোন লোকালয় নাই। সাধু ও তপস্বী ব্যক্তিগণ এখানে পর্বতগুহায় থাকিয়া তপস্যাদি করেন।

গঙ্গোত্রী ঃ ভাটমারী চটি হইতে অপর একটি পথ গঙ্গোত্রীতে গিয়াছে। গঙ্গানদীর উৎস স্থান গঙ্গোত্রী হইতে কিছুদূরে গঙ্গার উৎপত্তি স্থান গোমুখী অবস্থিত। গোমুখীতে বরফের নদী হইতে সাতটি ধারা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। গঙ্গোত্রীতে আসিয়া এই বরফের নদী গলিতে আরম্ভ করিয়াছে। গঙ্গোত্রীর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। স্থানটির চতুর্দিক তুষারাবৃত পর্বতমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত।

বদরীনাথ ঃ স্থানটির অপর নাম বদরিকাশ্রম। বদরীনাথের পরিবেশ অতি পবিত্র এবং মনোরম। স্থানটির দুই দিকে দুইটি সু-উচ্চ পর্বত আছে। উহাদের একটির নাম "নর" এবং অপরটির নাম "নারায়ণ"। কথিত আছে যে, প্রাচীনকালে নর ও নারায়ণ ঐ দুই পর্বতে অবস্থান করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যেই পর্বতদ্বয়ের ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। বদরীনাথে একটি তপ্তকুণ্ড আছে। ঐ কুণ্ডের জল বারমাসই বেশ গরম থাকে। বদরীনাথ হইতে তিব্বতে যাইবারও একটি পথ আছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী-সন্তান শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ (গঙ্গাধর মহারাজ) ঐ পথেই তিব্বতে গিয়াছিলেন।

বদরীনাথের কিছু উপরে ব্যাসগুহা এবং বসুধারা অবস্থিত। মহামুনি ব্যাসদেব ঐ গুহায় অবস্থান করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন।

বসুধারা একটি জলপ্রপাতের নাম। ঐ জলপ্রপাতের পার্শ্ব দিয়া মানস সরোবরে যাইবার একটি পথ আছে।

যোশীমঠ ঃ ভগবান শঙ্করাচার্য কর্তৃক হিমালয়ের ক্রোড়ে এই মঠটি প্রতিষ্ঠিত। যোশীমঠের অপর নাম জ্যোতির্মঠ। মঠে আচার্য শঙ্করের একটি মূর্তি আছে। প্রচণ্ড শীতের সময় বদরীনাথের মন্দির যখন তুষারাবৃত হইয়া থাকে, তখন এই যোশীমঠেই বদরীনাথের বিগ্রহ বদরীনারায়ণজীর পূজা হইয়া থাকে। বদরীনাথের মোহান্ত

মহারাজও বৎসরের অনেক সময় এই স্থানে বাস করেন। যোশীমঠ হইতে বদরীনাথ প্রায় উনিশ মাইল দূরে অবস্থিত।

যোশীমঠ হইতেও "মানা গিরিবর্ত্ম" (Mana Pass) হইয়া মানস সরোবর এবং তিব্বতে যাইবার একটি পথ আছে। তবে এই পথটি অতীব দুর্গম।

গুপ্তকাশীর কুণ্ড হইতে তিন মাইল চড়াই করিলে একটি উষ্ণ এবং অপর একটি শীতল জলের প্রস্রবণ পাওয়া যায়। ঐ স্থানে তীর্থযাত্রীরা পিণ্ডদানাদি কার্য করিয়া থাকে।

উখীমঠ: গুপ্তকাশী হইতে কিছু দূরে উখীমঠ অবস্থিত। উখীমঠ হইতে একটি পথ চামৌলী বা লালসাঙ্গা গিয়াছে। চামৌলী হইতে ঐ পথ বদরিকাশ্রমের পথের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। উখীমঠের কাছে কয়েকটি অশ্বত্থ গাছও আছে। উখীমঠে ডাকঘর, থানা, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, ধর্মশালা, বাজার ও সদাব্রত আছে। বদরীনাথের পথে উখীমঠ একটি বেশ সমৃদ্ধ ও সুসজ্জিত স্থান।

পুরাণে বর্ণিত বাণরাজার কন্যা উষার নাম অনুসারেই স্থানটির নামকরণ হইয়াছে উখীমঠ। হিন্দী ভাষায় 'ষ' কে 'খ' উচ্চারণ করা হয়। কথিত আছে যে, পৌরাণিক যুগে এই স্থানেই বাণরাজার রাজধানী ছিল। উষা এবং অনিরুদ্ধের প্রণয়কাহিনীর কথা পুরাণে বর্ণিত আছে। মনসামঙ্গলে বর্ণিত হইয়াছে অনিরুদ্ধ এবং উষাই শাপভ্রষ্ট হইয়া লক্ষ্মীন্দর ও বেহুলা হইয়াছিলেন।

উখীমঠ কর্ণপ্রয়াগে অবস্থিত। মহাভারতের দানবীর কর্ণ এই স্থানে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া স্থানটির এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

উখীমঠের মধ্যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ এবং প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে কতকগুলি মন্দির রহিয়াছে। ঐ সকল মন্দিরে উষা, অনিরুদ্ধ, পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী, কুন্তী, পঞ্চমুখ কেদারেশ্বর, ওঙ্কারেশ্বর প্রভৃতির মূর্তি আছে। প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ঐ সকল মূর্তির পূজা হইয়া থাকে।

তুঙ্গনাথ : উখীমঠ হইতে বদরীনাথের পথে মাইল বার দূরে তুঙ্গনাথ পর্বত অবস্থিত। তুঙ্গনাথ পর্বতের গাত্রে স্তরে স্তরে পাইন (Pine) বৃক্ষের অরণ্যগুলি এক অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। তুঙ্গনাথ পর্বতশীর্ষে একটি শিবমন্দির আছে। সেই শিব 'তুঙ্গনাথ' নামে বিখ্যাত। প্রচণ্ড শীতে মন্দিরসহ স্থানটি চতুর্দিকে তুষারাবৃত থাকে। শীত কমিলে পাণ্ডারা বরফ কাটিয়া পুনরায় মন্দির প্রবেশের পথ নির্মাণ করে।

ত্রিযুগীনারায়ণ : কেদারনাথে যাইবার পথে ত্রিযুগীনারায়ণ এবং উত্তরকাশী দুইটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। উত্তরকাশী হইতে ভাটমারী হইয়া গঙ্গোত্রী যাইবার একটি পথ আছে।

কেদারনাথ : কেদারনাথ স্বয়ম্ভু শিব। বৎসরের প্রায় অর্ধেক সময় কেদারনাথের মন্দির সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। শিবদেহ কৃষ্ণ-প্রস্তরের। কেদারনাথের মন্দিরটিও প্রস্তরনির্মিত। প্রায় এক মাইল দূর হইতে এই মন্দিরের চূড়া দেখা যায়। মন্দিরাভ্যন্তরে বিগ্রহটি দেখিয়া মনে হয় যেন একটি পর্বত চূড়াকে পৃথকভাবে কাটিয়া শিবলিঙ্গ নির্মিত হইয়াছে। উহা দীর্ঘতায় ও আয়তনে অতি বৃহৎ।

মন্দিরচত্বরে পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী, কুন্তী ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি আছে। কেদারনাথে একটি সাময়িক ডাকঘরও আছে। মন্দাকিনী নদীর পার্শ্বেই কেদারনাথের মন্দির অবস্থিত।

প্রচণ্ড শীতের জন্য কেদারনাথের মোহান্ত মহারাজ বৎসরের বেশীর ভাগ সময় উখীমঠে অবস্থান করেন। বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে কেদারনাথের মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং কার্তিক মাসে দীপান্বিতার সময় মন্দিরের দ্বার বন্ধ করা হয়। বদরীনারায়ণের মন্দিরও দীপান্বিতা হইতে অক্ষয় তৃতীয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকে।

কেদারনাথ যাইবার পথ দিয়াই নাকি মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব

স্বর্গারোহণ করিতে গিয়াছিলেন। অনেকের মতে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী বদরীনারায়ণের নিকটস্থ বসুধারার পার্শ্ব দিয়া মহাপ্রস্থানের পথে গিয়াছিলেন। সেই দুর্গম পথে গমনকালে প্রথমে দ্রৌপদী এবং পরে যথাক্রমে সহদেব, নকুল, অর্জুন এবং ভীম পথিমধ্যে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। যুধিষ্ঠির কেদারনাথের পশ্চাতে যে তুষারাবৃত পর্বত আছে, তদুপরি আরোহণ করিবার কালে মর্ত্যকায়া ত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। কেদারনাথের পাণ্ডারা ঐ সকল ঘটনার বর্ণনা এবং এই সকল স্থান প্রদর্শন করিয়া যাত্রীদিগকে স্নানপূজা-তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করায়।

হিমালয়ের ক্রোড়ে উক্ত তীর্থস্থানসমূহ দর্শন করিতে পদব্রজে দুইমাস সময়ের প্রয়োজন। সম্বুদ্ধচৈতন্য দেড় মাসে ঐ পথ পরিভ্রমণ করেন। এই পরিক্রমায় প্রথম দিকে যে সকল বৈষ্ণব সাধু সম্বুদ্ধচৈতন্যের সঙ্গী হইয়াছিলেন, তাঁহারা শেষপর্যন্ত অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। বৈষ্ণব সাধুগণ সম্বুদ্ধচৈতন্যের পাহাড় চড়াই-উৎরাই দেখিয়া মন্তব্য করিতেন, "আপ্ বহুত্ তেজসে চলতে হ্যায় ; আপ তেজী সাধু।"

এই হিমালয় ভ্রমণকালে একদিন মধ্যাহ্নে পথশ্রমে ক্লান্ত সম্বুদ্ধ-চৈতন্য এক অশ্বত্থ বৃক্ষতলে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। তাঁহার তখন ভীষণ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। এমন সময় অকস্মাৎ এক পাহাড়ী ভক্ত কোথা হইতে যেন সম্বুদ্ধচৈতন্যের মধ্যাহ্ন-আহারের জন্য অন্ন-ব্যাঞ্জনাদি আনিয়া দিল। সম্বুদ্ধচৈতন্যকে প্রণাম করিয়া সে বলিল, "আপনি সেবা করুন।"

সম্বুদ্ধচৈতন্য একদিন উখীমঠ হইতে কেদারনাথের পথে চলিয়াছেন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছেন যে তিনি আর গুপ্তকাশী দর্শন করিবেন না। তিনি সোজা চলিতেছেন। সহসা বাসুদেব নামক দশ-বার বৎসরের একটি পাহাড়ী বালক সম্বুদ্ধচৈতন্যের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিল।

সম্বুদ্ধচৈতন্য গুপ্তকাশী যাইবেন না শুনিয়া বাসুদেব তাঁহাকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ জেদ করিতে লাগিল। ঐ স্থান হইতে গুপ্তকাশী মাত্র দুই-তিন মাইল দূরে অবস্থিত। বাসুদেব সম্বুদ্ধচৈতন্যের জিনিসপত্র কাড়িয়া লইয়া নিজেই বহন করিতে লাগিল। বাসুদেব সম্বুদ্ধচৈতন্যকে উৎসাহিত করিয়া বলিল, "এতদূর এলেন, আর গুপ্তকাশী দর্শন করলেন না! তা কি হয়? চলুন, ওখানে আমার ভাইয়ের দোকান আছে, আপনার কোনো অসুবিধা হবে না।"

বাসুদেব সম্বুদ্ধচৈতন্যের জিনিসপত্র বহন করিয়া গুপ্তকাশীর দরজায় আনিয়া নামাইল। সম্বুদ্ধচৈতন্য মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া কয়েক মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন, আর সেই অবসরে বাসুদেব কোথায় যেন সরিয়া পড়িল। সম্বুদ্ধচৈতন্য বাসুদেবকে অনেক অন্বেষণ করিলেন, স্থানীয় দোকানগুলিতেও বাসুদেবের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু তাহাকে আর পাওয়া গেল না। সম্বুদ্ধচৈতন্য আরও শুনিলেন যে, গুপ্তকাশীতে বাসুদেব নামে কেহ থাকে না। সম্বুদ্ধচৈতন্য বিস্মিত হইলেন।

পাঠক! তুমিও কি ঘটনাটি পাঠ করিয়া বিস্মিত হও নাই? তোমার শরীরে কি রোমাঞ্চ হয় নাই? কে এই বাসুদেব? ছদ্মবেশে কে আসিয়া পথিমধ্যে সম্বুদ্ধচৈতন্যকে গুপ্তকাশী দর্শনে অনুপ্রাণিত করিল? কেনই বা সে কার্যসিদ্ধি করিয়া জনারণ্যে হারাইয়া গেল? প্রভু! তুমি কি এমন করিয়াই আমাদের সহিত লীলা কর? "তোমারে পাছে সহজে বুঝি, তাই কি এত লীলার ছল?"

একসঙ্গে চারিধাম করিতে গেলে পাহেলি নামে একটি চড়াই পড়ে। পাহেলি চড়াই প্রায় চৌদ্দ মাইল দীর্ঘ। এই চড়াইটি সম্বন্ধে লোকে বলে, "পাহেলি কি চড়াই, কাবুল কি লড়াই!" অর্থাৎ, পাহেলি চড়াই অতিক্রম করা অতীব কষ্টকর। পাহেলি চড়াই উঠিয়া যে চটি পাওয়া যায়, তীর্থযাত্রীর সেই স্থানেই আশ্রয়

লওয়া কর্তব্য। কেননা, ঐ স্থানে অপরাহ্ণের দিকে এমন ঝোড়ো বাতাস উঠে যে উহা মানুষকে উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে।

সম্বুদ্ধচৈতন্য বেলা প্রায় দশটা এগারটার সময় পাহেলি চটিতে আসিয়া পৌঁছাইলেন। তাঁহার আহারাদি শেষ হইতে প্রায় দেড়টা বাজিয়া গেল। অনেক বহুদর্শী পাহাড়ী মানুষ পূর্বেই সম্বুদ্ধচৈতন্যকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছিল,—তিনি যেন কখনও কোন কারণেই অপরাহ্ণের দিকে পাহেলি যাত্রা না কবেন। আহারাদি সমাপনান্তে সম্বুদ্ধচৈতন্যের কুলি, জ্ঞান বলিল, "বেলা যখন আছে তখন চলুন রওনা হই।" সম্বুদ্ধচৈতন্য জ্ঞানের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাঁহারা পাহেলি চটি হইতে রওনা হইলেন।

এক ঘণ্টা পথ চলিবার পর সম্বুদ্ধচৈতন্য দেখিলেন, একস্থানে অদূরে পার্বত্য তৃণভূমিতে অনেক মেষ চরিতেছে এবং তাহাদের রক্ষার্থে চারি-পাঁচটি পাহাড়ী কুকুর রহিয়াছে। এই সকল পাহাড়ী কুকুর ভয়ানক হিংস্র ও পরাক্রমশালী। সম্বুদ্ধচৈতন্য চীৎকাব করিয়া মেষপালককে কুকুর সামলাইতে বলিলেন। মেষপালক কুকুরগুলি সামলাইলে তাঁহারা পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ চলিবার পরেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। হঠাৎ বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এই প্রচণ্ড ঝড়ে কাহারও পক্ষে দাঁড়াইয়া থাকা প্রায় অসাধ্য। সম্বুদ্ধচৈতন্যের মনে হইল, ঝড় যেন তাঁহাকে উড়াইয়া লইয়া যাইবে। তিনি ব্যাকুল চিত্তে শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। পর্বতের উচ্চতা ঐ স্থানে চৌদ্দ হাজার ফুট। কোন বৃক্ষাদি নাই যে জড়াইয়া ধরা যায়। নিকটে কোথাও আশ্রয় নাই। সম্বুদ্ধচৈতন্য কুলি জ্ঞানকে তাহার নির্বুদ্ধিতা ও হঠকারিতার জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন, "কেন এমন অসময়ে তুমি আমাকে নিয়ে এলে?"

দশ বার মিনিট পরে সহসা পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় হইল, মেঘও ধীরে ধীরে অপসৃত হইল। সমগ্র আকাশ আবার

সূর্যালোকে সমুদ্ভাসিত হইল। সম্বুদ্ধচৈতন্য তখন মহিমান্বিত হিমালয়ের যে অপরূপ সৌন্দর্যরাশি দর্শন করিলেন, উহা জীবনে ভুলিবার নহে। দিগন্তপ্রসারিত উত্তুঙ্গ হিমালয়ের সেই দৃশ্য অতীব মনোরম। কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, ত্রিশূল, নন্দাদেবী প্রভৃতি প্রতিটি গিরিশৃঙ্গ তখন তপ্ত কাঞ্চণের বর্ণ ধারণপূর্বক দিগন্তকে সমুদ্ভাসিত করিয়াছে। সম্বুদ্ধচৈতন্য যেন অকস্মাৎ আচম্বিতে দেবতাত্মা হিমালয়কে আবিষ্কার করিলেন। এই দর্শন যেন তাঁহার নিকট হিমালয়ের দেবতা দর্শন। হিমালয়ের এই অপরূপ রূপমাধুর্য দর্শনে আত্মহারা হইয়া তিনি আনন্দে মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। বিস্ময়ে তিনি স্তব্ধ হইয়া গেলেন। সত্য, শিব ও সুন্দরের ধ্যানে তাঁহার মন মগ্ন হইয়া গেল। কুলি জ্ঞানকে তিনি তখন অশেষ প্রকারে বারংবার ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। পাহেলি চটি হইতে অপরাহ্নের দিকে বহির্গত হইয়াছেন বলিয়াই সেদিন হিমালয়ের এই অতুলনীয় অনন্ত সৌন্দর্য-রাশি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। হিমালয়ের ঐ সুমহান সৌন্দর্য পৃথিবীতে আর কোথাও তিনি দেখেন নাই।

তিনি কি যে দর্শন করিলেন, কি যে পাইলেন তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত।

এই হিমালয়ের যে কোন স্থানে মানুষ অবস্থান করিলে তাহার মন স্তব্ধ হইয়া যায়, হৃদয় স্তব্ধ হইয়া যায়, মন-প্রাণ যেন কোন শান্তির সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়ায়। এই জন্যই হিমালয়কে দেবতাত্মা বলা হয়। সমগ্র হিমালয় পর্বত যেন শিবের শরীর। মহাদেব যেন মহাশবাসনে ধ্যান করিতেছেন। তিনি আত্মচিন্তায় মহামগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। ঐ চির তুষারাবৃত মহান শৃঙ্গসমূহ হইতে যে অজস্র হিমধারা নির্গত হইয়াছে, তাহাই হইল মহাদেবের জটা। এই জন্যই শিবের ধ্যানে আছে,—

"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং॥"

১৬

১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে সম্বুদ্ধচৈতন্য পুনবায হিমালয় ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। এইবার তাঁহাব গন্তব্যস্থল হইল গোমুখী। তাঁহার এই গোমুখী ভ্রমণের বৃত্তান্ত তাঁহাবই লিখিত দিনপঞ্জী (Diary) হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"১৮ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবাব ; ১৩৫৯ (১লা জুন, ১৯৫২)।

আজ প্রতঃকাল হইতে আমরা সকলেই ব্যস্ত, শ্রীগোমুখ যাত্রার জন্য আয়োজন করিতেছি। বেলা সাড়ে আট ঘটিকায় চৌকিদার জিৎসিং আসিয়া দর্শন দিল। সঙ্গে দুইদিনেব জন্য আটা গুড় ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী লইলাম। বেলা দশটার সময় সকলে "জয় গঙ্গামায়ি কি জয়" বলিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলাম। ভাগীরথীর সেতু অতিক্রম করিয়া অপর তীরে ভাগীবথীর কূলে কূলে চলিতে লাগিলাম।

আমরা সাতজন, কুলি একজন এবং গাইড্ জিৎসিং,—এই নয় জন চলিতেছি। পরে আমাদের দলে আরও লোক হইল। আমরা তখন বাইশ জন হইলাম। এই দলের অধিকাংশই সাধু, কেবল তিন চাবিজন গৃহীভক্ত ছিলেন। দলে চৌদ্দপনের বৎসরের এক বালক সাধুও ছিল।

দেড় মাইল পথ চলিবার পর একস্থানে একখানি কাঠের উপর উঠিয়া, দুই পার্শ্বে দুই প্রকাণ্ড পাথরের মধ্যস্থ সঙ্কীর্ণ স্থান দিয়া, কোন প্রকারে দেহকে বহির্গত করিয়া চলিতে হইতেছে। আমরা

সকলেই এক সারি হইয়া অতি সন্তর্পণে এই দুর্গম পথে চলিতেছি। গঙ্গোত্রী হইতে চীরবাসা পর্যন্ত পথ বর্ণনাতীত সঙ্কটপূর্ণ। ছয়টি স্থানে পথ অতীব বিপদসঙ্কুল। জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করিয়া এই পথে চলিতে হয়। যে কোন মুহূর্তে জীবনের খেলা শেষ হইয়া যাইতে পারে।

অথচ অভিযাত্রী দলের সকলেই কি এক মহোল্লাসে, মহোৎসাহে পথ চলিতেছে। সকলের উদ্দেশ্য এক, লক্ষ্য এক,—শ্রীগোমুখ দর্শন! জীবনেব বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত দর্শনেব সান্নিধ্যে উপনীত হওয়া! এই দারুণ পথ দিয়া চলিতে চলিতে লক্ষ্য কবিলাম, সকলেরই মুখে হাসি ও আনন্দ, কাহারও মুখে কোন বিষাদের কালিমা ছিল না। কোথাও পাথরের উপর দিয়া লাফাইয়া যাইতে হয়, কোথাও পর্বতগাত্রের সঙ্কীর্ণ পথে পা টিপিয়া টিপিয়া যাইতে হয়, কোথাও পর্বতগাত্র ভাঙ্গিয়া মাটি বা পাথবেব চাঁই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; তাহা লাঠির সাহায্যে ঠুকিয়া ঠুকিয়া দেখিতে হয়, পদক্ষেপে দেহের ভার উহা সহিতে পারিবে কিনা, তারপরে পদক্ষেপ করিতে হয়। প্রতি পদক্ষেপের পূর্বে দেখিতে হয় যে পদক্ষেপ ঠিকমত থাকিবে কিনা! যদি একবার পা পিছলাইয়া যায়! তবে একেবারে ভাগীরথীতে পড়িয়া যে কি অবস্থা হইবে, তাহা ভাবিতেও গা শিহরিয়া উঠে।

কোন কোন স্থানে পথও নাই। গাইড সেখানে আমাদের হাত ধরিয়া সাবধানে সেই পথ উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। পথ এত সঙ্কীর্ণ যে পাশাপাশি দুইজন যাইবার উপায় নাই। কোন কোন স্থানে গাছের শিকড় বা ডালপালা ধরিয়া পাহাড়ের গা বাহিয়া যাইতে হয়। কোথাও পর্বতের গাত্র ধ্বসিয়া পড়িয়া পথ ঢাকিয়া দিয়াছে। সেই ধ্বসের উপর দিয়া সন্তর্পণে যাইতে হয়। কোথাও-বা ভোজবৃক্ষের, কোথাও-বা পাইন বৃক্ষের গভীর অন্ধকার অরণ্যানীর মধ্য দিয়া পথ চলিয়াছে। কোথাও-বা বরফ ভাঙ্গিয়া পথ চলিতে হয়।

গঙ্গোত্রী হইতে চীরবাসা পর্যন্ত পথ নয় মাইল। পথে চড়াই-উৎবাইও আছে। পথে কয়েক স্থানে হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গ হইতে বরফগলা জলধারা প্রচণ্ডবেগে ভাগীরথীতে যাইয়া পতিত হইতেছে। গাইডের নির্দেশে জুতা খুলিয়া সতর্কভাবে এই সকল ধারা পার হইতে হয়। বহুস্থানে ভাগীরথী তুষারাবৃত হইয়া আছে। তাহারই নিম্নে প্রবলবেগে নদী প্রবাহিতা। ঐ সকল স্থান এক একটি তুষারনির্মিত সেতুর রূপধারণ করিয়াছে। পথে তিন চারিবার বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ণ চারি ঘটিকায় আমরা চীরবাসা ধর্মশালায় উপস্থিত হইলাম। এই নয় মাইল পথ চলিতে আমাদের ছয় ঘণ্টা অতিবাহিত হইল।

চীরবাসা ধর্মশালায় আসিয়া দেখিলাম, কয়েকজন নাগা উদাসী সাধু ধুনী জ্বালাইয়া বসিয়া আছেন। আমরা সকলে কোন প্রকারে একটি কক্ষে স্থান করিয়া লইলাম। অপরাহ্ণে দেখিলাম তিনজন মহিলাও আসিয়া ধর্মশালায় আশ্রয় লইয়াছেন। ইহারা সকলে শ্রীগোমুখ দর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে একজন প্রৌঢ়া এবং দুইজন যুবতী। ইহারা জয়পুরের অধিবাসী। ইহাদের সহিত নিজেদেব কোন পুরুষলোক ছিল না। একজন বৃদ্ধ পাহাড়ী গাইডের সহিত ইহারা আসিয়াছেন। এই সকল মহিলার মনোবল এবং সাহস দেখিয়া আমবা সকলেই বিশেষ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছিলাম।

চীরবাসায় ভয়ানক শীত। ঘরের বাহিরে হু হু করিয়া ভীষণ ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। আমাদের মধ্যে যাহাদের শীতবস্ত্র কম ছিল, তাহাবা শীতে রাত্রিতে কষ্ট পাইয়াছিল।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার ; ১৩৫৯ (২রা জুন, ১৯৫২)।

প্রাতে সাড়ে ছয়টায় আমরা চীরবাসা ত্যাগ করিলাম। পথ পূর্ব্ববৎ। বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। অদ্য পথ তিনস্থানে ভীষণ দুর্গম ছিল। চীরবাসা হইতে দেড় মাইল দূরে এক মৌনী সাধু দেখিলাম। শুনিলাম তিনি এক বৎসর যাবৎ এই স্থানে তপস্যা করিতেছেন।

চীরবাসা হইতে কিয়দ্দূরে দক্ষিণদিকে শিবলিঙ্গ শৃঙ্গ দৃষ্ট হয়। ঐ শৃঙ্গে মহেশ্বরের ধ্যানমূর্তি দর্শন হয়। সূর্যোদয়ের সময় শৃঙ্গটি কাঞ্চণবর্ণ ধারণ করে।

গঙ্গোত্রী হইতে শ্রীগোমুখ পর্যন্ত পথের অধিকাংশ স্থানে উপরের দিকে তাকাইলে গা শিহরিয়া উঠে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর, বড় বড় নুড়ি মাটির সহিত কোন প্রকারে লাগিয়া থাকিয়া পর্বতগাত্র হইতে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। যে কোন মুহূর্তে উহারা পর্বত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পথিকের মাথার উপর পড়িতে পারে। আমরা বেলা সাড়ে দশটায় শ্রীগোমুখ উপস্থিত হইলাম।

আকাশ এতক্ষণ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। শ্রীগোমুখে আসিবামাত্র সূর্যদেব আমাদিগকে কৃপা করিলেন। চতুর্দিক সূর্যালোকে সমুদ্ভাসিত হইল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে "জয় গঙ্গামায়ি কি জয়" বলিয়া ধ্বনি দিলাম। সকলের মন আনন্দে পরিপূর্ণ। শ্রীগোমুখের যে স্থান হইতে পবিত্র বারি নির্গত হইতেছে, আমরা উহার সন্নিকটে যাইয়া স্থানটি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলাম। উপরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের চাঁই পড়িয়া রহিয়াছে। কোন কোন স্থান হইতে পাথরের নুড়ি ও মাটি ঝুর ঝুর করিয়া পড়িতেছে।

শ্রীগোমুখের উচ্চতা ১২৭৭০ ফুট। সদানন্দ স্বামী উহার দুই স্থানের ফটো তুলিলেন। কিয়দ্দূরে অন্য একস্থানে ও বরফের নিম্ন হইতে বারিধারা নির্গত হইতেছে। গত বৎসর গঙ্গোত্রী আসিয়াও শ্রীগোমুখ যাত্রার যোগাযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। আমার বহুদিনের আশা এত দিনে পূর্ণ হইল! কয়েক বৎসর পূর্বে আমার একবার ভীষণ অসুখ হয়। তখন আমার এক অপূর্ব দর্শন হইয়াছিল। তদবধি শ্রীগোমুখ আসিবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হইয়াছিল। সেইজন্যই আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, পথে আমার কোন বিপদ-আপদ ঘটিবে না। মা সুরধনীই যেন অহেতুক কৃপা করিয়া তাঁহার সন্তানকে এখানে বাঁধিয়া আনিয়াছেন। আমি

মনের আনন্দে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গামাতার পূজা করিলাম। শ্রীগোমুখে স্নান কবিয়া ঐ প্রচণ্ড শীতের মধ্যে অনাবৃতাবস্থায় নগ্নদেহে প্রায় এক ঘণ্টা কাল ধ্যান-জপ করিলাম। গঙ্গাপূজায় ক্রীম ক্র্যাকাব বিস্কুট, পেয়ারা ও আমের জেলী, খেজুর, আমসত্ব, চিড়া প্রভৃতি ভোগ দিয়াছিলাম। কল্যানীয়া শ্রীমতী বেলা মিত্র স্বহস্তে ঐ আমের জেলী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল।

শ্রীগোমুখেব উপবে উঠিয়া চারিদিন চলিবার পর বদরীনাথে পৌছান যায়। পথ বড়ই দুর্গম। এই পথে কালিন্দী হিমধারা (১৯৫১০ ফুট), সবস্বতী নদী অতিক্রম করিয়া মানা হইয়া বদরীনাথে আসিতে হয়।

শ্রীগোমুখের উপরে হিমধারা (Glacier)। উহাই গঙ্গানদীর উৎপত্তিস্থল। এই হিমধারাকে গঙ্গোত্রী হিমধারা বলে। শ্রীগোমুখ হইতে চৌখাম্বা (পর্বতশৃঙ্গ) পর্যন্ত বিস্তৃত কুড়ি-পঁচিশ মাইল পথে গঙ্গোত্রী হিমধারা, কোথাও সিকি মাইল, আবার কোথাও পাঁচ মাইল বিস্তৃত। এই গঙ্গোত্রী হিমধারার সহিত বিভিন্ন স্থানে মন্থনীধাবা, মৈণ্ডীধারা, সচ্ছন্দ হিমধারা, গহন হিমধারা, কীর্তি হিমধারা, মেরু হিমধারা, ভৃগুপথধারা, রক্তবর্ণ হিমধারা, চতুরঙ্গী হিমধারা, কালিন্দী হিমধারা প্রভৃতি অসংখ্য হিমধারা মিলিত হইয়াছে। ঐ সকল হিমধারার জলের বর্ণ বিভিন্ন; এমন কি লাল বর্ণের জলও আছে। উহারা যে বর্ণের জলই হউক না কেন, গঙ্গোত্রী হিমধারার জলের সহিত মিলন হইলে উহারা নিজ নিজ বর্ণ বিসর্জন করে। গঙ্গা জলের এমনই মহিমা যে ঐ জলের সহিত কোন জল স্বীয় বর্ণের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে না।

চৌখাম্বার চারিটি শৃঙ্গের প্রথমটি ২৩৪২০ ফুট, দ্বিতীয়টি ২৩১৯০ ফুট, তৃতীয়টি ২২৪৪০ ফুট এবং চতুর্থটি ২২৪৮৫ ফুট উচ্চ।

গঙ্গোত্রী হিমধারার তুষার গলিয়া শ্রীগোমুখ দিয়া গঙ্গাবারি-রূপে কোন্ স্মরণাতীত কাল হইতে বিনির্গত হইতেছে।

শ্রীগোমুখ দেখিতে একটি খিলানের (arch) মত। উহা ৪০ বা ৫০ ফুট পরিমিত হইবে,—ভিতরে সুড়ঙ্গ-মহাবর্ত্ম। ঐ পথ দিয়া ভীমবেগে জলধারা নির্গত হইতেছে। শ্রীগোমুখ! কিন্তু উহা গরুর মুখের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট নহে। শ্রীগোমুখের উপরিভাগ বিস্তীর্ণ। তথায় বরফ ও মাটি মিশ্রিত অবস্থায় আছে। উহাই অতি ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া যায় কিংবা গলিত হয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রীগোমুখ এখন সরিয়া গিয়াছে এবং অনাগত ভবিষ্যতে উহা আরও সরিয়া যাইবে। বরফের সহিত মাটি মিশ্রিত রহিয়াছে, উহাই গলিত হইয়া সরিয়া যায়। তবে, উহা গলিতে সময় লাগে। যে জল নির্গত হইতেছে উহা মৃত্তিকামিশ্রিত তুষারগলিত জল। এই মৃত্তিকা থাকাতেই গঙ্গার জলে পলি পড়ে। গঙ্গার জল প্রকৃতপক্ষে ধবল বর্ণ। সেই জন্যই জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য গঙ্গাস্তবে বলিয়াছেন,—

"হরিপাদপদ্ম তরঙ্গিনী গঙ্গে,
হিমবিধুমুক্তা ধবলতরঙ্গে।"

মা গঙ্গা মহারহস্যময়ী। তাঁহার রহস্য বুঝা বড় কঠিন। আমরা সামান্য মানব উহা কি প্রকারে বুঝিব। মহাজ্ঞানী শঙ্করাচার্য পর্যন্ত গঙ্গার মহিমা অবগত হইতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন,—

"ভাগীরথি সুখদায়িনী মাতস্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"স্রোতসামস্মি জাহ্নবী"—নদীসকলের মধ্যে আমি গঙ্গা।

যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—"গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি।"

গঙ্গোত্রী হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে মহাত্মা ফলাহারী গঙ্গাদাস ভাগীরথীতীরে অবস্থান করিতেছেন। তিনি গত বৎসর

স্বীয় অনুভূতি সম্পর্কে আমাকে বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর নিরাকার। তাঁর রূপ নেই। সেই নিবাকার ব্রহ্মই নীরাকারে পতিতপাবনী হয়ে প্রবাহিতা হচ্ছেন। "নীর" অর্থ জল। তাই তিনি জলের রূপ ধারণ করেছেন। সেই নিবাকার ব্রহ্মই জীবকে কলুষ হতে মুক্ত করবাব জন্য এই নীবাকার রূপ ধাবণ করেছেন। এঁকে দর্শন, স্পর্শ, স্নান ও পান করলে জীবের সকল মলিনতা নষ্ট হয়,—সে পবিত্র হয়; জীবন ধন্য হয়। গঙ্গাব দিব্য মহিমা জীবনে উপলব্ধি করেছি বলেই-ত এই নির্জন স্থানে একাকী দারুণ শীত অগ্রাহ্য করে পড়ে রয়েছি।"

রামায়ণে গঙ্গা মাহাত্ম্যে আছে—

"ব্রহ্মহত্যা গোহত্যা প্রভৃতি পাপ করে।
কুশাগ্রে পরশে যদি সব পাপ তরে॥
স্নানান্তে যতেক পুণ্য বলিতে না পারি।"

আদিকবি বাল্মীকিও ভাগীরথীর নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিয়া ছিলেন, "মা, তোমার নিকট আমার এই প্রার্থনা,—তোমার তীরে বাস, তোমার জল পান, তোমার তরঙ্গ নিরীক্ষণ এবং তোমার নাম স্মরণ করে যেন আমার দেহের অবসান হয়।"

আমরা শ্রীগোমুখে প্রায় দুই ঘণ্টা অবস্থান করিয়াছিলাম। শ্রীগোমুখের সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্তব পাঠ করি—

"গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি মুরারিচরণচ্যুতম্।
ত্রিপুরারিশিরশ্চারি পাপহারি পুণাতু মাম্॥
পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি।
শৈলপ্রচারি গিরিরাজ গুহাবিদারি॥
ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহারি।
গাঙ্গ্যং পুনাতু সততং শুভকারি বারি॥
নমো বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনী।
ধর্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি॥

নমঃ সর্বপাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥”

স্তব পাঠ করিয়া জননী পতিতপাবনী গঙ্গাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। আজ মাকে পূজা করিয়া ও শ্রীগোমুখ দর্শন করিয়া হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিলাম এবং আমার জীবন ধন্য হইল।

এই হিমালয় ভারতবর্ষের গৌরব! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পর্বত। পর্বতের মধ্যে হিমালয় রাজা। নগাধিরাজ। লৌকিক দৃষ্টিতে এই হিমাচলই এই পতিতপাবনীর উৎপত্তিস্থল, গঙ্গার জনক। ভগবান বিষ্ণুর চরণ হইতে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে, আবার ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে ধূর্জটীর জটায়, তথা হইতে হিমাদ্রী শিখরে মা গঙ্গাদেবী পতিত হইয়াছেন ও গিরিগাত্র বাহিয়া ধাপে ধাপে অবতরণ করিতেছেন। দিন নাই, রাত্রি নাই, সর্বদা সমভাবে পূত নির্মল বারি নিরন্তর ঝর ঝর করিয়া পড়িতেছে। কোথাও-বা ভীষণ গর্জন করিতে করিতে চলিতেছে, আর ঐ ভীষণ শব্দ হইতে “হর হর” ধ্বনি উত্থিত হইতেছে।

গঙ্গাপ্রপাত দেখিতেও সুন্দর! উচ্চস্থান হইতে যখন প্রপাতে জলরাশি পতিত হয়, তখন অনন্ত ঐ জলরাশিতে ফেনার সৃষ্টি হয়। ঐ ফেনার রং সাদা; হাসির রং-ও সাদা। এই ফেনারাশিই হইল মা গঙ্গার মুখের হাসি। সেই জন্যই হরিদ্বার হইতে গঙ্গোত্রী ও শ্রীগোমুখ পর্যন্ত ভাগীরথীকে দর্শন করিতে পারিলে, তাঁহার সদা চঞ্চল জলধারার নিম্নে অবতরণের নানা ভাবের তরঙ্গের বিচিত্র খেলা দর্শন করিলে নয়ন সার্থক হয়।

এই হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাই গঙ্গা। পবিত্র উত্তরাখণ্ডের সকল নদীই গঙ্গার সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষিনী। মন্দাকিনী, নন্দাদেবী, পিণ্ডর-গঙ্গা ও অন্যান্য বহু নদী অলকানন্দার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই অলকানন্দা আবার দেবপ্রয়াগে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই

সঙ্গম স্থানের দৃশ্য বড়ই মনোরম। এই স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরটি বোধকরি গাড়োয়ালরাজের প্রতিষ্ঠিত। গঙ্গার সহোদরা ভগ্নী যমুনার মিলন হিমালয়ে হয় নাই। প্রয়াগে ত্রিবেণীতে যমুনা তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর সহিত অভিন্ন হইয়া মিলিত হইয়াছেন।

আমরা অপরাহ্ণ চারিটায় চীরবাসায় প্রত্যাবর্তন করি। আসিবার সময় সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। পথিমধ্যে মৌনীবাবার সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনিও শ্রীগোমুখে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। তিনি কৈলাস ও মানস সরোবরও দর্শন করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন স্থানটিতে আপনার মন ভাল লাগে? আপনাব কাছে কোন স্থানটি বেশী সুন্দর মনে হয়?"

তিনি ইঙ্গিতে জানাইলেন, "আমাব এই গোমুখ! মায়ের স্থানই ভাল লাগে। এখানেই মন বসে।"

মৌনীবাবা কি প্রকারে এই জলশূন্য ভীষণ নির্জন স্থানে একাকী বাস করেন, ইহা চিন্তা করিয়া আমবা সকলেই বিস্মিত হইলাম। মৌনীবাবার মুখকান্তি দেখিয়া মনে হইল, তিনি বেশ আনন্দে আছেন।

এই স্থানে ভালুক বাস করে। আমরা স্থানে স্থানে ভালুকের বিষ্ঠা দেখিয়াছিলাম। সেদিন জয়পুববাসিনী মহিলাগণও এই পথে দুইটি শ্বেত ভল্লুক দেখিয়াছিল।

চীরবাসা ধর্মশালায় আসিয়া আমাদের কাহারও জ্বর, কাহারও শরীর ব্যথা হইয়াছে, কেহ-বা পায়ে আঘাত পাইয়াছে। আমি সকলকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিলাম।

২০শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার; ১৩৫৯ (৩রা জুন, ১৯৫২)।

প্রাতঃকালে ছয়টা বাজিবার পূর্বেই আমরা চীরবাসা ধর্মশালা হইতে গঙ্গোত্রী যাত্রা সুরু করিলাম। আজ দশহরা! গঙ্গাপূজার পুণ্য দিন। সকাল বেলা হইতেই আমরা ভাগীরথীকে দর্শন করিতে

করিতে পথ চলিতেছি। এইবার আমরা অধিকাংশ পথই ভাগীরথীর তীর ধরিয়া হাঁটিতেছি। পথের দুই স্থানে গাছে অনিন্দ্যসুন্দর পুষ্প প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। তাহা দেখিতে পাইয়া আমি উহা মুঠা মুঠা চয়ন করি এবং সেই পুষ্পে মা গঙ্গাকে অঞ্জলি প্রদান করি।

পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা একস্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। ঐস্থানে আমরা রুটি ও গুড় ভোজন করিয়া কূর্মদেবতার পূজা সমাপন করিলাম। তারপর আমরা পুনরায় হাঁটিতে লাগিলাম। গঙ্গোত্রী হইতে তিন মাইল দূরে এক স্থানে দেখিলাম, ভাগীরথীর উপর বরফ জমিয়া একটি সেতুর মত হইয়াছে। উহার নিম্ন দিয়া প্রবল বেগে ভাগীরথী প্রবাহিতা। গাইড্ জেৎসিং সর্বাগ্রে অতি সন্তর্পণে সেতু পার হইয়া দেখিল যে উহাতে সকলের ভার সহিবে কিনা! অতঃপর কুলি, বাসুদেবকে পার করিয়া আমাদিগকে সে একে একে সেতু অতিক্রম করিতে বলিল। জেৎসিং আমাদিগকে আরও সাবধান করিয়া দিল, আমরা যেন বরফে আমাদের হস্তস্থিত লাঠি (উহার নীচে লোহা আছে) দিয়া খোঁচা না মারি।

আমরা সতর্কতার সহিত একে একে সেতুটি অতিক্রম করিলাম। এপার আসিয়া আমরা যখন পশ্চাদ্দিকে অপর পারে তাকাইলাম, তখন সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।—কি ভীষণ ভয়ঙ্কর পথই না আমরা অতিক্রম করিয়া আসিলাম! অথচ আশ্চর্য এই যে ঐ পথে চলিবার কালে উহাকে এইরূপ দুর্গম মনে হয় নাই।

এই স্থান হইতে কখনও ভাল পথ দিয়া, কখনও পাথরের উপর দিয়া, আবার কখনও সঙ্কীর্ণ পথে চড়াই-উৎরাই করিয়া আমরা দুই মাইল দূরে মহাত্মা ফলাহারী গঙ্গাদাসের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "আজ আমার মহাভাগ্য! আপনাদের দর্শন পেলাম। আজ দশহরা!

আমি ত এই স্থান ছেড়ে কোথাও যাই না। সাধু-মহাত্মা, গৃহস্থ ভক্তেরা কৃপা করে এখানে আসেন, তাই তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।"

আমরা সকলে তাঁহার ইষ্টদেবতা শ্রীরামচন্দ্রজীর আরতি দর্শন এবং তাঁহার সহিত পতিতপাবন রামনাম কীর্তন করিতে করিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম।

অতঃপর তিনি স্তবপাঠ করিয়া জয়ধ্বনি দিলেন। তিনি আমাদের সকলকে চরণামৃত ও প্রসাদ বিতরণ করিলেন। এই স্থানে আমরা আধঘণ্টা অতিবাহিত করি। অতঃপর আমরা অল্প চড়াই করিয়া, এক মাইল হাঁটিয়া বেলা এগারটায় গঙ্গোত্রীধামে উপনীত হই।

আজ গঙ্গাপূজার দিন গঙ্গোত্রীতে পাণ্ডাদেব ও তাহাদের পরিবারবর্গের এবং তীর্থযাত্রীদেব অত্যন্ত ভিড়। আমি এবং রমেশদা মন্দিরাভ্যন্তবে যাইয়া মা গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করিলাম।

ধর্মশালায় আসিয়া সামান্য বিশ্রামান্তে সকলে একে একে গঙ্গাস্নানে গেলাম। আজ আমি ভাগীরথীতে ডুব দিয়াই স্নান করিলাম। আজ গঙ্গাপূজার পুণ্য দিনে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিয়া ধ্যান ও প্রার্থনাদি করিলাম। আমাব বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল, দশহরার দিন গঙ্গোত্রীতে অতিবাহিত কবি। শ্রীশ্রীঠাকুর আমার সেই আকাঙ্ক্ষা এতদিনে পূর্ণ করিলেন। অদ্যকার দিনের স্মৃতি আমার জীবনে চিবস্মবণীয় হইয়া থাকিবে।

অদ্য গঙ্গোত্রীতে উৎসব চলিতেছে। শ্রীশ্রীগঙ্গা দেবীর মন্দিরের সম্মুখে পাণ্ডারা এবং ভক্তগণ নানাপ্রকার নৃত্য করিল। সন্ধ্যাকালে দেবীর আরতি হইল। আরতিতেও খুব জনসমাগম হইয়াছিল।

রাত্রিতে আমি ও সদানন্দ মহারাজ দোকানে যাইয়া পান ও লাড্ডু আহার করি। আমিও সদানন্দজী ভাগীরথী তীরে জ্যোৎস্নালোকে কিছুক্ষণ পায়চারি করিলাম। ভাগীরথী তীব্র গতিতে ভীষণ গর্জন করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে। কি সেই শব্দ!

সেই শব্দ হইতে এক মহাধ্বনি উত্থিত হইতেছে। সেই মহাধ্বনিতে মন নিমগ্ন করিয়া আমি সত্য-শিব-সুন্দরের ধ্যান করিতে লাগিলাম।

আজ ক্ষণে ক্ষণে গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কথা মনে হইতেছিল। তিনি বলিতেন,—"ঐ গোমুখী, গঙ্গোত্রী, হৃষিকেশ ও স্বর্গাশ্রমে তপস্যা করতাম, আর অঞ্জলি ভরে ভরে গঙ্গাজল পান করতাম। আহা! কি সেই সব দিন ছিল! আর মা গঙ্গার স্তব পাঠ করতাম। আমি এক উদাসী নানকপন্থী সাধুর সঙ্গে গোমুখ দর্শন করেছিলাম। বরফের নদী হতে সাতটি ধারা মিলিত হয়ে যে গঙ্গার উৎপত্তিস্থান, তা' দর্শন করেছিলাম।"

২১শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার; ১৩৫৯ (৪ঠা জুন, ১৯৫২)।

বেলা দশঘটিকার সময় সদানন্দজী, রমেশদা, ঋতুভাই ও আমি কালীকম্বলী ও পাঞ্জাবী ছত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করি। গত বৎসর যে কয়দিন গঙ্গোত্রীতে ছিলাম, ছত্রে সাধুদের সঙ্গে পঙ্গতে বসিয়া আহার করিতাম। গঙ্গোত্রীতে অন্য কোন ঝরণার জল নাই, এখানে একমাত্র পানীয় জল হইতেছে গঙ্গাবারি।

অপরাহ্নে আমরা সকলে ভাগীরথীর সেতু পার হইয়া গৌরীকুণ্ড দর্শন করিতে গেলাম। গৌরীকুণ্ডে ভাগীরথীর ধারা এক শিবলিঙ্গের উপর পতিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। দুই তীরেই পাথরের পাহাড় খুব উচ্চ। একস্থানে ভীমবেগে জলধারা এত নিম্নে পড়িতেছে যে ঐ স্থানে কুয়াশার জাল সৃষ্টি করিতেছে এবং তদুপরি সূর্যরশ্মি পতিত হওয়ায় রামধনুর সৃষ্টি হইয়াছে।

গৌরীকুণ্ডের পাথরের রং অতি মনোহর। পর্বতগাত্রে পাথরের খাদে খাদে জলধারা পতিত হওয়ায় পাথরগুলি নানা আকৃতি লাভ করিয়াছে। এইস্থানে গঙ্গাপ্রপাতের বিন্দু বিন্দু জলকণা বাতাসে মিশিয়া চারিদিকে কেমন একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে।

গৌরীকুণ্ড অতি মনোরম স্থান। এতদঞ্চলে কুত্রাপি এইরূপ স্থান দৃষ্ট হয় না। গৌরীকুণ্ডের ধারে ধারে অনেক গুহা আছে।

সাধু মহাত্মারা সেখানে থাকিয়া তপস্যা করেন। শ্রীমৎ রামানন্দ অবধূত নামক জনৈক তাপস এই স্থানে প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও নগ্নদেহে অনাবৃতাবস্থায় বাস করেন। তিনি পনের বৎসর গঙ্গায় কোমর-জলে দাঁড়াইয়া এবং সতের বৎসর সূর্যের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তপস্যা করিয়াছেন।

মহাত্মা রামানন্দ অবধূতজী গৌরীকুণ্ডে তিনবার মা গঙ্গার দর্শন লাভ করেন। মা গঙ্গা ষোড়শীরূপে শ্বেত ও গৈরিক বর্ণের শাড়ি পরিহিতা,—আলুলায়িত কেশে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন।

অবধূতজীকে সকলে প্রণাম করিয়া মহাত্মা তপোবনজীর নিকট গমন করিল। আমি এখন তাঁহাকে একা পাইয়া তাঁহার হাত দুইখানি ধরিয়া তাঁহার শ্রীহস্তের কর-রেখা দেখিলাম। তিনি কোন আপত্তি করিলেন না,—শিশুর ন্যায় হাত দেখাইলেন! আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীরাম, শ্রীশঙ্কর—কা'র মূর্তি ধ্যান এবং কা'র নাম জপ করেন?"

প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন, "সবই এক! এক হ্যায়।"

অতঃপর সশ্রদ্ধচিত্তে আমি তাঁহাকে "ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ" মন্ত্রে প্রণাম করিয়া তপোবনজীর নিকট চলিয়া আসি।

শ্রীমৎ স্বামী তপোবনজী আমাদের সহিত হিমালয়ের নানা প্রসঙ্গ এবং অদ্বৈত বেদান্তের বিষয় লইয়া আলোচনা করিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আমরা সকলে বিদায় লইয়া প্রজ্ঞানাথজী ও ভবানী ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধর্মশালায় প্রত্যাবর্তন করি।

গঙ্গোত্রীতে রঘুনাথ দাস নামে অপর একজন নাঙ্গা বৈষ্ণব সাধু আছেন। তিনি মহাত্যাগী। গত বৎসর তিনি ভাণ্ডারা দিয়া স্থানীয় সকল সাধু, মহাত্মা এবং ভক্তদের সেবা করিয়াছিলেন। ঐ ভাণ্ডারায় আমি স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী অভেদানন্দের আমেরিকা ও ইউরোপে বেদান্ত-প্রচার সম্বন্ধে হিন্দীতে এক ভাষণ

দিলাম। উক্ত ভাষণ শ্রবণে সমবেত সাধু মহাত্মারা বলিয়াছিলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ মহারাজদ্বয় আমাদের হিন্দুস্থানের গৌরব।"

ঋতু ভাইয়ের দুই ধাম ও শ্রীগোমুখ দর্শন হইল বলিয়া তিনি ভাণ্ডারা দিলেন। রাত্রিতে তিনি আমাদিগকে আটার হালুয়া, আলুর দম ও আটায় বেশী পরিমাণ ঘৃত দিয়া রুটি তৈয়ার করিয়া খাওয়াইলেন। ঋতুভাই সাধুদের ভোজন দক্ষিণাও দিয়াছিলেন। সকলে সেই দক্ষিণা গ্রহণ করেন নাই।

গঙ্গোত্রীর বর্তমান মন্দিবটি জয়পুরের মহারাজা নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। মন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবী, যমুনাদেবী, রাজা ভগীরথ, মহালক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা, মহাসরস্বতী এবং ভগবান শঙ্করাচার্যের মূর্তি আছে। মন্দিরে নিত্যপূজা, ভোগ ও আরতি হয়। শিবজী এবং গণেশজীর ছোট মন্দিরও আছে।

২২শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবাব ; ১৩৫৯ (৫ই জুন, ১৯৫২)।

অদ্য প্রাতঃকালে আমাদের দলের সকলে গঙ্গোত্রীধাম ত্যাগ করিলেন। আমি তাঁহাদের সহিত গেলাম না। আমি প্রাতঃকালে ভাগীরথীতে স্নান করিলাম। তীবে বসিয়া জপ-ধ্যান ও প্রার্থনা করিলাম। অবশেষে আমি ভগবান শঙ্করাচার্য ও মহর্ষি বাল্মীকি লিখিত গঙ্গাস্তব, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের স্তব, জগন্মাতা শ্রীশ্রীসারাদাদেবীর স্তব, শ্রীগুরুস্তোত্র, ভগবান শঙ্করাচার্যের স্তব প্রভৃতি পাঠ করিলাম। অতঃপর আমি মন্দিরে যাইয়া শ্রীশ্রীগঙ্গা-মাতার আরতি দর্শন এবং চরণামৃত পান করি। অতঃপর যে দেবী আমাকে আকর্ষণ করিয়া এই তীর্থে আনয়ন করিয়াছেন, সেই পতিতপাবনী শ্রীশ্রীগঙ্গা মাতাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া গঙ্গাস্তব পাঠ করিতে করিতে গঙ্গোত্রী ত্যাগ করিলাম।

"ওঁ নমো বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনী।
ধর্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবী॥

নমঃ সর্বপাতক সংহন্ত্রী সত্যোত্থঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥”
ওঁ গঙ্গানারায়ণ হরি।
ওঁ তৎ সৎ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।”

আলোচ্য বৎসরের গঙ্গোত্রী ও গোমুখী দর্শন সম্বুদ্ধচৈতন্যের সাধক জীবনে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এই বৎসরই তিনি গোমুখীতে ভাগীরথীর পুণ্য সলিলে স্বীয় শিখাসূত্র বিসর্জনপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। প্রায় পনের বৎসর পূর্বে সম্বুদ্ধচৈতন্যকে সন্ন্যাস-প্রদান সম্পর্কে তদীয় শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজী মন্তব্য করিয়াছিলেন, “তা তোরও (সম্বুদ্ধচৈতন্য) এক রকম সব হয়ে গেল।...এখন নামটা শুধু বাকি রইল।” এইরূপ বলিয়া স্বামিজী মহারাজ সম্বুদ্ধচৈতন্যকে স্বহস্তে গেরুয়া বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। গেরুয়া বস্ত্র সন্ন্যাসের প্রতীক।

এইবার গোমুখীতে সম্বুদ্ধচৈতন্য তাঁহার ইষ্টদেবতা ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে এবং শ্রীগুরুদেব স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর চরণ স্মরণপূর্বক শিখাসূত্র বিসর্জন করিয়া সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাস আশ্রমে তিনি “স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ পুরী” নাম গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের সন্ন্যাস-গ্রহণ এবং স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের সন্ন্যাস-গ্রহণের মধ্যে একটি অত্যাশ্চর্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বহস্তে তাহার সেবক-শিষ্য কালীপ্রসাদকে গেরুয়া বস্ত্র প্রদান করিয়া সন্ন্যাস আশ্রমের অধিকারী করিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পরে বরাহনগর মঠে অবস্থানকালে তিনি বিরাজাহোম করিয়া সন্ন্যাস আশ্রমের নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দও স্বহস্তে স্বীয় সেবক-শিষ্য রবিকে গেরুয়া বস্ত্র প্রদান করিয়া সন্ন্যাস আশ্রমের অধিকারী করিয়া গিয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দের মহাসমাধির পরে গোমুখীতে শিখাসূত্র বিসর্জন-পূর্বক তিনি সন্ন্যাস আশ্রমের নাম গ্রহণ করিলেন।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের আলোচ্য হিমালয় ভ্রমণকালে তিনি উত্তর কাশীও গমন করিয়াছিলেন। তথায় বিভিন্ন সাধু-মহাত্মার সহিত তাঁহার যে সকল আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল, তদ্‌সম্পর্কে কিছু না বলিলে এই ভ্রমণকাহিনী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সুতরাং এখানে তদ্‌সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা হইতেছে।

২২শে মে, ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দ।

এই দিবস স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ উত্তরকাশীর দেবগিরি মহাত্মার আশ্রমে অবস্থান করিয়াছিলেন। তথায় তখন হৃষিকেশের স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ভারতী মহারাজও ছিলেন। তাঁহার সহিত স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের গভীর রাত্রি পর্যন্ত ধর্মালোচনা হইয়াছিল। এই আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "হৃষিকেশ-কৈলাসে বোধ করি, ১৯৪৭ বা ৪৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে আমি শ্রীমৎ শঙ্করচৈতন্য ভারতীকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'স্বামিজী, জ্ঞানীকে লিয়ে তিতিক্ষা কব্ তক্, করণে চাহিয়ে?'—এর উত্তরে তিনি সৌম্যভাবে বলেছিলেন, 'যো কার্য এক যুবতীছে লেয়া যা শক্ত্যা হ্যায়, ওয়া কার্য এক বৃদ্ধাছে ভি হো শক্ত্যে হ্যায়! ফির্ ভি মনুষ্যকো যুবতী কী তরফ আকর্ষণ স্বাভাবিক হ্যায়। ওয়েছ্যা হি জ্ঞানীকে ভি ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বাভাবিক হ্যায়।"

উত্তরকাশীর মহাত্মা দেবগিরিজী বিভিন্ন ব্যক্তিকে ধর্মোপদেশ সম্পর্কে যাহা বলিতেন তন্মধ্যে নিম্নোক্ত উপদেশটি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের খুব প্রিয়।

"খাড়া হয়ে নাচ দেখবে, দরকার হলে হাততালি দিবে, কিন্তু

সঙ্গে সঙ্গে নাচবে না।...চোরের মত মন হওয়া দরকার ; যেমন চোর সৎসঙ্গে বসেও সব সময়ে মনে চিন্তা করে সন্ধ্যার পর কোন বাড়ী চুরি করতে হবে, তার অভিসন্ধি করে ; ঠিক সে রকম, সব কিছু শোনো, সব কিছু গ্যাখো, কিন্তু মন সব সময় যেন তৎ (ব্রহ্ম) চিন্তায় মগ্ন থাকে।”

দেবগিরিজীর জীবনের অপর একটি ঘটনাও স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ শুনিলেন। দেহত্যাগের পূর্বদিন রাত্রে দেবগিবিজী সুরেশ্বরা-নন্দজীকে বলিলেন, “উপেক্ষা” ; তাবপর বলিলেন, “দয়া” ; ইহাব পব বলিলেন, “শিব খাড়া রাখ্না,—মাঙ্গনা নেই, উপদ্ঘাত করনা মাৎ।”

—কেবল ক্ষুন্নিবৃত্তি ভিন্ন কাহাবও কাছে কোন বিষয়ে যাচ্ঞা করা ছিল দেবগিরিজীব সাধুবৃত্তিব বিরুদ্ধ! “কারো কাছে মাথা নত করবি না”,—এই ছিল তাঁহার একটি প্রধান উপদেশ।

দেবগিরিজী দেহত্যাগের আধঘণ্টা পূর্বে সুবেশ্বরানন্দজীকে প্রথমে বলিলেন,—“সত্যম্”, পরে বলিলেন,—“ক্ষমা”।

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দেব ১০ই অক্টোবর বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের সময় দেবগিরিজী “মা”, “মা” বলিয়া দেহত্যাগ করিলেন।—তাঁহার মহাপ্রাণ চিদাকাশে মিশিয়া গেল।

নিত্যানন্দজীকে তিনি শিবপূজা করিতে বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন,—“তোমার শিবপূজা দ্বারাই পরম জ্ঞান লাভ হবে।”

দেবগিরিজী সাধু-গৃহস্থ নির্বিশেষে আগন্তুকমাত্রকেই “জয় ভগবানজী, জয় ভগবানজী, জয় ভগবানজী, জয় নারায়ণজী” বলিয়া সম্বোধন ও অভ্যর্থনা করিতেন। তিনি সাধুসেবা করিতে ভালবাসিতেন। তিনি নিজে রন্ধন করিয়া সাধু-মহাত্মাদিগকে সেবা করিতেন।

তাঁহার অদ্ভুত ভগবদ্ বিশ্বাস ছিল। রাস্তায় পতিত পীড়িত বুভুক্ষুদিগকে তিনি স্বীয় ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া সেবা করিতেন।

৯ই জুন, ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দ।

এই দিবস স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ উত্তরকাশীতে কৈলাসের মণ্ডলীশ্বর শ্রীমৎ স্বামী বিষ্ণুদেবানন্দ মহারাজজীর সহিত ধর্মালোচনা করিয়াছিলেন। আলোচনাপ্রসঙ্গে শ্রীমৎ স্বামী বিষ্ণুদেবানন্দজী স্বামী সম্বুদ্ধানন্দকে বলিয়াছিলেন, "আপনারা নিজের হৃদয়ে মহান তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করুন। সেই উচ্চ আদর্শে জীবনকে গঠিত করুন। দুর্লভ মনুষ্যজীবন! কত লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর এই মানবশরীর! এই মানব-শরীরে পরমেশ্বরকে লাভ করতে হবে। জীবনের এই মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্যবহারিক জীবনের কার্য গৌণ; একমাত্র মনুষ্যের মস্তিষ্ক সদসৎ বিচার করতে পারে। এমন কাজ করতে হবে, যাতে এই মানবাত্মা সত্য বস্তু লাভ করতে পারে। যদি মনুষ্য এই জীবনের সদ্ব্যবহার না করতে পারে, তবে সে নীচ যোনি প্রাপ্ত হবে। নীচ যোনিতে জন্ম হ'লে পুনরায় উচ্চ যোনি প্রাপ্ত হওয়া কঠিন,—বহুকাল সাপেক্ষ। জীবের নীচ যোনিতে জন্ম হ'লে সেই যোনিতেই সে অবস্থান করতে চায়, —সে মনে করে, 'আমি বেশ আছি।' চরিত্রকে উজ্জ্বল কর, নির্মল কর। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত!

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে কত কঠিন তপস্যা করতে হত। এই কলিযুগে কেউ যদি একদিন-একরাত্রি একমনে, এক প্রাণে পরমেশ্বরের আরাধনা করে তবে সে নিশ্চয় পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়।

পরমেশ্বরের যে কোন পবিত্র নাম—কি রামনাম, কি কৃষ্ণনাম, কি শঙ্করের নাম—একমনে নিষ্ঠার সঙ্গে জপ করতে হবে। এই জপের দ্বারাই মন স্থির হবে। নিরন্তর তাঁর নাম করতে হবে। তা'হলে চিত্তের মলিনতা দূর হয়ে যাবে। নাম ও নামী এক, অভেদ। মন স্থির করতে গেলে মনে নানারকমের ভাব উপস্থিত হয়। সেই নানারকম ভাবকে, জঞ্জালকে দূর করতে হবে নিত্য

পরমেশ্বরের নাম-করা অভ্যাসের দ্বারা। নিত্য নিষ্ঠার সঙ্গে সময় ঠিক করে নাম জপ করতে হবে। কিছুদিন এই ভাবে জপ কবলে নিজেই বুঝতে পারবে—মনে কি অপার আনন্দ উপলব্ধি হয়। একবার মনে আনন্দের আস্বাদ পেলে নিজেই বুঝতে পারবে, ঈশ্বরের নামে কি মহিমা আছে! তখন জীব তাঁর নাম করতে কবতে এগিয়ে যায়,—পরিশেষে পরমেশ্বরকে লাভ করা যায়। মানবজীবন তখনই ধন্য হবে,—যখন ঈশ্বর বা পরমাত্মাকে লাভ হবে।"

শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজের দিনপঞ্জী (ডায়েরী) হইতে নিম্নোক্ত অংশটি উৎকলিত হইল।—

"সাধু অত্রিমুনিব সহিত এইবার (১৯১২ খ্রীস্টাব্দ) উত্তর-কাশীতে আমার দুই তিনবাব সাক্ষাৎ হয়। গত বৎসর একদিন প্রাতঃকালে গৌরীকুণ্ডে তাঁহার গুহার নিকট বসিয়া তিনি অদ্বৈত বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রথমে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ও স্বামী রামতীর্থের জীবনালোকে বেদান্তের অনুভূতি সম্বন্ধে বলিলেন। "পাঁজিতে আছে বিশ আড়া জল হইবে, কিন্তু পাঁজি নিংড়াইলে এক ফোঁটাও জল পড়ে না।"—শ্রীশ্রীঠাকুরের এই উপদেশ উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন,—"শুধু শাস্ত্র এবং পুস্তক পড়লে কি হবে?—জীবনে যদি অনুভূতি না হয়,—আত্ম-সাক্ষাৎকার না হয়! আত্মাকে উপলব্ধি করাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য! 'আমি মণ্ডলীশ্বর বিদ্বান সাধু!' এই অভিমান যার আছে,—সে এখনও সাধুই হতে পারে নি। মহাত্মা সাধু যে হবে, তার কোন জাতি-পাতি থাকবে না, পাণ্ডিত্যাভিমান থাকবে না। আমি মূর্খ, আমি বিদ্বান, আমি পুরুষ, কি আমি স্ত্রী, কি আমি গুরু, না কারো শিষ্য, না আমার শৌচ আছে, না আমার অশৌচ আছে, না হোম করি, যজ্ঞ করি, কি দেবপূজা করি, না আমি পঞ্চভূত, না দশেন্দ্রিয়, না আমার পাপ আছে, না পুণ্য আছে,

না আমার বন্ধন আছে! আমার কোন বন্ধন নাই ও অহঙ্কারও নাই! আমি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,—তিন গুণের অতীত! নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত-স্বভাব আত্মা! আত্মা পূর্ণ, অখণ্ড, সত্যস্বরূপ, মহান, অবিনাশী।—এই জ্ঞান লাভ করতে হ'লে কোন পুস্তক বা শাস্ত্র পড়বার প্রয়োজন হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কি কোন পুস্তক পড়েছিলেন? তপস্যার দ্বারাই বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। ভারতের ঋষিরা কেবল তপস্যার দ্বারা এই সত্য,—আত্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন।"

১৭

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ২বা নভেম্বব শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজার পুণ্য তিথিতে ভাগলপুব শহবে বেলা ১২টাব সময়ে মাতুলালয়ে বেলার জন্ম হয়। বেলা নেতাজীব অগ্রজ শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বসুর প্রথমা কন্যা। পিতামহ জানকীনাথ বসুব কটকেব বাড়ীতেই বেলার শৈশব জীবন অতিবাহিত হয়।

কটকেব ইংবাজ পরিচালিত স্টুয়ার্ট স্কুলে বেলার শিক্ষাবম্ভ হয়। ছাত্রী হিসাবে বেলা বিশেষ মেধাবী ছিলেন। বিদ্যালয়ে বহু ইংবাজ ছাত্র-ছাত্রী থাকা সত্বেও বেলাই ইংবাজী ভাষা পরীক্ষায় প্রতিবাব প্রথম স্থান অধিকাব কবিতেন।

শৈশব হইতেই সঙ্গীত শিক্ষায় তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। পববর্তীকালে তিনি ভজন ও কীর্তন গানে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠ অতি মিষ্ট ছিল। নৃত্যকলাতেও তিনি বিশেষ পটু ছিলেন।

ইংরাজী স্কুলের ছাত্রী হইলেও নিজেদের পারিবারিক ধর্মে বেলার বিশেষ অনুরাগ ছিল। পিতামহীর নিত্যপূজার পুষ্পচয়ন ছিল তাঁহার নিত্যকর্ম। শৈশবে বিদ্যালয়ে যীশু খ্রীস্টের জীবনী ও বাইবেল পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাড়ীতে সীতা-সাবিত্রীর ব্রতও উদ্‌যাপন করিয়াছেন। ঋষিতুল্য পিতামহ জানকীনাথের বৈরাগ্যময় জীবনাদর্শ এবং পিতামহী প্রভাবতী দেবীর প্রগাঢ় ধর্মবিশ্বাস বালিকা বেলার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী যখন কটকে জানকীনাথের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন, তখন পঞ্চম বর্ষীয়া শিশু বেলাই পরিবারের পক্ষ হইতে মহাত্মাজীকে মাল্যভূষিত করিয়াছিলেন। মহাত্মাজী তখন পরিহাসপূর্বক সহাস্যে বলিয়াছিলেন, "জানকীবাবু, আপনার নাত্‌নীর সঙ্গে আমার শাদি (বিবাহ) হয়ে গেল।" বুদ্ধিদীপ্ত শিশু বেলা তখন হইতেই মহাত্মা গান্ধীর সস্নেহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার অপরিসীম স্নেহেব পাত্রী হইয়াছিলেন। মহাত্মাজীর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁহার সহিত বেলার একটি প্রীতিমধুব সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের ১লা জুলাই সতের বৎসর বয়সে শ্রীযুত হরিদাস মিত্রেব সহিত বেলার বিবাহ হয়। হরিদাস হইতেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু, যশোহরের কংগ্রেস নেতা ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইন ব্যবসায়ী স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌-এল্‌-সি মহোদয়ের একমাত্র পুত্র। এই বিবাহের মাত্র কয়েক দিন পূর্বে এক সাজ্ঘাতিক রেল দুর্ঘটনা হইতে হরিদাস দৈবক্রমে রক্ষা পাইয়াছিলেন। সেইজন্য হরিদাসের মাতা বধূবরণের সময় বেলার নামকরণ করিয়াছিলেন "সাবিত্রী"। শ্বশুরালয়ে বেলা এই নামেই পরিচিতা ছিলেন।

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে যশোহর জিলায় এক প্রবল বন্যা হয়। নববধূ বেলা তখন সমগ্র জিলা জুড়িয়া মহিলা সমিতি গঠন করিয়া বন্যা পীড়িতগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী যখন কলিকাতায় আসিয়া বসু পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহিত বেলার পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়। বেলার ভজনসঙ্গীত মহাত্মাজীর বিশেষ প্রিয় ছিল। প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে সাড়ে তিনটা চারিটার সময় বেলাকে মহাত্মাজীর প্রার্থনা-সভায় প্রার্থনা-শেষে ভজন গান গাহিতে হইত। পরিবারের এই মহান অতিথির সেবার প্রতিও

বেলার যথেষ্ট লক্ষ্য ছিল। সেবাপরায়ণতার গুণটি বেলা বিশেষ করিয়া তাঁহার পিতামহীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পিতামহ জানকীনাথ বসুর অন্তিম রোগশয্যাপার্শ্বে কিশোরী বেলাকে সর্বক্ষণই প্রশংসনীয় সেবা-শুশ্রূষায় মগ্ন থাকিতে দেখা যাইত।

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু রামগড়ে আপোষ বিরোধী এক মহাসম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই মহা-সম্মেলনে বিংশতি বর্ষীয়া বেলা স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর সর্বাধি-নায়িকার পদ গ্রহণ করেন। বিশেষ যোগ্যতার সহিত বেলা তাঁহার এই সুকঠিন দায়িত্বভার পালন করিয়াছিলেন এবং সমবেত দেশ-নায়কগণের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন।

১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারত-বর্মা সীমান্তে ইংরাজ-আমেরিকান সৈনিকদিগের সহিত জীবন-মরণ যুদ্ধে লিপ্ত। ভারতবর্ষে সেই সংবাদ তখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। সেই সময় সর্বাধিনায়ক নেতাজীর নির্দেশে আজাদ হিন্দ গুপ্ত বিভাগের কয়েকজন সৈনিক সাবমেরিনযোগে ভারতবর্ষে উপনীত হইলেন। তাঁহাদের উদেশ্য ভারতেব সর্বত্র আজাদ-হিন্দের গুপ্ত সংস্থা গঠন করা। নেতাজীর পরিকল্পনা অনুসারে তাঁহারা বেলার স্বামী হরিদাসের সহিত মিলিত হইলেন। এই বিপদসঙ্কুল কার্যের দায়িত্ব শ্রীযুত হরিদাস মিত্রের উপর ন্যস্ত হইল। সুযোগ্যা সহধর্মিনীর ন্যায় বেলাও এই মহান কার্যে স্বামীকে সহায়তা করিতে লাগিলেন। নির্ভীক নারী স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অম্লান বদনে সুনিশ্চিত মৃত্যুর পথে ঠেলিয়া দিলেন তাঁহার প্রিয় স্বামীকে। এই দম্পতীর তত্ত্বাবধানে তাঁহাদেরই বাসভবন হইতে সর্বপ্রথম ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী নেতাজীর নিকট গুপ্তবার্তা প্রেরিত হইল। ইহাদেরই পরিচালনায় এই প্রকারে ইংরাজের শ্যেন দৃষ্টির অন্তরালে দিনের পর দিন গুপ্ত-সংবাদ পৌঁছিতে লাগিল রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, সায়গন প্রভৃতি স্থানে।

এই গুপ্ত বাহিনীর জনৈক কর্মী অকস্মাৎ একদিন বোম্বাইতে ইংরাজ সরকারের হস্তে ধরা পড়িয়া হরিদাস মিত্রের নাম প্রকাশ করিয়া দেয়। অতঃপর এই দলটিকে ধরিবার জন্য ইংরাজ সরকার ভারতের বিভিন্ন স্থানে তোলপাড় করিতে লাগিল। কতিপয় কর্মীকে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করা হইল। হরিদাস মিত্রও একদিন কলিকাতায় ধরা পড়িলেন।

এদিকে এই সময়ে নেতাজীর নিকট হইতে একটি সাবমেরিন-যোগে অপর একদল গুপ্ত ফৌজ উড়িষ্যার উপকূলে অবতরণ কালে ধরা পড়ে। ভারতের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে গুপ্ত সৈনিকবৃন্দ তখন দিশাহারা। তাহাদের অর্থ নাই, আশ্রয় নাই, সহায় নাই। এই নিদারুণ সঙ্কটে বেলা স্বহস্তে এই গুপ্ত বাহিনীর কার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। নিজের অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দলের কর্মীদিগকে তিনি নিরাপদ স্থানে রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। গুপ্ত বিভাগের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল পত্র, ট্রান্সমিটার প্রভৃতি যন্ত্রপাতি যাহাতে ইংরাজ সরকারের হস্তগত না হয়, সেই ব্যবস্থাও তাঁহাকেই করিতে হইয়াছিল। নানাবিধ ভীতি প্রদর্শন, প্রলোভন, এমন কি স্বীয় স্বামী হরিদাসের মুক্তিপণ পর্যন্ত বেলাকে তাঁহার কর্তব্য হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই।

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে গুপ্ত বিচারে হরিদাস মিত্রসহ বাইশ জন দেশপ্রেমিক আজাদী বীরের ফাঁসির আদেশ হয়। বেলা সমস্ত বন্দীদের পক্ষ হইতে আদালতে আপিল করিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন; কিন্তু সেই সুযোগ তাঁহাকে দেওয়া হইল না। ১১ই সেপ্টেম্বর (১৯৪৫) ইহাদের ফাঁসির দিন ধার্য হইল।

ফাঁসির এক সপ্তাহ পূর্বে বেলাকে তাঁহার স্বামী হরিদাসের সহিত আলিপুর কারাগারে প্রথম ও শেষ সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হইল। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত স্বামীর সহিত এই সাক্ষাৎকার কালে বেলা এক অপূর্ব মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন।

কারাগারের লৌহ আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ হরিদাসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বেলা সেদিন শান্ত-সমাহিত চিত্তে, অকম্পিত কণ্ঠে হরিদাসকে বলিয়াছিলেন, "এতটুকু চিন্তা করো না। যে কর্তব্যভার তুমি আমার্ জন্য রেখে গেলে, আশীর্বাদ করো, আমি যেন তা' পালন করতে পারি। তোমার সহধর্মিনীর মর্যাদা দিয়ে যে গৌরব তুমি আমাকে দিলে,—সারা জীবন আমার তা পাথেয় হয়ে রইল।"

এই সাক্ষাৎকার কালে বেলার বাক্‌রোধ হয় নাই, নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয় নাই। তাঁহার নির্ভীকতা, তেজস্বিতা এবং এইরূপ ধীর-স্থির ভাব দর্শনে ইংরাজ কারাধ্যক্ষ মিঃ টেলার (Mr. Taylor) হরিদাসকে বলিয়াছিল, "আমি আমার গত বাইশ বৎসরের জেলের চাকুরীতে এমন দৃশ্য কখনও দেখিনি। I off my hat to this brave lady." D. I. G. (I. B., C. I. D.) মিঃ হার্ডউইকও (Mr. Hardwick) তাঁহার মস্তকস্থিত টুপী খুলিয়া বেলাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

জীবনের এই মহাবিপদের সময় বেলার স্মরণ হইল মহাত্মাজীর কথা। মহাত্মাজী তখন পুনায় অবস্থান করিতেছিলেন। বেলার আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে পুনায় যাইয়া মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। গুরু সম্বুদ্ধচৈতন্যও বলিলেন, "বেলা, তুমি এবার পুনায় চলে যাও। মহাত্মাজী তোমার চোখের জল দেখলে স্থির থাকতে পারবেন না। নিশ্চয় তিনি তোমায় এ সময় সাহায্য করবেন। তুমি বোম্বে যাও, আর আমি চলে যাচ্ছি হিমালয়ে—অমরনাথে! সেখানে নিভৃতে হরিদাসের জন্য যা' করবার হয়, করব। তাঁর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করব।"

মহাত্মাজী তখন পুনাতে এক নেচার ক্লিনিকে (Nature clinc) অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় কিছুদিন বিশ্রামের পর তাঁহার বাংলাদেশে আসিবার কথা। বেলা কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার ছোটকাকার সহিত পুনা চলিয়া গেলেন।

মহাত্মাজী তাঁহার পরম স্নেহের পাত্রী বেলাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। বেলা আজাদ হিন্দ ফৌজের বাইশ জন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত দেশসেবকের কথা মহাত্মাজীকে জানাইলেন। হরিদাসের ফাঁসি হইতে তখন আর মাত্র চারিদিন বাকি। ভারতের কোন নেতা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এই দেশপ্রেমিকদের কথা কিছুই জানিতেন না। ইংরাজ সরকার এই ঘটনা সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়াছিল। মহাত্মাজীও হরিদাস প্রভৃতির সংবাদ জ্ঞাত ছিলেন না।

বেলা গান্ধীজীকে তাঁহার আসন্ন সর্বনাশের কথা শুনাইলেন এবং সমস্ত কাগজপত্র মহাত্মাজীকে দেখিবার জন্য তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলেন। স্বামীসহ বন্দীদিগের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিতে বেলা মহাত্মাজীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। মহাত্মাজী বেলাকে আশৈশব স্নেহ করেন। তিনি তাঁহার এই স্নেহের পাত্রীর মর্মান্তিক দুঃখ-বেদনা দেখিয়া বিচলিত হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, বেলা, দেখি আমি চেষ্টা করে কতদূর কি করতে পারি। হরিদাসের প্রাণরক্ষার জন্য আমার চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না; তবে সব ক'টি সৈনিকের ভরসাতো তোমায় দিতে পারছিনে বেলা! ওরা আমার সে অনুরোধ শুনবেন কি?"

বেলা বলিলেন, "কিন্তু বাপুজি! দেশের স্বাধীনতার জন্য ওঁরা বাইশজনই নেতাজীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সংগ্রাম করেছেন। আর, দেশসেবার জন্যই আজ তাঁদের মাথার ওপর এই চরম শাস্তি! আপনার সাহায্য নিয়ে আমার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আমি বাড়ী যাব, আর আমারই মত অপর একুশজন অভাগিনীর জীবনে চির-বৈধব্য নেমে আসবে, এজন্যই কি আমি জাতির জনকের কাছে এসেছি বাপুজি?—যদি বাঁচাতে পারেন, তবে সবাইকে বাঁচাতে হবে, আর তা না হলে আমি-ও চাইনে। তাহলে আমার স্বামীর মৃত্যুই হোক!"

এই কথা বলিয়া বেলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

মহাত্মাজী তখন চিবুকে হাত দিয়া গুম্ হইয়া গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় বসিয়া রহিলেন। প্রায় দশ মিনিট পরে তিনি একপ্রকার ছুটিতে ছুটিতে গিয়া, বেলার হাত ধরিয়া তাঁহাকে ঘরে টানিয়া আনিয়া বসাইলেন,—"বসো, বেলা, বসো এখানে।"

বেলার মহানুভবতা দেখিয়া মহাত্মাজী স্তম্ভিত হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, "Bela, you are really a brave lady. I have seldom come across a girl like you."

অবিলম্বে ফাঁসি স্থগিত করান দরকার সর্বাগ্রে, সময় অতি সঙ্কীর্ণ। গান্ধীজী সেই দিকেই মন দিলেন, বাংলাদেশে আগমন স্থগিত রাখিলেন। তিনি বেলাকে পরামর্শ দিলেন, "তুমি বোম্বে থাক তোমার কাকার কাছে। সুখবর না পাওয়া পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা কর। শ্রীভগবান যদি আমার প্রার্থনা শোনেন, আবার আমি তোমার হাসিমুখ দেখবো, তুমি আমাকে ভজন শোনাবে। তারপর হবে তোমার ছুটি। তখন তুমি কলকাতা ফিরে যাবে।"

লর্ড ওয়াভেল তখন ভারতের বড়লাট। গান্ধীজী তাঁহার সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। সুখের বিষয় তাঁহার প্রথম অনুরোধ রক্ষিত হইল। বাইশজন বন্দীর ফাঁসি আপাততঃ স্থগিত রাখা হইল।

এইবার লর্ড ওয়াভেলের সহিত মহাত্মাজীর বাদানুবাদ চলিল। দিনের পর দিন, দিনে দিনে মাস অতিক্রান্ত হইল। এই প্রকারে কয়েকমাস কাটিয়া গেল। বেলা উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে অপেক্ষমানা। অবশেষে মহাত্মা গান্ধীই জয়যুক্ত হইলেন। দীর্ঘ চারিমাস পরে, ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর হরিদাস মিত্র ও তাঁহার একুশজন সহকর্মীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়; কিন্তু তাঁহাদের সকলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হইল। এই ব্যাপারে গান্ধীজীর একান্ত সচিব রাজকুমারী অমৃত কাউরও বেলাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

হরিদাসের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত হইবার পর মহাত্মা গান্ধী কলিকাতা আসিলে বেলা তাঁহাকে এলগিন রোডের বাড়ীতে মাল্যভূষিত করেন। সেই সময়ে হরিদাসের মাসীমাও সেখানে ছিলেন। মহাত্মাজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোস্‌হুয়া" ? এই এলগিন রোডের বাড়ীতেই বেলা সেদিন তাঁহার জীবনের পরম আরাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীমৎ সম্বুদ্ধচৈতন্যের সহিত মহাত্মা গান্ধীর পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। মহাত্মাজী সম্বুদ্ধচৈতন্যের পরিচয় জানিয়াই ভক্তিবিনম্রচিত্তে তাঁহাকে নমস্কার করেন। ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্যও "ওঁ নামো নারায়ণায়" বলিয়া মহাত্মাজীকে প্রতিনমস্কার জ্ঞাপন করেন।

হরিদাসের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত হইল। জগদ্ধাত্রী মাতার অংশে জাত বেলার শাশুড়ী-প্রদত্ত "সাবিত্রী" নাম সেদিন প্রকৃতই সার্থক হইল।

যেদিন হরিদাস মিত্র প্রভৃতির প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত হইবার সংবাদ প্রচারিত হইল, সেদিন বোম্বাই ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের শত সহস্র সধবা নারীরা আসিয়া বেলাকে সিঁদুর পরাইয়া দিল এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সকলে সাবিত্রী-ব্রতের অনুষ্ঠান করিল। পুরাণের সাবিত্রী, মনসা-মঙ্গলের বেহুলা যেন সেদিন বেলার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তথাপি একটি কথা বলিবার আছে। পুরাণের সাবিত্রী কিংবা মনসা-মঙ্গলের বেহুলা কেবলমাত্র স্ব স্ব মৃত স্বামীর জীবন পুনরুজ্জীবন করিয়াছিলেন ; কিন্তু বেলা কেবলমাত্র তাঁহার স্বামীরই নহে, আরও একুশজন সধবা নারীর স্বামীর প্রাণও রক্ষা করিয়াছিলেন। বেলা এই যুগের সাবিত্রী, বেলা বাঙ্গালীর ঘরের নব-বেহুলা !

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বনামখ্যাত মেজর জেনারেল শাহ্‌ নাওয়াজ খান্‌ যখন মুক্তিলাভের পর প্রথম কলিকাতায় আসিলেন, তখন নেতাজী-ভবনের পুরদ্বারে বীরাঙ্গনা

বেলাই তাঁহাকে বরণ করেন এবং স্বীয় আঙ্গুল কাটিয়া রক্তদ্বারা জাতীয় বীরের ললাটে জয় তিলক অঙ্কন করিয়া দিয়াছিলেন।

এদিকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে ভারতের এক অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হইল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্বয়ং অগ্রণী হইয়া হরিদাস মিত্র ও অন্যান্য আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদিগকে মুক্তিদান করিলেন। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তাঁহাবা মুক্তিলাভ করিলেন।

স্বামীর কারামুক্তির সময় বেলা অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। তিনি শয্যাগতা, উঠিতে পারেন না,—হাঁপানীতে খুব কষ্ট পাইতেছিলেন। হরিদাসের সহিত অসুস্থ বেলার যখন মিলন হয়, বেলাব শ্রীগুরুদেব সম্বুদ্ধচৈতন্য তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মন তখন আনন্দ-বিষাদে পূর্ণ! তিনি উভয়কে ঈশ্বরের নামে আশীর্বাদ করিলেন।

মহাত্মাজী তখন দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালিতে আর্তের সেবায় রত। গান্ধীজী বাংলা শিখিয়া এই সময় বেলাকেই প্রথম বাংলায় চিঠি দিলেন। তিনি বেলাকে শীঘ্র সুস্থ হইয়া নোয়াখালিতে তাঁহাব সেবাকার্যে সঙ্গী হইবার জন্য আহ্বান জানাইলেন।

ইহার কিছুদিন পরে বেলা সুস্থ হইয়া স্বামী হরিদাস মিত্র ও ভাইজান মেজর জেনারেল শাহ্ নাওয়াজ খান্‌কে সঙ্গে করিয়া নোয়াখালিতে গমনপূর্বক মহাত্মাজীকে প্রণাম ও তাঁহার স্নেহাশীর্বাদ গ্রহণ কবিলেন। বেলাকে সঙ্গে করিয়া নোয়াখালি পরিক্রমাকালে মহাত্মাজী সকলকে বলিতেন,—"বেলা আমার দেশের আদর্শ মেয়ে! এমন মেয়ে দেশে যত বাড়বে দেশ ততই এগিয়ে যাবে।"

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই অগাস্ট ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হইয়া স্বাধীনতা অর্জন করিল। বেলা এইবার দেশ সংগঠনের দিকে মন দিলেন। নেতাজী বলিয়াছিলেন, "নীলকণ্ঠকে আদর্শ করে যে ব্যক্তি বলতে পারে,—আমার মধ্যে আনন্দের উৎস খুলে গেছে, তাই আমি সংসারের সকল দুঃখকষ্ট নিজের বুকের মধ্যে টেনে

নিতে পারি, যে ব্যক্তি বলতে পারে,—আমি সব যন্ত্রণা ক্লেশ মাথায় তুলে নিচ্ছি, কারণ এর ভিতর দিয়ে আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি,—সেই ব্যক্তিই সাধনায় সিদ্ধ হয়েছেন।”

তিনি আরও বলিয়াছেন,—“আমাদের আজ এই সাধনায় সিদ্ধ হতে হবে। নূতন ভারত যারা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের কেবল দিয়ে যেতে হবে, প্রতিদানে কিছু না চেয়ে। নিঃশেষে জীবনদান করেই জীবনের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যাঁরা এরূপ সাধক হবেন, তাঁদের সম্পদ থাকবে কেবল অন্তরের আত্মবিশ্বাস, আদর্শানুরাগ ও আনন্দ বোধ।”

পিতৃব্যের এই বাক্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া বেলা এইবার কলিকাতায় বীরাঙ্গনা ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর নামে বাংলাদেশের তরুণীগণকে লইয়া “রাণী ঝান্সী সেবিকাবাহিনী” নামে একটি সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেন। বেলারই চেষ্টায় বাংলা-দেশে বাঙ্গালী তরুণীরা বীরাঙ্গনা-বেশে, সামরিক পোষাকে, সামরিক বাদ্য বাজাইয়া অশ্বারোহণে প্রথম রাস্তায় বাহির হয়। আবার কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় রাণী ঝান্সী সেবিকা বাহিনীর সদস্যাদের লইয়া বেলা শিবিরে শিবিরে যে সেবা করিয়াছেন তাহারই বা তুলনা কোথায়!

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের পূর্ববাংলার দাঙ্গার পর উদ্বাস্তু মহিলাদের মধ্যে শিয়ালদহ স্টেশনে সেদিন অনেকেই মুগ্ধ হইয়া দেখিয়াছেন শ্রীযুক্তা বেলা মিত্রের নেতৃত্বে রাণী ঝান্সী সেবিকাবাহিনীর ঐ তরুণীদের অক্লান্ত সেবা পরায়ণতা! এইরূপ সেবা একদিন, দুই দিন নহে, সাড়ে তিনমাস পর্যন্ত তাঁহারা করিয়াছিলেন। এই সেবাকার্যের জন্য তাঁহারা অল্প দিনের মধ্যে ১,০৩০০০ টাকা চাঁদাও তুলিয়াছিলেন। ঐ সময় বাংলা নববর্ষের দিন শিয়ালদহে বেলা সমাগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে প্রত্যেক সধবা মহিলাকে একখানি করিয়া লালপাড় শাড়ি, একটি করিয়া সিঁদুরের প্যাকেট দিয়া স্বহস্তে

সকলকে সিঁদুর পরাইয়া দিয়াছিলেন। বেলার একটি মস্ত বড পরিকল্পনা ছিল যে ভারতবর্ষের প্রত্যেক তরুণী যেন সামরিক শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

এই সম্পর্কে বেলা বলিয়াছেন, "যে দেশে নারী বিজাতীয়দের দ্বারা লাঞ্ছিতা হয়, সেই দেশে বিদ্যাশিক্ষার অগ্রে মেয়েদের বন্দুক ধরা কর্তব্য। যে দেশের নারীরা জহর ব্রত গ্রহণ করে নিজেদের সতীত্ব রক্ষা করেছিল, অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়েছিল, তবুও বিজাতীয়দের কাছে আত্মসমর্পণ করে নাই,—আমার জীবনে এই সাধ যে সেই দেশের ঘরে ঘরে মেয়েরা সামরিক শিক্ষা লাভ করুক। তাদের আদর্শ হোক রাণী অহল্যাবাঈ, ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, রাণী দুর্গাবতী প্রভৃতি। আজ দেশে অনেক মেয়ে বি. এ., এম. এ. পাশ করছে, কিন্তু কোন মেয়ের মুখে কোন তেজস্বিতার কথা ধ্বনিত হচ্ছে না।" —বেলার এই মনোভিলাষ কখনও বাস্তবে রূপান্তরিত হইল না।

প্রথমতঃ বিভিন্ন মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে বেলাকে দীর্ঘকাল চলিতে হইয়াছে; তদুপরি শিয়ালদহ স্টেশনে স্থায়ী শিবির স্থাপন করিয়া তাঁহার অমানুষিক পরিশ্রম ও সেবাকার্য পবিচালনা প্রভৃতির জন্য বেলার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং ইহার ফলে তিনি শয্যায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। ২৭শে জুলাই তাঁহার হাঁপানীর অসুখ খুব বৃদ্ধি পাইল, হার্টের (heart) অবস্থাও খারাপ হইতে লাগিল। শেষপর্যন্ত ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে রাত্রি ১২টা ৪৭ মিনিট সময়ে সজ্ঞানে "জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব" বলিতে বলিতে বেলা মর্ত্যকায়া পরিত্যাগ করিয়া সাবিত্রীলোকে মহাপ্রস্থান করিলেন। তাঁহার অমর আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে মিলিত হইয়া চিরশান্তি লাভ করিল।

বেলার অলৌকিক জীবনের কথা স্মরণ করিয়া একবৎসর সাবিত্রী চতুর্দশী তিথিতে পুনায় অনসূয়া বাঈ প্রভৃতি নেতৃস্থানীয়া মহিলারা সকলে মিলিত হইয়া এক উৎসব করেন। এই উৎসবে

বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিতা হইয়া বেলাও উপস্থিত ছিলেন। এই উৎসবে বেলাকে তাহারা "কলির সাবিত্রী" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। বেলার মত নারী ভারতবর্ষে কোটির মধ্যে একটি পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ!

বেলার আধ্যাত্মিক জীবন খুব গভীর ছিল। তিনি এলগিন রোডের বাড়ীতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের লীলাসহচর এবং অন্তরঙ্গ পার্ষদ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের প্রিয় সেবক-শিষ্য ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্যের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহা ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকের কথা। হরিদাস মিত্র তখন কারাগারে। স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য বেলা দুই বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি প্রতি অমাবস্যায় গভীর রাত্রে লক্ষ লক্ষ মন্ত্র জপ করিতেন। তাঁহার শ্রীগুরুদেব তখন সর্বদা ছায়ার মত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান করিতেন। ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্য তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যদি সতী হও মা, তুমি তোমার চোখের জলে মহাশক্তি কালিকাদেবীকে পূজা কর। তাঁর কৃপায় হরিদাসের প্রাণ রক্ষা পাবে। হরিদাসের ভাগ্যাকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন,—সেই অন্ধকার আকাশে সূর্যোদয় হবে। মহাদেবীর কৃপা চাই, তাঁর আশীর্বাদ চাই। তাই তোমাকে প্রাণমন দিয়ে সাধনা করতে হবে। দৈব এবং পুরুষকার দ্বারা তোমার কার্য সিদ্ধ হবে।"

বেলা বিবাহের পূর্বে জামসেদপুরে, কলিকাতার এলগিন রোডে এবং বিবাহের পরে কলিকাতার আশু বিশ্বাস রোড, কারমাটার প্রভৃতি স্থানে তাঁহার শ্রীগুরুদেবের নিকট বসিয়া গীতা, উপনিষদ, চণ্ডী, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিতেন। কারমাটারে তাঁহার জীবনে এক অপূর্ব দর্শন হইয়াছিল। শ্রীভগবানে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ও অচলা ভক্তি ছিল। শ্রীশ্রীগুরুস্তোত্রে আছে,—

"ধ্যানমূলং গুরুমূর্তি পূজামূলং গুরুপদম্।
মন্ত্রমূলং গুরুবাক্যং মোক্ষমূলং গুরুকৃপা ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

—এই শ্লোকগুলি বেলার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে জীবন্ত হইয়াছিল। গুরুশক্তির কৃপায় তাঁহার মানবজীবন ধন্য ও মহিমান্বিত হইয়াছিল।—(স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের ডায়েরী হইতে গৃহীত)।

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দ। সম্বুদ্ধচৈতন্য তখন তাঁহার শিষ্যা বেলার কারমাটারের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় তথায় ফকির সাহেব নামে জনৈক মুসলমান সাধকও কিছুদিন ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্যের সঙ্গ করিয়াছিলেন। একদিন সম্বুদ্ধচৈতন্য হরিদাসের সহিত কারমাটার হইতে দেওঘর বেড়াইতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে হরিদাস তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব, আপনার শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে কে আপনাকে সবচেয়ে বেশী ভক্তি করে?"—হরিদাসের এই অদ্ভুত প্রশ্নে সম্বুদ্ধচৈতন্য নীরবে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। তিনি মুখে কিছু বলিলেন না।

হরিদাস পুনরায় বলিলেন, "বেলা কিন্তু আপনাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করেন। তাঁর মতন এমন গুরুভক্তি আমি কোথাও দেখিনি।" একটু থামিয়া পরে আবার হরিদাস নিজেই বলিতে লাগিলেন,— "সেদিন সকালে আপনি আর ফকির সাহেব, দুজনে পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। আপনাদের ফিরতে দেরী হচ্ছিল। এদিকে প্রায় এগারটা বাজে! আমি বেলাকে বললাম,—'এত বেলা হলো, তুমি কিছু খেয়ে নাও!'—বেলা বলল,—'তা কি করে হয়! গুরুদেব অভুক্ত রইলেন, আর আমি খাই কি করে? আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না!—তুমি ভেবো না।' আমি তখন ঠাট্টা করে বেলাকে বললাম,—'ওঁরা দুজনে মিলেছেন ভালো!

একজন মুসলমান ফকির, তাঁব মোটে দাড়ি নেই, আর একজন হিন্দু সন্ন্যাসী, তাঁর এই লম্বা দাড়ি!'—আমার একথা শুনেই বেলা ভীষণ কাঁদতে লাগলো। কেঁদে কেঁদে আমায় বলল,—'কেন তুমি আমার গুরুদেবকে নিয়ে অমন করে ঠাট্টা করলে? কেন তুমি তাঁকে নিয়ে অমন তামাসা করলে?' এই বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে লাগলো। আমি তো অবাক হয়ে গেলাম! চৌদ্দ বছর হল আমাদেব বিয়ে হয়েছে, আমার কোন কথায় সে কোন দিন কাঁদে নি,—সেদিন যেমন কবে কাঁদল।"

শ্রীযুক্ত হবিদাস মিত্র তদীয় পত্নী বেলাব গুরুভক্তি সম্পর্কে বলেন,—"গুরুভক্তি,—নরদেহধারী মানুষ গুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞান করা,—আমি কোন মেয়েছেলেব মধ্যে এমন দেখি না।"

বস্তুতঃ বেলা তাঁহার জীবনে তাঁহাব গুরুদেবের আশীর্বাদ গ্রহণ না করিয়া কোন কাজই কবিতেন না। বাড়ীতে কোনও ভাল খাবার প্রস্তুত কবিলে সর্বাগ্রে গুরুদেবকে না দিয়া তাহা নিজে খাইতেন না। সত্যই তাঁহাব গুরুভক্তি দেখিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়।

বেলার বিবাহিত জীবনেও স্বামীব সহিত তাঁহার খুবই মধুর ভাব ছিল। হবিদাস বলেন যে, তাঁহাব ষোল বৎসব বিবাহিত জীবনের মধ্যে বেলার সঙ্গে তাঁহাব কোনদিনই ঝগড়া কিংবা কথা কাটাকাটি হয় নাই।

বেলা জীবনে কত যে গরীব দুঃখীকে সাহায্য দান কবিয়াছেন তাহা কেহ জানিত না। তাঁহাব দেহত্যাগের পরে ঐ সকল সংবাদ জানা গিয়াছে।

ব্রহ্মচাবী সম্বুদ্ধচৈতন্য তাঁহার এই শিষ্যা সম্পর্কে বলেন, "বেলার মধ্যে আমি কোনদিনই অহঙ্কারের ভাব দেখি নাই। তাকে নিরহঙ্কারিতার প্রতিমূর্তি বললেও চলে। তার সদাপ্রফুল্ল মনের চিরমধুর হাসিতে সকলের মনের মধ্যেই সে আসন পেতে বসে,

সকলকেই ভালবাসার দ্বারা সে আপনার করে নেয়। তার সরল অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হয়। বেলার জিহ্বা দিয়ে কখনো কারও নিন্দাচর্চা করা হয় নাই।"

তিনি আরও বলেন,—"আমি এশিয়ার কত দেশ, কত নগর, কত নদনদী, পাহাড় পর্বত, জঙ্গল-অরণ্য ভ্রমণ করেছি! কত দেশের, কত জাতের নরনারীকে দেখেছি, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি; কিন্তু বেলার মত এমন বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্না মেয়ে আমার চোখে আর একটিও পড়ে নি।"

বেলার জীবনের মূলমন্ত্র (motto) ছিল, "যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি।"

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের যেরূপ ভগিনী নিবেদিতা, শ্রদ্ধেয়া বেলা মিত্রও তদ্রূপ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের মানসকন্যা ছিলেন। বেলার দেহত্যাগের পর কর্মযোগী সন্ন্যাসী স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ তাঁহার এই মানসকন্যা বেলাব আদর্শকে জগতে প্রচার করিবার জন্য এবং তাঁহার পুণ্যস্মৃতিকে জগতে চিরজাগরূক রাখিবার জন্য হাওড়া জিলায় বেলানগর নামে একটি গ্রাম ও রেলস্টেশন স্থাপন করিয়াছেন। ঐ গ্রামে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ তাঁহার শ্রীশ্রীগুরু স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ইঙ্গিতে এবং পরমপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের ইচ্ছায় একটি আশ্রমও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বহু শিষ্য তাঁহাদের শ্রীশ্রীগুরুর স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য জগতে বহু মঠ, মন্দির, সঙ্ঘ ও মিশন প্রভৃতি স্থাপন বা অপর কোনো মহৎ কার্য করিয়াছেন; কিন্তু কোন শিষ্যের জীবনাদর্শকে বা পুণ্য স্মৃতিকে জগতে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য পৃথিবীর ধর্মজগতে অপর কোন মহান্ গুরুই বোধ হয় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের ন্যায় অদ্যাবধি এইরূপ কোন কার্য করেন নাই। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ এই বিষয়ে 'একামবাদ্বিতীয়ম্'। এই পুণ্যশ্লোকা বেলা মিত্রের

নামাঙ্কিত গ্রাম ও রেলস্টেশন স্থাপন করিয়া পরবর্তীকালে এই বেলানগর গ্রামেই স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ স্বীয় কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল কারণেই স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের এই মহীয়সী মানসকন্যা বেলা মিত্রের জীবনবৃত্তান্ত এইস্থানে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হইল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের সহিত স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের প্রথম পরিচয় হয় জামসেদপুরে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চতুর্থ ভ্রাতা সুধীরচন্দ্র বসু তখন জামসেদপুর কারখানায় একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তথায় ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে সুধীরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা ছায়া, অকালে অকস্মাৎ পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা ছায়ার আকস্মিক অকালমৃত্যুতে সুধীরচন্দ্র বসু এবং তাঁহার পত্নী শান্তিলতা মর্মান্তিক শোকে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলাসহচর ও অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের সেবক-শিষ্য সম্বুদ্ধচৈতন্য জামসেদপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে একদিন কন্যাশোকাতুর সুধীরচন্দ্র ও শান্তিলতার সহিত সম্বুদ্ধ-চৈতন্যের পরিচয় হয়।

ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্যের সহিত আলাপে তাঁহারা মুগ্ধ হইলেন। সুধীরচন্দ্র এবং শান্তিলতা সম্বুদ্ধচৈতন্যের উপদেশ এবং গীতাপাঠ ও গীতার ব্যাখ্যা শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হইলেন। শান্তিলতা তখনই তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সুধীরচন্দ্র অবশ্য তাঁহার নিকটেই পরে দীক্ষা লইয়াছিলেন।

জামসেদপুরে তখন বেলা ও তাঁহার পিতৃব্যের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময়ে বেলার সহিত তাঁহার ভাবীগুরু সমুদ্ধচৈতন্যের পরিচয় এবং আলাপ হয়। এই সূত্রেই ক্রমে ক্রমে সুধীরচন্দ্রের অন্যান্য ভ্রাতা সতীশচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু, বেলার পিতা সুরেশচন্দ্র বসু, ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসু, নেতাজী

সুভাষচন্দ্র বসু এবং শৈলেশ চন্দ্র বসুর সহিতও সম্বুদ্ধচৈতন্যের পরিচয় হয়।

বসু পরিবারের সকলেই ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্যকে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের গর্ভধারিণী জননী শ্রদ্ধেয়া প্রভাবতী দেবীও তাঁহাকে অশেষ স্নেহ ও সম্মান করিতেন। তাঁহাকে তিনি সর্বদা "বাবা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এই পরিবারের অনেকে সম্বুদ্ধচৈতন্যকে গুরুপদে বরণ করিলেও অপরাপর সকলের সহিতই তাঁহার সম্পর্ক ছিল মধুর। ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্য সম্পর্কে শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র বসু পরবর্তীকালে জামসেদপুরে তাঁহার পরিচিত সকলের কাছে বলিতেন,—"গুরুদেব আমাদের পরিবারের যে উপকার করেছেন, আমরা কোনদিন সেই ঋণ শোধ করতে পারব না।" এই পরিবারের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা স্বামী সম্বুদ্ধানন্দকে মুগ্ধ করিয়াছে। তিনি ইঁহাদের গৃহকে নিজের গৃহ বলিয়া মনে করেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মাতুল চিরকুমার বীরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্যকে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "আপনি আমার দিদিকে দেখেই এত মুগ্ধ হলেন, আর যদি আমার জামাইবাবুকে (স্বর্গতঃ জানকীনাথ বসু) দেখতেন! আমার জামাইবাবুর গুণের ষোল আনার এক আনাও কিন্তু আমার ভাগ্নেরা পায় নি।"

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের মানসকন্যা বেলা মিত্রকে সম্যক বুঝিবার জন্য এখানে তাঁহার কয়েকখানি পারিবারিক পত্রও মুদ্রিত হইল।

(১)

শ্রীযুত হরিদাস মিত্রের পত্র।

To Mrs. Amita Mitra (Bela).

Prisoner's letter.

20. 7. 45.

কল্যাণীয়াষু,

চিঠি তোমায় লিখবো এই ইচ্ছাতে কাগজ চেয়ে পাঠালাম, কিন্তু কি লিখবো ঠিক করতে পারছি না। সব চাইতে সত্যি কথা লিখছি যে আমি ভাল আছি, আনন্দে আছি, নিশ্চিন্তে আছি। সকল বিষয়ের সমস্ত ভাবনা-চিন্তা, দুঃখ-বেদনা, আশা-আনন্দ সবই ভগবানের উপর ছেড়ে দিয়ে আছি। বারবার এক কথা মনে হয়, ভগবান যা করেছেন মঙ্গলের জন্য, যা করবেন মঙ্গলের জন্য। তোমাদের ওপর কর্তব্য করতে পারলাম না,—একথা মনে করেও আমার কোন ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই। সে-ও ভগবানের ইচ্ছা।

একথা নিশ্চয়, মানুষের হাতে কিছুই নেই। তোমার পরে অনেক কাজের বোঝা পড়বে!—আমি একান্ত মনে বিশ্বাস করি, আমি যা পারিনি তুমি তা নিশ্চয় পারবে। খোকাকে মানুষ করে তুলো, ঈশ্বরের নামে কর্তব্যের পথে এগিয়ে গেলে, নিশ্চয় জয় হবে। খুকুর শরীর আশা করি ভালই আছে। তোমরা আমার আন্তরিক ভালবাসা নিও, গুরুজনদের আমার প্রণাম দিও। তোমাদের সাথে interview-র জন্য দরখাস্ত করেছি, কবে নাগাদ পাবো জানি না। অস্থির হোয়ো না, তাঁর স্মরণ করো, শরীরের প্রতি নজর রেখো,

কারণ ভাবীকালের জন্য ওটার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। আমার শরীর খুবই ভালো আছে।

ইতি—

শ্রীহরিদাস মিত্র

(২)

শ্রীমতী বেলা মিত্রের পত্র।

শ্রীগুরুপদ ভরসা বম্বে

৪/১১/৪৫

২৪নং ক্লীভল্যাণ্ড রোড

পরম পূজনীয় গুরুদেব ওয়ারলী

শ্রীচরণকমলেষু,

আপনার প্রেরিত ৺অমরনাথের প্রসাদ পাইয়াছি। ৺শ্যামা পূজার পত্রও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। গতকাল বিকেলে দাদার টেলিফোনের খবরে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম। আপনার কৃপায়, আপনার আশীর্বাদ ও আপনার প্রার্থনায় মায়ের সন্তানকে মা রক্ষা করেছেন। অধম সন্তানের প্রতি মায়ের এই অসীম করুণা, অসীম কৃপা, অসীম দয়ায় মুগ্ধ হয়ে গেছি।

আশীর্বাদ করুন যেন বাকী জীবনটা তাঁর ধ্যানে, তাঁর জপে, তাঁর গানে, তাঁর কথায় কাটিয়ে যেন তাঁর শ্রীপাদপদ্মে বিলীন হয়ে যেতে পারি ছুটিতে।

আজ আপনার কথামত মাকে নূতন গয়না, নূতন শাড়ি পরিয়ে ভোগ দিয়ে, আরতি করে,—ধ্যান, জপ ও প্রার্থনা করে রাত্তির কাটিয়ে দেবো। এখানে রামকৃষ্ণ আশ্রমেও মাকে দর্শন করতে যাবো। আপনার শরীর কেমন আছে? আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন।

ইতি—

সেবিকা বেলা।

(৩)

অন্য এক পত্রে বোম্বাই হইতে তিনি স্বীয় গুরুদেবকে লিখিয়াছিলেন, "……ভগবানের ওপর একান্ত নির্ভর করে আছি। তাঁর যা ইচ্ছা, মাথা পেতে নিতে হবে। এখানে আমরা দুটি প্রতিমা দর্শন করেছি। আমার সভক্তি প্রণাম নেবেন। আপনি আমার ৺বিজয়া দশমীর ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন।

ইতি—

আপনার স্নেহের বেলা।"

(৪)

কলিকাতা

১০/১১/৪৫

পরম পূজনীয় গুরুদেব

শ্রীচরণকমলেষু,

আপনাকে বম্বে থেকে যে চিঠি লিখেছিলাম সেটা মা পেয়েছিলেন; আপনাকে পাঠালাম। পৌঁছে আপনি এখানে নেই দেখে বড় মন খারাপ হয়ে গেল। আপনি কবে ফিরবেন? ওঁর সঙ্গে দেখা হয় নি,—এবার থেকে মাসে দুবার করে interview পাবো। ওরা খবর দিলে দেখা করতে যাবো। আপনার আশীর্বাদে আবার আমি সকলের মধ্যে এসে মুখ তুলে দাঁড়াতে পেরেছি। মায়ের এই অপার করুণার কথা সব সময়ে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। আপনাকে দর্শন করবার জন্য মনটা বড়ই ব্যস্ত হয়েছে। আপনি আমার শত শত প্রণাম নেবেন।

ইতি—

সেবিকা বেলা।

(৫)

মহাত্মা গান্ধীর পত্র

নোয়াখালি, শ্রীরামপুর হইতে মহাত্মা গান্ধী বাংলা শিখিয়া প্রথমেই বেলাকে নিজ হস্তে লিখলেন—

শ্রীরামপুর, নোয়াখালি
২৭।১২।৪৬

পরম স্নেহের বেলা,

হরিদাস ফিরে এসেছেন কত আশা, কত উদ্বেগ নিয়ে। তোমার কি এখনও শুয়ে থাকলে চলে? তোমাকে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি। শীঘ্র সুস্থ হয়ে স্বামীর কাজে সহায় হও, তারও অন্তরে বল দাও।

ইতি
বাপুর আশীর্ব্বাদ।

১৮

শ্রীযুত হরিদাস মিত্র এবং তদীয় পত্নী, শিষ্যা বেলা মিত্রের আন্তরিক আহ্বানে ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ কিছু-কালের জন্য তাঁহাদের কারমাটারের বাড়ীতে যাইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ স্থানীয় বিদ্যাসাগর হলে একমাসকাল ব্যাপিয়া গীতাপাঠ ও গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই গীতা ক্লাশে স্থানীয় জনসাধারণের সহিত হাওড়া জিলার বালি-দুর্গাপুরের শ্রীনবকুমার সাউ নামে এক ব্যক্তিও নিয়মিতভাবে যোগদান করিতেন। তখন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় ও আলাপ হয়। নবকুমার স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের চরিত্রমাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া পরবর্তীকালে একদা তাঁহাকে নিজেদের পল্লী অঞ্চলে লইয়া আসেন। তথা হইতে তাঁহারা পার্শ্ববর্তী রাজচন্দ্রপুর গ্রামে আগমন করেন। এই গ্রামের অধিবাসীবৃন্দের, বিশেষ করিয়া নিতাই পাত্র, মদন পাত্র, সুফল ঘোষ, জীবন ঘোষ, যতীন ঘোষ, পাঁচুগোপাল ঘোষ, গুরুপদ ঘোষ, নরেন ঘোষ, কানাই ঘোষ প্রভৃতি যুবক ও প্রৌঢ়গণের সহিত নবকুমার স্বামী সম্বুদ্ধানন্দকে পরিচিত করাইয়া দেন। ইহা ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগের কথা।

ইহার পর হইতে রাজচন্দ্রপুরের যুবকগণ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের সহিত নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দও মধ্যে মধ্যে রাজচন্দ্রপুর গ্রামে নিতাই পাত্রের গৃহে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। নিতাই পাত্র, নবকুমার

সাউ প্রভৃতি যুবকগণের ঐকান্তিক ইচ্ছা,—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ যেন রাজচন্দ্রপুরে একটি আশ্রম নির্মাণ করিয়া তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তাঁহারা একদিন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের নিকট তাঁহাদের মনোভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। গ্রামটির শান্ত পরিবেশ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দকেও বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল। একদিন নিতাই পাত্র প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া তিনি তথায় আশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্যে গ্রামটি পরিদর্শন করিতে করিতে রেলওয়ে কেবিনের নিকটবর্তী, রেল লাইনের উত্তর পার্শ্বস্থ অঞ্চলটি খুব পছন্দ করিলেন এবং ঐ স্থানটি আশ্রম স্থাপনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। ইহা শ্রবণে গ্রামবাসীরাও তাঁহাকে আশ্রম স্থাপনের জন্য জমি দান করিতে সম্মত হইলেন।

রাজচন্দ্রপুর গ্রামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা না করিলেও স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ তথায় নিতাই পাত্রের বাড়ীতে অবস্থান করিয়া তদঞ্চলের অধিবাসী-বৃন্দের মধ্যে যুগাবতার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাবধারা এবং স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতির বাণী-সমূহ প্রচার করিতে লাগিলেন। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের ১লা বৈশাখ, নববর্ষের দিন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ সঙ্কল্পিত আশ্রমের উক্ত জমিতে স্থানীয় অধিবাসীদিগকে লইয়া ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পূজা ও নববর্ষ উৎসব পালন করিলেন।

শ্রদ্ধেয়া বেলা মিত্র ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের ৩১ সে জুলাই আকস্মিক-ভাবে পরলোক গমন করিলে তাঁহার গুরু স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ বিশেষ ভাবে মর্মাহত হইলেন। মানসকন্যা বেলার বিয়োগব্যথা এই সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীকেও সেদিন ভীষণভাবে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, আর তিনি লোকালয়ে অবস্থান করিবেন না। এইবার সাধক ও তপস্বীদের লীলা-নিকেতন দেবভূমি হিমালয়ের নির্জন অরণ্যাঞ্চলে তিনি তাঁহার জীবনের অবশিষ্টকাল তপস্যায় অতিবাহিত করিবেন।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ লোকান্তরিতা বেলার স্বামী হরিদাস মিত্রের নিকট যাইয়া তাঁহার এই সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার সকল কথা শুনিয়া হরিদাস মিত্র তাঁহাকে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "স্বামিজী, আপনি না সন্ন্যাসী! আপনি না বিবেকানন্দ-অভেদানন্দের সন্তান! নিজের মুক্তির জন্য এখন আপনি হিমালয়ে চলে যেতে চাইছেন? স্বামী বিবেকানন্দ কি বলেন নি,—'যদি নিজের মুক্তি চাস্ তো জাহান্নামে যাবি, আর যদি বহুজনহিতায় জীবনধারণ করিস তো এখনই উদ্ধার হয়ে যাবি!' শ্রীরামকৃষ্ণ কি শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা বলেন নি? আপনি কি রকম সন্ন্যাসী! নিজের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়েছেন কেন? মানুষের সেবা করুন। মানুষই ভগবান্। আপনার হিমালয়ে যাওয়া হবে না। আমরা আপনাকে যেতে দেব না। আপনাকে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সেখানে থাকতে হবে!"

রাজচন্দ্রপুরের যুবকেরাও স্বামী সম্বুদ্ধানন্দকে তথায় থাকিয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছিলেন।

অকস্মাৎ একদিন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের স্মরণ হইল তদীয় জীবন-সর্বস্ব গুরু স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর নির্দেশ, "রবি, তুই তোর মাকে ফেলে দূরে কোথাও যাসনে। মায়ের সেবা করিস্। তাঁর আশীর্বাদে তোর কল্যাণ হবে।"

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ যেন পথ দেখিতে পাইলেন। শ্রীযুত হরিদাস মিত্র এবং রাজচন্দ্রপুরের যুবকদের একান্ত অনুরোধে অনুপ্রাণিত হইযা স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ শেষপর্যন্ত তথায় আশ্রম স্থাপন করিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে সিদ্ধান্ত করিলেন।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার কার্য ধীরে ধীরে আরম্ভ হইল। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের বর্ষাকালে শ্রাবণ মাসে সঙ্কল্পিত আশ্রমের জমিতে পঞ্চবটীর জন্য বৃক্ষ রোপণ করা হইল। অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, নিম এবং আমলকি বৃক্ষগুলি তিনি স্বহস্তে রোপণ করিলেন।

ঐ বৎসরই রাজচন্দ্রপুর গ্রামে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের উদ্যোগে সাড়ম্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ ও লীলাসহচর শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর পুণ্য জন্মতিথি পূজা করা হইল'। এতদুপলক্ষে মধ্যাহ্নে নিতাই পাত্রের বাড়ীতে সমবেত ভক্তগণকে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হয় এবং অপরাহ্নে পার্শ্ববর্তী গ্রাম রঘুনাথপুরের নফর একাডেমীতে অনুষ্ঠিত এক মহতী জনসভায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ঘটনাবহুল দিব্যজীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

অতঃপর ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে কার্তিক মাসের সংক্রান্তি দিন দেবসেনাপতি কার্তিক পূজার পুণ্য দিবসে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ তথায় প্রদত্ত জমিতে আশ্রম স্থাপন কবিলেন। আশ্রম স্থাপনের পূর্বে আশ্রমের জমিতে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ প্রাতে তাঁহার পরমারাধ্যা গর্ভধারিণী জননীকে পুষ্প-বিল্বপত্রে সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞানে পূজা করিলেন। পূজান্তে সন্ন্যাসীপুত্র আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য স্বীয় গর্ভধারিণী জননীর নিকট সজল নয়নে সকাতরে অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। মহাযোগিনী মাতা দক্ষিণাকালীও বহুজনহিতার্থে এবং জগতের মঙ্গলের জন্য পবম পরিতোষ সহকাবে তথায় আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন। সন্ন্যাসীপুত্রকে তিনি আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "তোমার আশ্রম নির্মাণ-কার্যে সকল বাধা-বিঘ্ন দূর হোক্। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা যাবচ্চন্দ্রদিবাকর এই আশ্রমে অবস্থান করে জগতের কল্যাণকর্মে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করুন। তোমার গুরুদেব স্বামিজী মহারাজ তোমার সহায় হোন্।"

জননীর অনুমতি ও আশীর্বাদ লাভ করিয়া স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ আশ্রমের জমিতে পাটকাঠি ও টালিদ্বারা অস্থায়ী একটি মন্দির নির্মাণপূর্বক যথাশাস্ত্র শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করিলেন। মন্দিরে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ,

স্বামী অভেদানন্দ এবং জগজ্জননী শ্রীশ্রীকালিকা দেবীর নিত্যপূজার ব্যবস্থা হইল।

ঐ দিনই সন্ধ্যায় মন্দিরে দেববিগ্রহসমূহের আরত্রিকের পর আশ্রম প্রাঙ্গণে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের অধিবাসীদিগকে লইয়া এক সভার অনুষ্ঠান করিলেন। সদ্যঃ প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের জমির ভূতপূর্ব মালিক শ্রীযুত তারিণী কুমার শী মহাশয় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের বিশেষ আমন্ত্রণে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় পৌরহিত্য করেন স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট বালি-দুর্গাপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত বিভূতি রায় মহাশয়। সভায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ তাঁহার লোকান্তরিতা মানস কন্যা প্রাতঃস্মরণীয়া বেলা মিত্রের অলৌকিক জীবনকাহিনী বর্ণনা করিয়া এই গ্রামের নাম 'বেলানগর' এবং এই আশ্রমের নাম 'বেলানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম' রাখিবার প্রস্তাব করেন। ঐ প্রস্তাবে তিনি বলেন যে, কবে কোন সুদূর অতীতে রাজচন্দ্র নামে কোন্ এক ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষার্থে এই গ্রামের নাম রাজচন্দ্রপুর রাখা হইয়াছিল। বহির্জগতের কেহ, এমন কি এই গ্রামের বর্তমান অধিবাসীবৃন্দও উক্ত রাজচন্দ্রের সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেন না। এই অজ্ঞাত অখ্যাত রাজচন্দ্রের নামানুসারে এই গ্রামের 'রাজচন্দ্রপুর' নাম পরিবর্তিত করিয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসর্গীকৃত-প্রাণা মহীয়সী মহিলা সাবিত্রীলোক প্রয়াতা বেলা মিত্রের নামানুসারে এই গ্রামের নাম অদ্য হইতে 'বেলানগর' রাখা হউক ; তবেই বেলার পবিত্র জীবনাদর্শ আমাদের স্মৃতিপথে চিরজাগরূক থাকিয়া আমাদিগকে এক মহান্ আদর্শে সর্বদা উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত করিবে। সভায় সমুপস্থিত গ্রামবাসীবৃন্দ সর্বান্তঃকরণে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। তদবধি রাজচন্দ্রপুর গ্রামের নূতন নামকরণ হইল 'বেলানগর' এবং আশ্রমটি পরিচিত হইল 'বেলানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম' নামে।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ তাঁহার দূর সম্পর্কীয় এক আত্মীয়, ফরিদপুরের রোহিণীকুমার দত্তকে একদা সতের বৎসর বয়ঃক্রমকালে কথাপ্রসঙ্গে হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, "ভবিষ্যতে আমি যেখানে বসবাস করব, সেখানে আমি অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকব। সেখানে পা ফেলতে অনেক সময় লাগবে।" স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের কৈশোর কালের এই উক্তি এতদিন পরে সত্যে পরিণত হইল। যে জমিতে বেলানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার আয়তন প্রায় ছয় বিঘা।

এইবার আশ্রমের সম্প্রসারণ-কার্য আরম্ভ হইল। আশ্রমে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের চৈত্র মাসে বিবেকানন্দ কুটীর, বৈশাখ মাসে অভেদানন্দ কুটীর, রান্নাঘর ও শরদিন্দু ভবন নির্মাণ করেন। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ব্রহ্মানন্দ কুটীর নির্মিত হয়।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বেলানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের শ্রাবণ মাসে আশ্রমের জমিতে পঞ্চবটীর বৃক্ষগুলি রোপণ করা হইয়াছিল। এইবার আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ঐ পঞ্চবটীকে যথাশাস্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১২ই ফাল্গুন, ১৩৬১ সন), বৃহস্পতিবার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১২০তম শুভ আবির্ভাব তিথিতে বিশেষ জাঁকজমকের সহিত যথাশাস্ত্র পঞ্চবটীর প্রতিষ্ঠা করা হইল। এতদুপলক্ষে পঞ্চবটীর বৃক্ষগুলিকে (অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, নিম ও আমলকি) বিশেষ পূজা করা হয়। পঞ্চবটীর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তথায় এক বৃহৎ যজ্ঞও হইয়াছিল। সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ঐ যজ্ঞে সর্বদেবদেবীর উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করা হয়। বৈদিক মন্ত্রপাঠ, যজ্ঞ, আহুতি, কীর্তন, স্তবস্তোত্র পাঠের মধ্য দিয়া যথাশাস্ত্র পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও ভক্ত নরনারী এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

পরমহংসদেবের শুভ জন্মতিথি উৎসব ও পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শ্রীযুত সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাগবত পাঠ, শ্রীযুত ব্রজভূষণ চক্রবর্তী ও সম্প্রদায়ের 'মাথুর' পালাকীর্তন এবং ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। ঐ পুণ্য দিবসে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ তাঁহার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও লীলাসহচর শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পূতাস্থির বিশেষ পূজা করিয়া উহাকে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতির সম্মুখে পঞ্চবটী তলে ভূগর্ভে প্রোথিত করেন। পরে ঐ স্থানে মর্মর প্রস্তরের এক বেদীও নির্মাণ করা হইয়াছে।

বেলানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে বিদ্যালয়টি জিলা স্কুলবোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে আড়াই শতাধিক ছাত্র আছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদিগের জন্য আশ্রমে ছাত্রাবাসও আছে। বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্ররাও এই ছাত্রাবাসে থাকিতে পারে।

১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তথাগত ভগবান বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের আড়াই হাজার বৎসর পূর্ণ হইল। এতদুপলক্ষে সমগ্র বৌদ্ধজগতে সাড়ম্বরে নানাবিধ উৎসব পালিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের পরমভক্ত স্বামী সম্বুদ্ধানন্দও তৎপ্রতিষ্ঠিত বেলানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বিশেষ সমারোহের সহিত বুদ্ধোৎসব পালন করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে বেলানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে অষ্টাদশ দিবস ব্যাপিয়া উৎসব হইয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষে জনসভায় কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটির ভিক্ষু শীলভদ্র, কেশবচন্দ্র গুপ্ত, ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ প্রভৃতি ভাষণ দান করিয়াছিলেন।

১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই ফাল্গুন, বুধবার, শিবচতুর্দশী তিথিতে আশ্রম-অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ তৎপতিষ্ঠিত আশ্রমের পঞ্চবটীতলে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। বিগ্রহের নাম "বিশ্বনাথ"। এতদুপলক্ষে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ অষ্টোত্তর সহস্র (১০০৮) বিল্বপত্র দ্বারা হোম ও শিবপূজা করেন। সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া পূজা এবং হোম হইয়াছিল। হোম সমাধা হইতে প্রভাত হইয়া যায়।

শিবচতুর্দশীর পূর্বরাত্রে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ কলিকাতায় তাঁহার গর্ভধারিণী জননীকে আশ্রমে আনিতে গেলে গল ব্লাডারের ব্যথায় নিদারুণ কষ্ট পাইতে লাগিলেন। ঐ অবস্থাতেই তিনি আশ্রমে আসেন। ব্যথা অসহ্য হইলে মরফিয়া ইনজেক্‌সন্ দেওয়া হয়। সারাদিন তিনি শয্যাশায়ী থাকেন। রাত্রিতে শারীরিক দুর্বলতা অগ্রাহ্য করিয়াও তিনি স্বহস্তে রাত্রি নয়টা হইতে পরদিবস সকাল ছয়টা পর্যন্ত একাসনে বসিয়া পূজা, হোম ও আরতি করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অপূর্ব পূজা দর্শন করিয়া সমবেত দর্শকগণ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়েন; কারণ, গল ব্লাডারের ব্যথা একদিন হইলে তজ্জন্য শরীর প্রায় একমাস দুর্বল থাকে। তাঁহারা সেদিন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের ঐ অপূর্ব পূজা সম্পর্কে পরস্পর বলাবলি করিয়াছিলেন, "মানুষ কখনও শরীরের এমন অবস্থায় পূজা করতে সক্ষম হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুর ও গুরুদেবের অসীম কৃপা ছাড়া এরূপ সম্ভব হয় না। মহারাজ আমাদের অবাক্ করে দিলেন।"

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ একদিন কোন ঘটনাপ্রসঙ্গে তদীয় শিষ্যা জ্যোতির্ময়ী সরকারকে বলিয়াছিলেন, "পূজা করবে রবি।" স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের গৃহাশ্রমের নামই রবি।

শাস্ত্রে আছে "দেবোভূত্বা দেবং যজেৎ।" শিষ্য রবির এই পূজক-মূর্তিটি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মহাগুরু স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নাই। পরবর্তীকালে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে যখন দুর্গাপূজা আরম্ভ হয়, তখন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের প্রিয়

রবিকেই তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতৃগণ পূজকের আসনে বসাইয়া দিয়াছিলেন। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের পূজা যে কি, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বুঝা যায় না। উহা অবর্ণনীয়,—অনুভূতিসাপেক্ষ।

শিবচতুর্দশীর একদিন পরেই শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি। এই শুভ তিথিতেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঐ দিবস বেলানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে পরমহংসদেবের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে ঐরূপ অসুস্থ শরীর লইয়াই স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ সাড়ে তিন ঘণ্টাকাল গীতার গীতি-আলেখ্যে সূত্রধরের কার্য করিয়াছিলেন। উৎসবান্তে অপরাহ্ণে তিনি অন্নপথ্য গ্রহণ করিলেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে, ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের কার্তিক মাসের সংক্রান্তি দিন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ টালি ও পাটকাঠি দ্বারা একটি অস্থায়ী মন্দির নির্মাণ করিয়া তথায় ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী, শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এবং শ্রীশ্রীকালিকা দেবীর পট প্রতিষ্ঠাপূর্বক বেলানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার অত্যল্পকাল পরেই তিনি আশ্রমে একটি পাকা মন্দির নির্মাণ করিয়া তথায় ঐ সকল বিগ্রহের পট স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। এইবার তিনি ঐ মন্দিরে শ্রীশ্রীকালিকা দেবীর একটি কৃষ্ণ প্রস্তরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। জগন্মাতা শ্রীশ্রীকালিকা দেবী "সর্বমঙ্গলা" নামে পরিচিতা হইলেন।

১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১০ই নভেম্বর শ্যামাপূজার রাত্রিতে এই বিগ্রহ-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। এতদুপলক্ষে ঐদিন রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকা হইতে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ শ্রীশ্রীচণ্ডীর দেবীসূক্ত, অর্গলাস্তোত্র, কীলকস্তব, দেবী কবচ এবং একাদশ অধ্যায় পাঠ করিলেন। সমবেত ভক্তবৃন্দের নিকট তিনি অতঃপর শ্রীশ্রীকালীতত্ত্ব সম্পর্কে একটি ভাষণ দান করিলেন। রাত্রি এগারটায় মহানিশায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

দেবীর পূজা আরম্ভ করেন এবং পূজা শেষ করিয়া ভোর সাড়ে পাঁচটায় পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন। তাঁহার মাতৃপূজার সময় বিভিন্ন ভক্তও শ্যামাসঙ্গীত গাহিয়া অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল।

১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ যখন বেলানগরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তথায় যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা ছিল না। একদিকে মাইল দেড়েক দূরে ডানকুনি রেলস্টেশন অথবা অপরদিকে মাইল দুই দূরে বালি স্টেশনে যাইয়া জনসাধারণকে ট্রেন ধরিতে হইত। অথচ হাওড়া বর্ধমান কর্ড লাইনটি বেলানগর গ্রামের পাশ দিয়াই গিয়াছে।

ইত্যবসরে পাকিস্থান সৃষ্টি হওয়ায় পূর্ববঙ্গের কিছু কিছু উদ্বাস্তু অধিবাসী আসিয়া বেলানগরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। বেলানগরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে তথায় লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অধিকন্তু শত শত ভক্ত নরনারীও বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বেলানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে যাতায়াত করিত। এতগুলি লোকের যাতায়াতের অসুবিধা এবং কষ্ট স্বামী সম্বুদ্ধানন্দকে বিচলিত করিয়া তুলিল। তিনি বেলানগরে একটি রেলস্টেশন স্থাপন সম্পর্কে সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি তদঞ্চলের লোকদিগকে সংগঠিত করিয়া ভারত সরকারের রেলওয়ে দপ্তরের সহিত যোগাযোগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ভারত সরকারের রেলওয়ে দপ্তরের উপমন্ত্রী, আজাদ হিন্দ ফৌজের মেজর জেনারেল শাহ্ নাওয়াজ খান্ সাহেবের হস্তক্ষেপের ফলে শেষপর্যন্ত ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে বেলানগর আশ্রমের সম্মুখে একটি রেলস্টেশন স্থাপিত হইল। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের মানস কন্যা লোকান্তরিতা বেলা মিত্রের নামানুসারেই এই রেলস্টেশনের নাম রাখা হইল "বেলানগর"। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের দীর্ঘদিনের পরিশ্রম সফল এবং স্থানীয় কয়েক সহস্র অধিবাসী ও শত শত ভক্তের দীর্ঘদিনের একটি অভাব এতদিনে দূর হইল।

পুণ্যশ্লোকা বেলা মিত্রের জন্মতিথিতে, শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজার পুণ্য দিন, ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর (৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫ সাল), রবিবার, অপরাহ্নে বেলানগর রেল স্টেশনের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন তদানীন্তন ভারত সরকারের ডেপুটী রেলমন্ত্রী, বেলার ভাইজান, আজাদ হিন্দ ফৌজের মেজর জেনারেল শাহ্ নাওয়াজ খান্ স্বয়ং।

ঐদিন সকাল হইতেই বেলানগব ও পার্শ্ববর্তী অভয়নগর, রঘুনাথপুর, বালি-দুর্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চলসমূহ আনন্দে মুখর হইয়া উঠে। কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থান হইতেও শত শত ভক্ত-দর্শক এই স্টেশন-উদ্বোধন উৎসবে যোগদান করিতে আসিয়াছিল। বেলানগর স্টেশন গৃহটিও এতদুপলক্ষে এই দিন পুষ্প-পত্র-মাল্য ও বেলার প্রতিকৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। আশ্রমেও এইদিন সমস্ত দিবস ব্যাপিয়া উৎসব হয়। প্রাতে নয়টা হইতে বেলা বারটা পর্যন্ত কালীকীর্তন হইল। এতদুপলক্ষে ব্যাণ্ড পার্টিও আনয়ন করা হয়। 'তাহারা বেলা দশটা হইতে বেলানগব স্টেশনে, গ্রামের বিভিন্ন পথে, আশ্রম-প্রাঙ্গণে বাজনা বাজাইয়া উৎসবের আনন্দকে শতগুণে বর্ধিত করিল। এই উৎসবে যোগদানকারী বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বহু সহস্র নরনারীকে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বসাইয়া খিচুড়ি, তরকারী ও চাট্‌নি প্রসাদ দেওয়া হয়। বেলা বারটা হইতে অপরাহ্ন তিনটা পর্যন্ত প্রসাদ বিতরণের কার্য চলে।

এই উৎসবে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকার হইতে ঐদিন তিন শতাধিক পুলিশ ও শতাধিক সাদা-পোষাকের পুলিশ বেলানগরে প্রেরিত হইয়াছিল। সুষ্ঠুভাবে উৎসবের কার্য পরিচালনার জন্য আশ্রম হইতেও চারি শত স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

অপরাহ্ন সাড়ে তিন ঘটিকায় মেজর জেনারেল শাহ্ নাওয়াজ খান, কয়েকজন এম. পি., পশ্চিমবঙ্গের কতিপয় মন্ত্রী এবং

এম. এল্. এ., কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি একটি ট্রেনে বেলানগর স্টেশনে আগমন করেন। মেজর জেনারেল শাহ্ নাওয়াজ খান্ গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে ব্যাণ্ড বাজাইয়া এবং শঙ্খধ্বনি করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হয়। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি আশ্রম-অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজ মন্ত্রীমহোদয় এবং মাননীয় অতিথিদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া স্টেশন-সংলগ্ন বক্তৃতামঞ্চে লইয়া গেলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শাহ্ নাওয়াজ খান্-এর সহিত পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসারগণও আসিয়াছিলেন।

বেলানগর রেল স্টেশনের উদ্বোধনী সভায় পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার কৃপাল সিং সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, শাহ্ নাওয়াজ খান্, পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার, হেমন্তকুমার বসু এম্. এল্. এ. প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

এই সময়ই কেন্দ্রীয় সরকারের রেলওয়ে ডেপুটি মন্ত্রী শাহ্ নাওয়াজ খান্ উপস্থিত বিশ সহস্রাধিক লোকের সম্মুখে একটি ফিতা কাটিয়া বেলানগর রেল স্টেশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করিলেন। এই সময় স্বেচ্ছাসেবিকাগণ ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি করিতেছিল।

সভার কার্য শেষ হইলে সকলে আশ্রমে আগমন করেন। তথায় অতিথিদিগকে এক চা-চক্রে আপ্যায়িত করা হয়।

চা-পানের পর আশ্রম-প্রাঙ্গণেও এক সভার অনুষ্ঠান হয়। এই সভায় পৌরহিত্য করেন মেজর জেনারেল শাহ্ নাওয়াজ খান্। এই সভায় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু, ডাঃ কালিদাস নাগ প্রভৃতি কর্তৃক প্রেরিত বাণীসমূহ পাঠ করা হয়। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ প্রভৃতি ভাষণ দান করিলেন। সভান্তে লোকান্তরিতা বেলার জীবন-নাট্য অভিনীত হয়। নাটকে ছোট বেলা এবং বড়

বেলার ভূমিকায় বেলারই কন্যাদ্বয় সুনীতা এবং নন্দিতা অভিনয় করিয়াছিলেন।

বেলানগরেই ভারতের মধ্যে প্রথম স্বদেশ-সেবায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণা এক মহীয়সী মহিলার নামে রেল-স্টেশন স্থাপিত হইল। এই স্টেশনের উদ্বোধন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু নিম্নলিখিত পত্রটি প্রেরণ করেন,—

সত্যমেব জয়তে
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল

রাজভবন
কলিকাতা
২১শে নভেম্বর, ১৯৫৮

আমি জানিয়া সুখী হইলাম যে স্বর্গীয়া বেলা মিত্রের স্মৃতি রক্ষাব জন্য পূর্ব রেলওয়ে আগামী ২৩শে নভেম্বর, ১৯৫৮, "বেলানগর" নামে একটি নূতন স্টেশন খুলিতেছে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পরিবারের সুমহান্ ঐতিহ্যের মধ্যে তাঁহার জন্ম এবং তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই শ্রীমতী মিত্র তরুণ বয়সেই আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহার বহুমুখী কর্মধারার মধ্যে তিনি কৃতিত্বের সহিত একটি সুনিপুণ নারীবাহিনী গড়িয়া তোলেন। দুর্ভাগ্য যে, এইরূপ একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ জীবন অকালে শেষ হইয়া গেল।

তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করাই একান্ত শোভন হইবে। অনুষ্ঠানটি যাহাতে পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করে সেই শুভ কামনা জানাই। ইতি—

পদ্মজা নাইডু
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল।

অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করিয়া ডক্টর কালিদাস নাগ নিম্নলিখিত পত্রটি প্রেরণ করেন,—

ইন্‌স্টিটিউট্‌ অব্‌ এশিয়ান্‌ আফ্রিকান্‌ রিলেসনস্‌
১০৮ রাজা বসন্ত রায় রোড—কলিকাতা-২৯
ডঃ কালিদাস নাগ এম. এ. (ক্যাল্‌), ডি. লিট্‌. (প্যারিস্‌)
ফোন—৪৬-৪৩১৫ তাং ২১শে নভেম্বর, ১৯৫৮

অনিবার্য কারণবশতঃ এখানে অনুপস্থিতির জন্য উৎসব কমিটির সভাপতি হিসাবে আমি মার্জনা চাহিতেছি ; তথাপি আমি সমাগত অতিথিবৃন্দ, বিশেষতঃ আমাদের মাননীয় উপমন্ত্রী শ্রীশা নাওয়াজ খান্‌কে স্বাগত জানাই। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুব সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পর্কের দিক দিয়া তিনিও বসু-পরিবাবের অন্তর্ভুক্ত।

ভারতবর্ষ ও এশিয়ার মুক্তি-সংগ্রামেব ইতিহাসে নেতাজী এক নূতন অধ্যায় বচনা করিয়াছেন, এবং সেই মহান্‌ আদর্শের আহ্বানে বহু নরনারী আত্মোৎসর্গ কবিয়াছেন।

নেতাজীর পরম স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী বেলা মিত্র শেষ দিন অবধি নেতাজীর আদর্শকে নিজের জীবনে রূপায়িত করিয়াছেন। সেইজন্যই জাতীয় সবকার এবং দেশবাসীবৃন্দ, যাঁহারা এই "বেলানগব" স্টেশন উদ্বোধন উপলক্ষে সমবেত হইয়াছেন—তাঁহাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই আদর্শ যেন স্বাধীন ভারতের নারী সমাজের অগ্রগতির ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকে।

জয় হিন্দ। বন্দে মাতরম্‌।

কালিদাস নাগ।

বেলানগর স্টেশন উদ্বোধন সভায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজ তাঁহার ভাষণে বলেন,—"আজ আমাদের দেশের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। ভারতবর্ষে এই প্রথম একজন মহীয়সী মহিলার নামে একটি রেল স্টেশন নির্মিত হল। এজন্য সর্বপ্রথম ভারত সরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। বিশেষ করে আমি উল্লেখ করবো, রেলওয়ে উপমন্ত্রী, একান্ত প্রীতিভাজন মেজর জেনারেল শাহ্ নাওয়াজ খান্-এর নাম। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহে ও নিরবিচ্ছিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার ফলে রেল-স্টেশন বেলানগরের জন্ম সম্ভব হয়েছে। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমাদের নেই। মঙ্গলময় ভগবানের নিকট আমি তাঁর দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রচেষ্টাও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজে এই স্টেশনের নামকরণ থেকে এর সমস্ত কার্যের প্রতি সহানুভূতিসূচক দৃষ্টি রেখেছিলেন। তার উপর ইস্টার্ণ রেলওয়ের ম্যানেজার কৃপাল সিংজীসহ সর্বস্তরের রেল-কর্মচারিগণের ঐকান্তিক চেষ্টা ও সহযোগিতায় বেলানগরের রূপদান ত্বরান্বিত করেছে। আজ তাঁদের সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

উক্ত সভায় সভাপতি কৃপাল সিং তাঁহার ভাষণে বলেন যে, ইহার পূর্বে এখানে স্টেশন করিবার জন্য স্থানীয় লোক যত চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন,—অনুমোদন করেন নাই। এইবার স্বামিজী চেষ্টা করাতেই তাঁহারা এখানে বেলানগর স্টেশন স্থাপন করিলেন। এই স্টেশন নির্মাণে ৯৫ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই স্টেশনে এখন আনুমানিক বার্ষিক ছয় হাজার টাকা ক্ষতি হইবে, তবে ভবিষ্যতে এই ক্ষতি পোষাইয়া যাইবে।

বেলানগর স্টেশন উদ্বোধন প্রসঙ্গে শ্রীশাহ্ নাওয়াজ খান্ বলেন যে, সাময়িক আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি অপেক্ষা যাত্রীসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য

বিধানই ভারত সরকারের নীতি। স্টেশনের নামকরণ প্রসঙ্গে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে, বিশেষতঃ ঝান্সী সেবিকা বাহিনীর সর্বাধিনায়িকা স্বর্গীয়া মিত্রের আত্মত্যাগ ও দুঃখ বরণের কথা উল্লেখ করেন এবং ভারতের নারী সমাজকে তাঁহার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে বলেন।

শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর্গীয়া বেলা মিত্রের অপূর্ব সাহস ও দৃঢ়তার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তিনি কেবলমাত্র স্বামীর যোগ্যা সহধর্মিণীই ছিলেন না, দেশের স্বার্থে নিজের স্বামীকে বলিদান দিতেও প্রস্তুত ছিলেন।

মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার বলেন যে, বেলার বাল্যকাল হইতেই তিনি তাঁহাকে জানিতেন। আজাদ হিন্দ ফৌজে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত তাঁহার স্বামীসহ ২২ জন বীরের জীবন রক্ষার জন্য গান্ধীজীর সহায়তায় তাঁহার দুর্দম প্রচেষ্টার বিষয়ও তিনি উল্লেখ করেন।

স্বর্গীয়া বেলা মিত্রের পিতা শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বসু আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলেন যে, ভারতবর্ষে রবি মহারাজ একটি নূতন আদর্শ দেখাইলেন। চিরাচরিত প্রথানুসারে শিষ্যগণ গুরুর স্মৃতি রক্ষা করেন,—এইখানে মহারাজ অন্যরূপ দেখাইলেন। তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্যার স্মৃতির জন্য এই গ্রামের নাম ও এই স্টেশনের নাম 'বেলানগর' রাখিয়াছেন। গুরুদেবের যে শিষ্যার স্মৃতিরক্ষা করিবার জন্য এই অক্লান্ত ঐকান্তিক চেষ্টা,—এইরূপ ভারতবর্ষে কোনস্থানে আমরা দেখি নাই। এইজন্য আমি ও আমাদের পরিবার মহারাজের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

ঐদিনই রাত্রি দশটার পর কলিকাতার ময়রা স্ট্রীটে শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বসুর বাড়ীতে শ্রীযুত শাহ্ নাওয়াজ খান্ বাড়ীর অন্যান্য সকলের সঙ্গে বেলানগর সম্পর্কে যখন আলোচনা করিতেছিলেন তখন হঠাৎ একজন শাহ্ নাওয়াজ খান্-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ বেলানগরে স্টেশন হওয়ায় সবচেয়ে বেশী সুখী হয়েছেন কে?"

শাহ্ নাওয়াজ খান্ তৎক্ষণাৎ বিনা দ্বিধায় বলিয়া উঠিলেন, "স্বামিজীই আজ সবচেয়ে বেশী সুখী হয়েছেন।"

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কন্যা শ্রীমতী অনীতা বসু যখন ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে ভারত পর্যটনে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার জেষ্ঠতাত-কন্যা স্বর্গীয়া বেলা মিত্রের জীবন-কাহিনী এবং বেলানগর আশ্রম ও স্টেশনের কথা শুনিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা অবস্থানকালে একদিন, ১৬ই মার্চ, ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে, বেলানগর গ্রাম, স্টেশন ও আশ্রমটি পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। শান্তিপূর্ণ গ্রাম্য পরিবেশে আশ্রমটি দেখিয়া শ্রীমতী অনীতা বসু বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আশ্রম প্রাঙ্গণে গ্রামবাসীদের পক্ষ হইতে নেতাজী-কন্যা শ্রীমতী অনীতাকে সেদিন সম্বর্ধিত করা হয়। আশ্রমে তিনি কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া সেইদিনই কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতে তাহার দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে বেলানগর অন্যতম ও শেষ দ্রষ্টব্য স্থান। ইহার পরদিবসই ১৭ই মার্চ, নেতাজী-কন্যা শ্রীমতী অনীতা ভারত ত্যাগ করিয়া অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা গমন করেন।

১৯

পূর্বে বেলানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে জগজ্জননী শ্রীশ্রীকালিকা দেবী, সর্বমঙ্গলার মূর্তি এবং মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে। ঐ মন্দিরমধ্যে স্থানের স্বল্পতা হেতু এবং ভক্তগণের সুবিধার জন্য এইবার ঐ মন্দিরের একটি নাটমন্দির নির্মাণ করা হয়। আশ্রমের ভক্তগণ ঐ নাটমন্দির নির্মাণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন।

ইহা ব্যতীত জনসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের জন্য ঐ নাটমন্দিরের সংলগ্ন "অভেদানন্দ মঞ্চ"-টিও এই সঙ্গে নির্মিত হয়। এই মঞ্চ নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করেন শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ দেড়ে।

১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী (১লা মাঘ, ১৩৬৮ সন), সোমবার, সর্বমঙ্গলাধাম বা নাটমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়। আশ্রমাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের গর্ভধারিণী জননী শ্রীযুক্তা দক্ষিণাকালী দেবী একটি লাল ফিতা কাটিয়া উহার দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

অতঃপর স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজ নব নির্মিত নাটমন্দিরে সর্বমঙ্গলার সম্মুখে স্বীয় জননী দক্ষিণাকালীকে সাক্ষাৎ জগদম্বাজ্ঞানে পুষ্প ও বিল্বপত্রদ্বারা পূজা করেন। জননী দক্ষিণাকালীও তাঁহার সন্ন্যাসীপুত্রকে মস্তকে স্বীয় কল্যাণহস্ত স্থাপনপূর্বক প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

১লা মাঘ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর জন্মদিবস বলিয়া অতঃপর

আশ্রমে তাঁহার জন্মোৎসব পালিত হয়। জন্মোৎসব উপলক্ষে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ নাটমন্দিরে তাঁহার আসন গ্রহণ করিলে ভক্তগণ তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত এবং তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।

নাটমন্দির সংলগ্ন অভেদানন্দ মঞ্চের উদ্বোধন হয় ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের ২২শে মার্চ প্রাতে। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের জননী শ্রীযুক্তা দক্ষিণাকালী দেবী আশ্রমের সন্ন্যাসীবৃন্দের বৈদিক মন্ত্রপাঠ ও উপস্থিত মহিলাগণের শুভ শঙ্খ ও হুলুধ্বনির মধ্যে অভেদানন্দ মঞ্চের উদ্বোধন করেন।

বেলানগরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠাবধি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ আশ্রমে সমাগত গ্রামের দরিদ্র রোগীদিগকে বিনামূল্যে ঔষধাদি প্রদান করিতেন। এইবার আশ্রম-প্রাঙ্গণে ইহার জন্য একটি পৃথক গৃহ নির্মাণ করা হইল। এই নবনির্মিত গৃহটির নামকরণ হইল যোগেন্দ্রনাথ মিত্র দাতব্য চিকিৎসালয়। যশোহরের স্বনামখ্যাত ব্যবহারজীবী এবং দেশসেবক যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের স্মৃতিরক্ষার্থে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ শ্রীযুক্তা কমলপ্রভা মিত্র এই গৃহটি নির্মাণ করিয়া দেন। এই চিকিৎসালয়ের আসবাবপত্রাদি ক্রয় করিয়া দেন শ্রীযুক্তা কমলপ্রভা মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র! এই গৃহটি নির্মিত হওয়ায় আশ্রমের সেবাকার্য আরও সম্প্রসারিত হইয়াছে।

১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে যোগেন্দ্রনাথ দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। দ্বারোদ্ঘাটন করেন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক, জাতীয় অধ্যাপক শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক বসু বলেন যে, বেলানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রাঙ্গণে এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা স্বামী বিবেকানন্দের কার্যাবলীর সহিত একান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের

প্রকৃষ্ট নিদর্শন। দেশে স্বামিজীর এই আড়ম্বরপূর্ণ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব একদিন স্তব্ধ হইয়া যাইবে; কিন্তু চিকিৎসালয়টি দৈনন্দিন জীবনে সেবার মধ্য দিয়া মানুষের অন্তর্লোকে স্বামিজীর আদর্শ চিরজাগরুক রাখিবে।

তিনি আরও বলেন যে, স্বামিজীর জীবন-মন্ত্রই ছিল জনসেবা। অতীতে ভারতবাসীরা যদি তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়া সেবাব্রত গ্রহণ করিতে পারিত, তাহা হইলে পাকিস্থান ও উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি আদৌ হইত কিনা সন্দেহ।

বেলানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, শান্ত পরিবেশের মধ্যে এই আশ্রমের সৃষ্টি; কিন্তু অতীত ও বর্তমানের আশ্রম পরিবেশ এক নহে। এখন আশ্রম ও সংসার ঘেঁসাঘেসি বসিয়া গিয়াছে। ইহার সামঞ্জস্য বড় কঠিন। আমাদের শিক্ষা ও মনের গতির পরিবর্তন প্রয়োজন। আমাদের চারিদিকের সামাজিক আবহাওয়া কলুষিত। ইহার মধ্যে কল্যাণ করা দুষ্কর। যদি ভারতবর্ষের কিছু করিবার থাকে, তাহা এখনই করিতে হইবে। আমাদের স্বাধীনতা যদি পৃথিবীতে বজায় রাখিতে হয়, তাহা হইলে নিজেদের ভিতরের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে; তবেই স্থায়ী কল্যাণ সৃষ্টি হইবে। এই আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ যে মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন, তাহা যদি শিক্ষা ও সেবাকেন্দ্র হয় তবেই স্বামিজীর স্বপ্ন সার্থক হইবে।

২০

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ কর্তৃক বেলানগরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠাবধি তাঁহার গর্ভধারিণী জননী শ্রীযুক্তা দক্ষিণাকালী দেবী উহার প্রতিটি উৎসবে যোগদান করিতেন। কখনও কখনও তিনি দীর্ঘকাল তথায় অতিবাহিত করিয়া সাধন-ভজনে কাল কাটাইতেন।

১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে তিনি বেলানগর আশ্রমে আসিয়া প্রায় এক মাস কাল অবস্থান করেন। তখন তাঁহার বয়স বিরানব্বুই বৎসর। এই বৃদ্ধ বয়সেও ঐ সময় তিনি কয়েক দিন স্বহস্তে আশ্রম প্রাঙ্গণ ঝাড়ু দিযাছিলেন এবং কয়েক দিন আশ্রমবাসীদিগকে দুই একটি ব্যঞ্জনও রন্ধন করিয়া খাওয়াইয়া ছিলেন। তিনি সাধারণতঃ কাহারও সেবা গ্রহণ করিতেন না এবং অতি সহজ ও সরল ভাবে সকলের সহিত মিশিতেন। তাঁহার এই সকল সুমধুর চরিত্রমাধুর্যের জন্যে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের পরিচিত ব্যক্তিগণ, বিশেষতঃ তাঁহার শিষ্য-সন্তানগণ দক্ষিণাকালী দেবীকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন।

ঐ বৎসর গুরুপূর্ণিমা উৎসব শেষে ২৮শে জুলাই (১৯৬২) দক্ষিণাকালী দেবী কলিকাতা, সারপেনটাইন লেনের বাড়ী গমন করেন। ঐ স্থানেই তিনি সাধারণতঃ থাকিতেন।

কলিকাতা আসবার কয়েক দিন পরেই দক্ষিণাকালী অসুস্থ হইয়া পরিলেন। তাঁহার পেটে ব্যথা ও আমাশয়ের মত হয়। দক্ষিণাকালী দেবীর রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইলে বেলানগর

আশ্রম হইতে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মাতার সেবার জন্য কলিকাতা চলিয়া আসেন। তিন সপ্তাহ রোগ ভোগের পর দক্ষিণাকালী দেবী তাঁহার একমাত্র সন্ন্যাসী পুত্রের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইহাই তাঁহার চিরদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ এই সময় সর্বক্ষণ পীড়িতা মাতার শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন।

রোগীর শয্যাপার্শ্বে সর্বক্ষণ গীতাপাঠ, কীর্তন, ভজন, রামনাম প্রভৃতি হইত। দক্ষিণাকালী দেবী শায়িত অবস্থায় ঐ সকল শ্রবণ করিতেন। একদিবস সন্ধ্যাবেলা তিনি নিজেই আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিলেন,—

"হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল,
পার কর আমারে ;
তুমি পারের কর্তা শুনে বার্তা
ডাকছি হে তোমারে।
আমি আগে এসে ঘাটে রইলাম বসে
যারা পাছে এল আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে।
শুনি কড়ি নাই যার কর তারেও পার
আমি দীন-ভিখারী, নাইকো কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে।
যাদের পারের সম্বল আছে সাধনার বল
তারা নিজ বলে গেল চলে অকূল পারাবারে।
আমার পারের সম্বল দয়াল নামটি কেবল
ফিকির কেঁদে আকুল পড়ে অকূল পাথার সাঁতারে।"

দক্ষিণাকালী দেবীর দেহত্যাগের দিন দুই পূর্বে, রবিবার সন্ধ্যার সময় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ পীড়িতা মাতার পদতলে করজোড়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় মাতৃবদন নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সেই সময় মা-ও করজোড়ে সন্ন্যাসী পুত্রকে ক্ষীণকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "বাবা,

আমায় এবার বিদায় দাও!" ইহাতে সন্ন্যাসী পুত্রের চক্ষুদ্বয়ও অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। মা পূর্ববৎ বলিতে লাগিলেন, "তুমি তো আমার খুব সেবা করেছ। আমাকে কত তীর্থদর্শন করিয়েছ। আমার মনের কোন আকাঙ্ক্ষাই তুমি অপূরণ রাখ নাই। তুমি আমাকে যেমন সেবা করেছ, এমন সেবা কোন রাজার ছেলেও তার মাকে করে নাই!"

বর্তমান গ্রন্থের লেখক একদা দক্ষিণাকালী দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ঠাকুমা, আপনার ছেলে সংসার করেন নি বলে আপনাব মনে দুঃখ হয় না?"

ইহার উত্তরে তিনি মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া বলিয়াছিলেন, "মোটেই না। জানো ভূপতি, তোমাদের গুরুদেব মঠে চলে গেলে স্বামিজী মহারাজ (শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ) আমাকে বলেছিলেন, 'তোমার রবি সংসার করল না বলে তুমি কোন দুঃখ করো না। তোমার এক রবি সংসার ত্যাগ করেছে,—শত রবি তোমার ঘর আলো করবে। আজ তোমরা আমার কত সেবা-যত্ন করছো, আমার কোন অভাব রাখ নি। আজ আর আমার কোন দুঃখ নেই! স্বামিজী মহারাজের কথাই ঠিক!"

২৭শে আগস্ট (১৯৬২) সন্ধ্যার দিকে শ্রীযুত হরিদাস মিত্র দক্ষিণাকালী দেবীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীযুত মিত্রকে তিনি খুবই স্নেহ করিতেন। হরিদাস মিত্রও তাঁহাকে "দিদা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। অসুস্থ শরীর লইয়াও তিনি সেদিন হরিদাস মিত্রের সহিত অধিক রাত্রি পর্যন্ত নানা প্রকার হাসি-ঠাট্টা ও গল্প-গুজব করিলেন।

২৮শে আগস্ট, মঙ্গলবার অপরাহ্ণের দিকে দক্ষিণাকালী দেবীর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল। অন্তিম সময় সমুপস্থিত বুঝিয়া তিনি তাঁহার কন্যা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, তাঁহাদের পুত্র-কন্যা এবং অন্যান্য আত্মীয়-আত্মীয়াকে' শয্যাপার্শ্বে ডাকাইয়া আনিলেন।

প্রত্যেকের মাথায় হাত রাখিয়া তিনি সকলকে আশীর্বাদ করিলেন। অতঃপব তিনি নিবিষ্ট মনে রামকৃষ্ণ নাম জপ করিতে লাগিলেন। তখন যেন তাঁহার কোন শারীরিক যন্ত্রণা ছিল না, দিব্য বিভায় তাঁহাব মুখমণ্ডল সমুদ্ভাসিত।

অতঃপব ঘরেব পূজাব আসন হইতে ভগবান শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীশ্রীমা সাবদা দেবী, শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহাবাজেব প্রতিকৃতিগুলি একে একে তাঁহাব হাতে আনিয়া দেওয়া হইল। একটি একটি কবিয়া প্রতিকৃতিগুলি তাঁহাব হাতে দেওয়া হইলে তিনি ভক্তিভবে একে একে ঐগুলি মাথায় ঠেকাইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম কবিলেন। অবশেষে এক সময় মহাযোগিনীব ন্যায় অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আমার সব ফুরিয়ে গেল।"

দক্ষিণাকালী দেবীর মস্তক তাঁহাব সন্ন্যাসী-পুত্রেব ক্রোড়ে স্থাপিত ছিল। তিনি তাঁহার মুখে গঙ্গোত্রীব জল দিলেন। ঐ জল পান কবিয়া "জয় বামকৃষ্ণ" বলিতে বলিতে মহযোগিনীর ন্যায় দক্ষিণাকালী দেবী নশ্বব দেহ ত্যাগ কবিয়া অপরাহ্ণ ৫টা ৫০ মিনিটে রামকৃষ্ণ লোকে মহাপ্রয়াণ কবিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ একদা তদীয় শিষ্য স্বামী সম্বুদ্ধানন্দকে বলিয়াছিলেন "সাধন কর, ভজন কর, মরতে জানলে হয়।" কথাটির অর্থ বোধ হয়,—কে কত বড সাধক, তাহা তাঁহার মৃত্যু দ্বাবা নির্ণয় কবা যায়। দক্ষিণাকালী দেবীও তাঁহার দেহত্যাগ দ্বারা সকলকে দেখাইয়া গেলেন, তিনি কত বড় উচ্চস্তরেব সাধিকা ছিলেন। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দও এতদিন তাঁহার গর্ভধাবিণী জননীর সঙ্গ করিয়া তাঁহাকে বুঝিতে বা চিনিতে পারেন নাই। এমনই গুপ্ত সাধিকা ছিলেন তাঁহার জননী! শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবও বলিয়াছেন,—"যত হয় গুপ্ত, তত হয় পোক্ত"। অবশেষে দক্ষিণা-কালী দেবীর জীবনের শেষ একুশ দিন তাঁহার রোগশয্যায় স্বামী

সম্বুদ্ধানন্দ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন, তিনি কত বড় যোগিনী ছিলেন! মহাযোগিনী না হইলে ঐরূপ মহৎ মৃত্যু সম্ভব হয় না।

দক্ষিণাকালী দেবীর বরাবর ইচ্ছা ছিল, তাঁহার সন্ন্যাসী-পুত্রের আশ্রম প্রাঙ্গণেই যেন তাঁহার নশ্বর দেহের সৎকার হয়। শ্রীযুত হরিদাস মিত্রও মধ্যে মধ্যে আশ্রমে আসিলে এবং "দিদার" সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে পাঁজা কোলে করিয়া নাচাইতে নাচাইতে বলিতেন, "দিদা, তোমাকে কিন্তু আমরা আশ্রমেই রাখব!"

এখন দক্ষিণাকালী দেবীর দেহত্যাগ হইলে বেলানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমেই তাঁহার নশ্বর দেহ সৎকারের ব্যবস্থা হইল। শ্রীযুত হরিদাস মিত্রই উদ্যোগী হইয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন।

পরদিবস প্রাতে দক্ষিণাকালী দেবীর মরদেহ কলিকাতা হইতে লরীযোগে বেলানগর আনয়ন করা হইল। পথিমধ্যে উহা শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ প্রতিষ্ঠিত রাজা রাজকিষণ স্ট্রীটে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ প্রাঙ্গণে কিছুক্ষণের জন্য নামানো হইয়াছিল। মঠাধ্যক্ষ স্বামী সদাত্মানন্দ এবং সম্পাদক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রভৃতি মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিলেন। অতঃপর বেলা প্রায় নয়টার সময় লরী আসিয়া রঘুনাথপুর পৌঁছিল।

তখন বর্ষাকাল। মধ্যে মধ্যে রীতিমত বর্ষণ হইতেছিল। ইহা উপেক্ষা করিয়াও বহু ভক্ত কলিকাতা হইতে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ও শ্রীযুত হরিদাস মিত্রের সহিত শবানুগমন করিয়াছিলেন বহু ভক্ত ট্রেনযোগে কলিকাতা হইতে এবং অনেকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ হইতে পদব্রজে রঘুনাথপুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভক্তগণ দক্ষিণাকালী দেবীর মরদেহ লইয়া শোকযাত্রা সহকারে রঘুনাথপুর, অভয়নগর এবং গ্রামের সকল পাড়ায় পাড়ায় পরিভ্রমণ করিল। অতঃপর বেলানগর আশ্রম প্রাঙ্গণে সকলের পিতামহী-তুল্যা শ্রদ্ধেয়া দক্ষিণাকালী দেবীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। এই

সময় শ্রীযুত সুবোধ রায় দক্ষিণাকালী দেবীর প্রিয় গানগুলি গাহিতে লাগিলেন।

পিতা সীতানাথ বসুব দেহত্যাগের পর সুদীর্ঘ আটাশ বৎসর-কাল স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ নির্বিবাদে এবং নির্বিচারে জননীর সেবা করিয়াছেন। তাঁহার পরম পূজ্য গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহাবাজ তাঁহাকে রীতিমত আদেশ করিয়া গিয়াছেন, "রবি, তুই মায়েব সেবা করবি। তবেই তোর কল্যাণ হবে।" স্বামী সম্বুদ্ধানন্দও গুরুবাক্য শিরোধার্য করিয়া অকুণ্ঠ চিত্তে মাতৃসেবা করিয়াছেন। অনেক সময় মায়ের ইচ্ছাপূরণের জন্য তিনি নিজের মত-বিরুদ্ধ কাজও করিয়াছেন।

প্রকৃত সেবক কখনও আদেশেব প্রতীক্ষা করে না। যখন যাহা প্রয়োজন তাহা তাহাকে মুখ ফুটিয়া বলিবার পূর্বেই প্রকৃত সেবক নিজে বুঝিয়া নিজ হইতে তাহা করিয়া থাকে। অপর এক প্রকার সেবাও আছে। উহাতে সেবকের মধ্যে একটি ভৃত্যের ভাব পাবিলক্ষিত হয়। আদিষ্ট হইয়া সেবক ভৃত্যের মত সেবা কবে। এই সেবা নিকৃষ্ট সেবা এবং পূর্বোক্ত সেবাই সর্বোৎকৃষ্ট সেবা। কি গুরু সেবাব ক্ষেত্রে, কি মাতৃ সেবার ক্ষেত্রে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ছিলেন যথার্থই প্রকৃত সেবক। জননীর যখন যাহা প্রয়োজন, তিনি মুখ ফুটিয়া না চাহিতেই স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ তাঁহার অভাব মোচন করিয়াছেন। কখনও আদেশের প্রতীক্ষা করেন নাই।

বেলানগর আশ্রমে স্বর্গীয়া দক্ষিণাকালী দেবীর ভাণ্ডারা হইল। ঐদিন দ্বিপ্রহরে এক জনসভায় শ্রীযুত হরিদাস মিত্র প্রভৃতি দক্ষিণাকালী দেবীর পূত চরিত্রের বিষয় আলোচনা করিলেন।

দক্ষিণাকালী দেবীর দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত পত্র দিয়াছিলেন। অতঃপর সভায় উহা হইতে কয়েকটি পাঠ করা হইল।

একটি পত্রে কলিকাতা গাঙ্গুলী বাগান হইতে শ্রীযুক্তা সুষমা দেবী লিখিয়াছেন—"একটি শুদ্ধ পবিত্র ফুল শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে ঝরে পড়ল।"

লতিকা ঘোষ লিখিয়াছেন—"চিরস্নেহময়ী, চিরভক্তিময়ী দিদার মহাপ্রয়াণে তিনি যে কি ছিলেন তাহাই দেখাইলেন এবং রামকৃষ্ণ-লোকে সজ্ঞানে চলিয়া গেলেন।"

ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য লিখিয়াছেন—"শ্রীশ্রীঠাকুরমায়ের দেহ-ত্যাগের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। গীতাপাঠ ও নাম গান করিতেছিলাম। সেদিন আমরা ঠাকুমার মহাপ্রয়াণে বুঝিতে পারিলাম তাঁহার স্বরূপ। তিনি একজন মহাতপস্বিনী ছিলেন,—তাঁহার শেষ শুভমুহূর্তে তিনি যেন উহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। কি অপূর্ব তাঁহার মহাপ্রয়াণ। শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করিতে করিতে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কোলেই আশ্রয় লইলেন। ক্ষুদ্র আমি স্তম্ভিত ও বিস্মিত। বুঝিতে পারিলাম মহাযোগীদের অন্তিম সময়। কি অপূর্ব সেই দৃশ্য! দুঃখ হইল না। নিজেকে ধন্য মনে করিলাম। সেই মহাতপস্বিনী আমার পরমারাধ্যা ঠাকুমা। তাঁহার উদ্দেশ্যে জানাই আমার শতকোটি প্রণাম।"

দুর্গাপুর হইতে শ্রীমতী নিনি ঘোষ লিখিলেন—"ঠাকুরমায়ের স্নেহ আদর ভালবাসা জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। দুর্গাপুরে যে অল্প কয়েকদিন তাঁহার সেবা আমরা করিতে পারিয়াছি, ইহাতে আমরা ধন্য হইয়াছি, মনে করি। ছেলেবেলাও ঠাকুমাকে দেখিয়াছি, এখনও দেখিলাম। তিনি সকলকেই সমানভাবে ভালবাসিতেন। দেখিয়াছি তাঁর সুন্দর অনাড়ম্বর জীবন। দেখিতেও কি সুন্দর ছিলেন তিনি! সদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতেন। সাদা কাপড় পরিতেন ছোট বালিকাটির মত। মনে হইত, তাঁহার ভিতর হইতে একটি রূপ ফুটিয়া বাহির হইত—অপূর্ব! আমার পরম আরাধ্য গুরুদেবের জননী, আমাদের

সকলের ঠাকুমা—তিনি পরম ভাগ্যবতী এমন সন্তান পেটে ধরিয়াছেন। তিনি ধন্যা। তাঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই।"

জামসেদপুর হইতে অধ্যাপক শিবদাস মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন —"আপনার মত গুরুগত প্রাণ যোগীর মাতা সাধারণ হইতে পাবেন না। তাঁহার উর্দ্ধগতি হইবেই। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে কাছে লইয়াছেন, সেইজন্য মহাযোগীর মত তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আপনার মত আপামব সাধারণে সমান ব্যবহাব—আমি আর কোথাও দেখিনি।······শ্রীভগবানের নিকট আপনার আসন প্রতিষ্ঠিত। আপনার ঐকান্তিক মাতৃসেবা ও গুরুসেবা আপনাকে মহান কবিয়াছে।"

সভাব শেষে মধ্যাহ্নে আশ্রমেব উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বসাইয়া প্রায় চারি সহস্র ব্যক্তিকে খিচুড়ি, লুচি, তরকারি, চাটনি, মিঠাই প্রভৃতি প্রসাদ বিতরণ হয়। বর্ষাকাল। তখন ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টি হইতেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, উহাতে কাহারও আহারে ব্যাঘাত হয় নাই। একদল পংক্তিতে বসিয়াছে আর বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। তাহাদের আহার শেষ হইলে আবার কিছুক্ষণ বৃষ্টি হইয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া বেলানগরের রবীন্দ্রনাথ ঘোষ মন্তব্য করিয়াছিলেন, "এ যেন ঠিক মহাসাধক বামাক্ষ্যাপার মাতৃশ্রাদ্ধের মত ব্যাপার। এমন অলৌকিক ঘটনা আমি জীবনে কখনও দেখিনি, আজই দেখলাম।"

সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্তা সুমতি দেবী রামায়ণ গান গাহিলেন। তাঁহার এই রামায়ণ গান সম্পর্কেও একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। শ্রীযুক্তা সুমতি দেবী একদিন রাত্রিতে নিদ্রাকালে স্বপ্ন দেখিলেন, এক বিধবা মহিলা যেন তাঁহাকে রামায়ণ গাহিতে বলিতেছেন আর তিনি এক ঠাকুর মন্দিরের সম্মুখে বসিয়া রামায়ণ গান গাহিতেছেন। তাঁহার এই স্বপ্ন দর্শনের দুই

একদিন পরেই বেলানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে তাঁহার নিকট রামায়ণ গানের প্রস্তাব লইয়া যাওয়া হয়। আশ্রমের এই ব্যক্তির নিকট সমুদয় শুনিয়া তাঁহার স্বপ্নের কথা মনে পড়িল। শ্রীযুক্তা সুমতি দেবী তৎক্ষণাৎ উহাতে সম্মতি দান করিলেন।

১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের শেষ দিকে কাশীধামেব মণিকর্ণিকা ঘাটে, প্রয়াগে ত্রিবেণী-সঙ্গমে, হরিদ্বাবে ব্রহ্মকুণ্ডে, গঙ্গার নীল ধারার নীল জলে, হৃষিকেশের ত্রিবেণী ঘাটে স্বর্গীয়া দক্ষিণাকালী দেবীর পূতাস্থি বিসর্জিত হয়।

অতঃপর ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পুরীধামে সমুদ্রেও ঐ পূতাস্থি বিসর্জিত হয়। সন্ন্যাসী পুত্র স্বামী সম্বুদ্ধানন্দই ঐ সকল তীর্থে গমন করিয়া পূতাস্থি বিসর্জন দিয়া আসিয়াছেন।

স্বর্গীয়া দক্ষিণাকালী বসুর শ্মশান ভূমিতে তদীয় দৌহিত্রদ্বয় শ্রীকালীপদ গুহ ও শ্রীবিনয় কুমার গুহ পরবর্তী কালে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসবের দিন শ্রীযুক্তা কমলপ্রভা মিত্র মহাশয়া ঐ সমাধিমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। এই সমাধিমন্দিরের অভ্যন্তরে শ্মশান-দেবতা দেবাদিদেব মহেশ্বরের একটি ধ্যানস্থ মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দিবস শ্রীযুত সুবোধ রায় নিম্নলিখিত স্বরচিত গানখানি গাহিয়া স্বর্গীয়া দক্ষিণাকালীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন,—

"তুমি আর নাই একথা ভাবিতে
শেলসম ব্যথা বাজে।
চিরজাগ্রত হয়ে আছ তুমি
সকল জনের মাঝে॥
আজ তোমার পুণ্য স্মৃতির বাসরে
সুর আছে ভাষা নাই,

তাই তো নীরবে এ দুঃখ পাসরি
প্রণাম জানায়ে যাই ॥
তব হাসি মাখা মুখখানি
আজো মনে পড়ে প্রতিক্ষণে ক্ষণে
সকল কাজের মাঝে ॥”



পবিত্র দন্তমন্দির (বেলানগর)

২৮শে ডিসেম্বর ১৯৩৬, সোমবার, বিখ্যাত দন্ত চিকিৎসক ডাঃ আর আমেদ স্বামী অভেদানন্দের একটি দাঁত তোলেন। স্বামিজীর সেবক-শিষ্য, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ তাঁহার নিকট দাঁতটি লইবার জন্য প্রার্থনা করিলে স্বামিজী মহারাজ স্মিতহাস্যে শিষ্যকে বলেন—'তুই কি আমার দাঁতের মন্দির করবি? সিংহলের ক্যাণ্ডীতে যেমন বুদ্ধদেবের দন্ত মন্দির আছে।' স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের হৃদয়-তন্ত্রীতে তখন শ্রীমুখের এই বাণী যে ঝঙ্কার ও প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল, তাহারই বাস্তব রূপায়ণ হইয়াছে বেলানগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে।



প্রার্থনা ও প্রণামরত



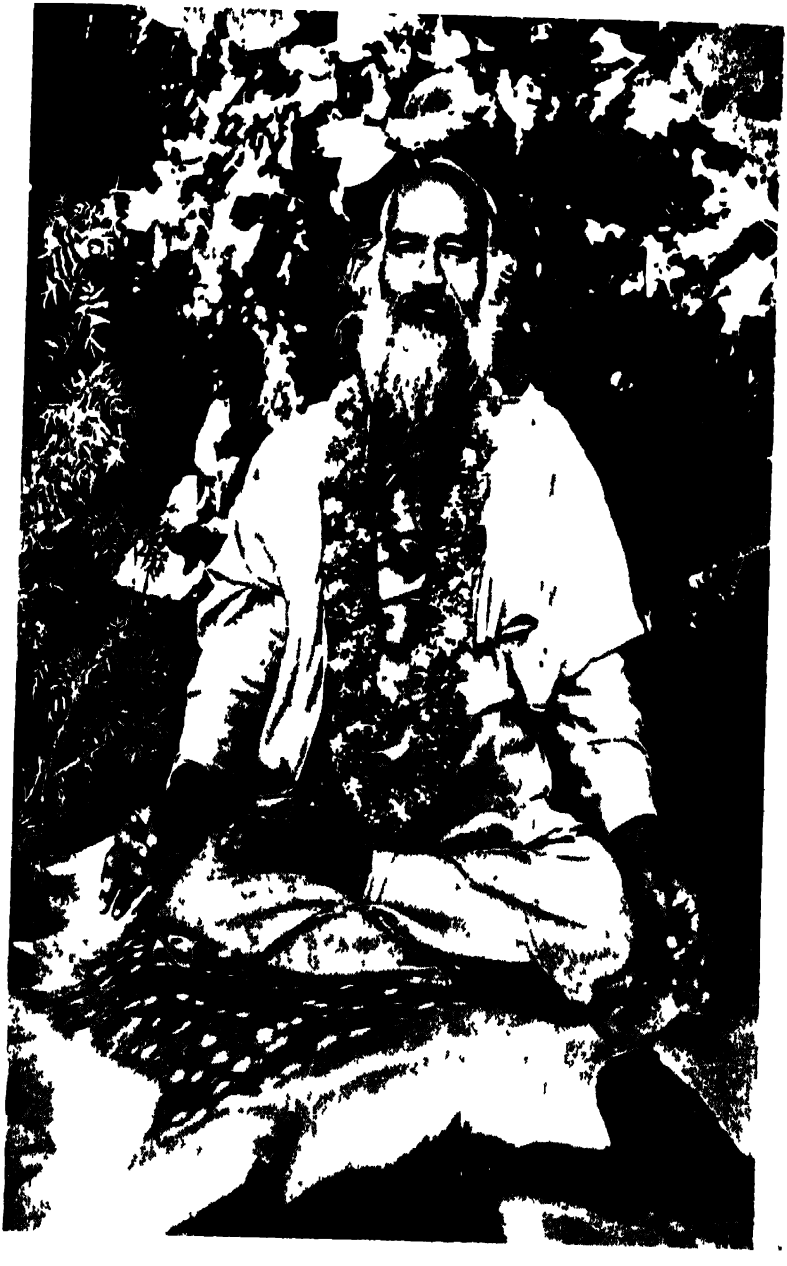
পবিত্র দন্ত মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী
সদাত্মানন্দজী (দক্ষিণ পার্শ্বে) এবং সমাগত অন্যান্য সন্ন্যাসীসহ



বেলানগব বেল স্টেশন উদ্বোধন। বাম হইতে—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, মেজব জেনাবেল শাহ নেওযাজ খান শ্রীযুত হবিদাস মিত্র এবং পূর্ব বেলওযেব জেনাবেল ম্যানেজাব শ্রীযুত কৃপাল সিং



পবিত্র দন্তমন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে সমাগত কতিপয় মহিলা ভক্তবৃন্দসহ



বেলানগর আশ্রমে পঞ্চবটীতে



দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু
(শ্রীযুক্তা লালিমা বসুর সৌজন্যে ছবিখানি প্রাপ্ত)



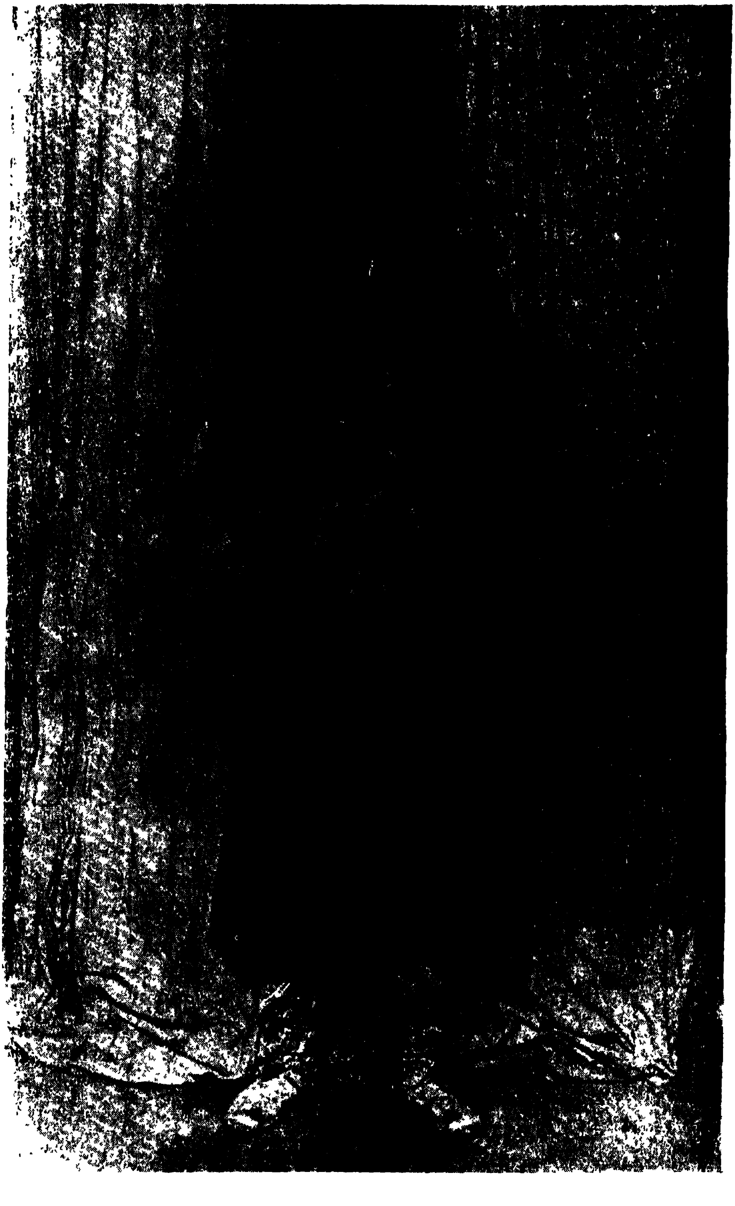
স্বামী সম্বুদ্ধানন্দেব মানস কন্যা শ্রীমতী বেলা মিত্র, শ্রীযুত হবিদাস মিত্রেব সহধর্মিণী। ইঁনি নেতাজীব অগ্রজ শ্রীযুত সুবেশচন্দ্র বসুব জ্যেষ্ঠা কন্যা। ই হাব স্মৃতিতেই হাওড়া জেলাব পূর্ব বেলওযেব অন্তর্গত বেলানগর গ্রাম এবং বেলানগব স্টেশন স্থাপিত



শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ মন্দিরের দ্বারদেশে



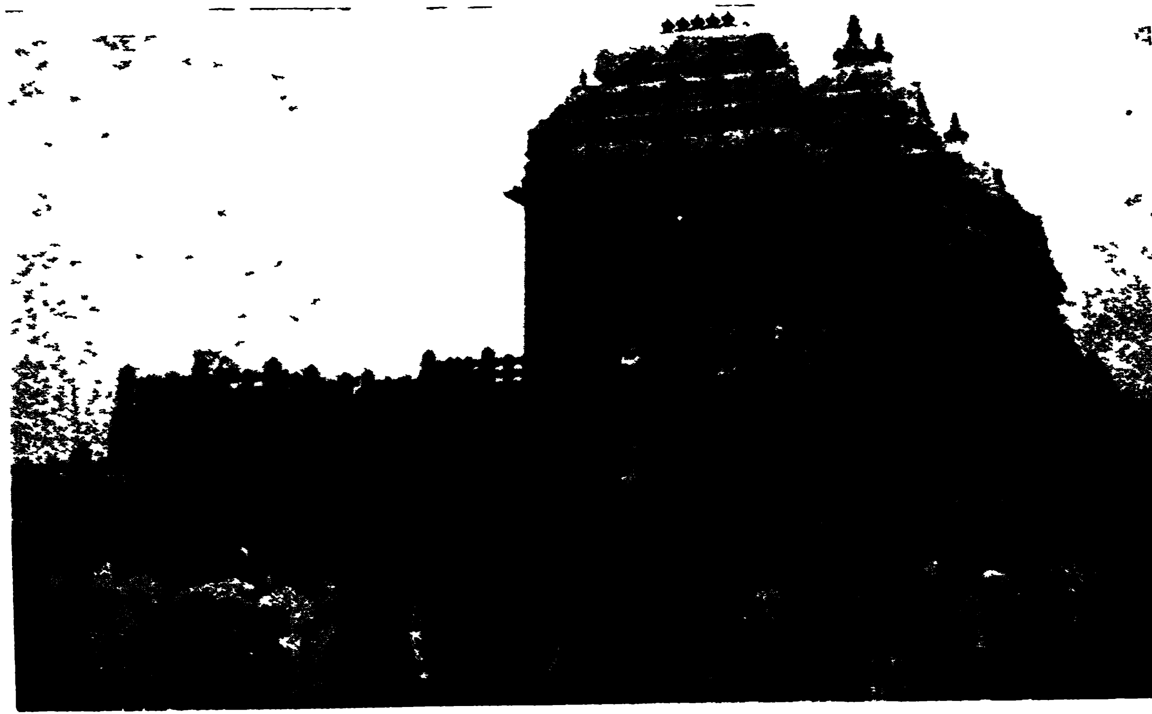
গোমুখীতে সন্ন্যাস গ্রহণ



তিব্বতে



দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের উত্তর পার্শ্বের বারান্দায় জননী এবং ভগ্নীসহ



বিবেকানন্দ শিলায় বিবেকানন্দ মন্দির



আবব সাগব—ভাবত মহাসাগব এবং বঙ্গোপসাগবেব সঙ্গমে স্নানবত



কন্যাকুমাবিকায বিবেকানন্দ শিলায বিবেকানন্দ মন্দিবে সহযাত্রী শ্রীমতী শ্যামাসুন্দবী শ্রীমতী নিভা, শ্রীমান সমবেশ ও শ্রীমান শৈলেন সহ



কোলাবা বীচে (ত্রিভেন্দ্রাম) সহযাত্রী ভক্তবৃন্দসহ



মহাবলীপুরম্ সমুদ্রতীরে শ্রীমান শৈলেন, শ্রীমতী নিভা ও শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরীসহ



ত্রিভেন্দ্রাম এ্যাকুরিয়াম সংলগ্ন উদ্যানে ভক্ত শ্রীসমরেশ সাহা সহ

২১

"তুই কি আমার দন্তমন্দির করবি? সিংহলের ক্যাণ্ডিতে যেমন বুদ্ধদেবের দন্তমন্দির আছে!"—হয়ত বা সেদিন পরিহাস-চ্ছলেই শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তদীয় সেবক-শিষ্য স্বামী সম্বুদ্ধানন্দকে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন; কিন্তু মহাগুরুর শ্রীমুখের এই দিব্যবাণী মহাশিষ্যের মনকে সেদিন ভীষণভাবে আলোড়িত করিয়াছিল এবং হয়ত-বা স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ইঙ্গিত এই মহাবাক্যের মধ্যে লাভ করিয়াছিলেন। শিষ্য স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ যেন সেদিন তদীয় গুরু শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নিকট হইতে সসঙ্কোচে তাঁহার উৎপাটিত দন্তটি গ্রহণ করিয়া দন্তমন্দির নির্মাণের বিষম দায়ে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন।

বেলানগরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এতদিনে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজের সেই দায় হইতে মুক্ত হইবার সময় ও সুযোগ হইল। এইবার তিনি তাঁহার পরিকল্পিত পবিত্র দন্তমন্দির নির্মাণ-কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। শ্রীশ্রীসর্বমঙ্গলার মন্দির সংলগ্ন পশ্চিম দিকের জমিতে পবিত্র দন্তমন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ হইল। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর ভক্ত শিষ্য শ্রীযুত কালীপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই মন্দিরের প্ল্যান করিয়া দিলেন। ভক্তগণ মুক্তহস্তে এই মন্দিরের জন্য অর্থ প্রদান করিতে লাগিলেন। মন্দির নির্মাণে প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

পবিত্র দন্তমন্দিরের অভ্যন্তরে তিনটি উচ্চ বেদী নির্মিত হইল। মধ্যস্থলে অবস্থিত বেদীটির ঠিক সম্মুখেই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অপর একটি শ্বেত প্রস্তরের বেদী নির্মিত হইল। শ্বেত প্রস্তরের এই বেদীর অভ্যন্তরে একটি রৌপ্য পাত্রে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর পবিত্র দন্ত, পূতাস্থি, কেশ প্রভৃতি রক্ষিত করিবার ব্যবস্থা হইল। দন্তবেদী সংলগ্ন মধ্যস্থানের উচ্চ বেদীতে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও শ্রীশ্রীমা সাবদা দেবীর দুইখানি প্রতিকৃতি এবং দুই পার্শ্বের দুই বেদীতে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহাবাজদ্বয়ের প্রতিকৃতি রক্ষিত হইল।

১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দেব ৫ই নভেম্বর নবনির্মিত পবিত্র দন্তমন্দিরে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পূতাস্থি, কেশ ও পবিত্র দন্তের প্রতিষ্ঠা করা হইল। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ স্বহস্তে পবিত্র দন্তটিকে সর্বতীর্থের বাবি, মানস-সরোবরের বারি প্রভৃতি দ্বারা স্নান করাইয়া পূজা ও আরতি করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন। ঐ দিনই ৺সর্বমঙ্গলার মন্দির হইতে স-পার্ষদ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেব ও শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীকে দন্তমন্দিরে আনয়নপূর্বক প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৬ই মার্চ, ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দ।

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জন্মশতবর্ষে এই দিবস বেলানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পুণ্য জন্মোৎসব পালন করা হয়। প্রায় চারিমাস পূর্বে পবিত্র দন্তমন্দির স্থাপিত হইলেও এই জন্মোৎসব উপলক্ষেই উহার আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা এবং দন্তমন্দিরে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রমাণ-আকৃতির মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ভারতবর্ষে কোনও মহাপুরুষের দন্তমন্দির প্রতিষ্ঠা এই প্রথম। কেবলমাত্র সিংহলের ক্যাণ্ডি সহরে এই জাতীয় মন্দির, বুদ্ধদেবের দন্তমন্দির, দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে এইরূপ মন্দির

অদ্বিতীয় এবং সমগ্র বিশ্বে ইহা তৃতীয়রহিত। সুতরাং বেলানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে পবিত্র দন্তমন্দিরটির বিশেষ একটি ঐতিহাসিক মূল্য এবং মর্যাদা রহিয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত নরনারী এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, ভারত সরকারের প্রাক্তন উপমন্ত্রী, আজাদ হিন্দ ফৌজের মেজর জেনারেল শাহ্ নাওয়াজ খান্, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং বর্ধমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার প্রধান অধ্যাপক ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় এই উৎসবের সাফল্য কামনা করিয়া শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন। এই উৎসবে শ্রীযুত সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের প্রধান অতিথি এবং ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈদিক স্তোত্র পাঠ করিবার কথা ছিল। কিন্তু ঐদিন সকালে বর্ধমানে হাঙ্গামা হওয়ায় যানবাহন বন্ধ থাকে বলিয়া তাঁহারা এই উৎসবে যোগদান করিতে না পারিয়া টেলিফোনে তাঁহাদের শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন।

এই উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল কালী তপস্বীর পবিত্র দন্তমন্দিরের উদ্বোধন। শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের অন্যতম সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সদাত্মানন্দ মহারাজজী শত প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া কালী তপস্বীর পবিত্র দন্তমন্দিরের উদ্বোধন করেন। অতঃপর তিনি মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কালী তপস্বীর পবিত্র দন্তবেদীতে এবং ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।

অতঃপর সভার কার্য আরম্ভ হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাখার প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক

ডক্টর অধরচন্দ্র দাস এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন হাওড়া গার্লস কলেজের উপাধ্যক্ষ শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্তী।

এই সভায় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ বলেন যে, "যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী অভেদানন্দের স্মৃতি স্মরণে প্রতিষ্ঠিত এই শান্ত আশ্রম প্রাঙ্গণে আজ আমরা যে উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছি, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তা' অভিনব। স্বামী অভেদানন্দের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘরূপে এই নবমন্দিরে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে, তাঁর বেদীমূলে স্বামী অভেদানন্দজীর একটি দাঁত সযত্নে রক্ষার মাধ্যমে এই পরম পবিত্র দন্তমন্দির প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সিংহল দেশের ক্যাণ্ডি সহরে ভগবান তথাগতের দন্তমন্দির স্থাপনের সঙ্গেই শুধুমাত্র তুলনা করা যায়। স্বাধীনতার স্বল্পকাল মধ্যে বুদ্ধদেবের শিষ্য সারিপুত্ত ও মদ্‌গলায়নের অস্থি লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম্ থেকে এনে সাঁচিতে যেদিন রক্ষা-ব্যবস্থা হয়েছিল, সেদিন তা' প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ আমার জীবনে হয়েছিল। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন-বর্ষে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করছে। ভারতবর্ষ আবার যেদিন নিজের স্বকীয়তায় পরিপূর্ণ বিকশিত হয়ে আপনাকে উপলব্ধি করবে, আজিকার এই প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণ হবে সেদিন। সেদিন এই মন্দির প্রাঙ্গণ ভারতবর্ষের মহান তীর্থ-ক্ষেত্রে পরিণত হবে,—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

সে আজ ত্রিশ বছরের কথা, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ আর. আমেদ স্বামী অভেদানন্দজীর একটি দাঁত তুললে, সেদিন তরুণ সেবক আমি, অতি লোভীর মত দুই হাত পেতে সশ্রদ্ধায় তা' সংগ্রহ করে রাখি। মৃদু হেসে গুরুদেব এর উদ্দেশ্য জান্‌তে চেয়েছিলেন। মুখে সেদিন তা' বলি নাই; ত্রিশ বছরের শ্রদ্ধালালিত সেই অনির্বাণ দীপশিখার আজ সার্থক রূপায়ণ।

যে মহিয়সী মহিলার আত্মত্যাগ ও কর্মপ্রচেষ্টার স্মৃতি বিজড়িত

করে এই গ্রাম ও রেলস্টেশনের নামকরণ আমি করেছি, সেই কন্যাসমা আমার একান্ত প্রিয় শিষ্যা সাবিত্রীলোকে-প্রয়তা শ্রীমতী বেলাকে আজিকার এই অনুষ্ঠানে স্মরণ করি। বেলার সহসা লোকান্তর ঘটলে, তারই বিশেষ আগ্রহ ও ইচ্ছাকে রূপদান করার মানসে সেদিনের জনহীন বিজন প্রান্তরে, অতি নিরালায় এই পল্লী পরিবেশে আমি আশ্রম প্রতিষ্ঠার কাজ সুরু করি। মনে পড়ে, পাটকাঠির বেড়া-ঘেরা ছোট একটি চালা ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা আর স্বামিজীদের পট মাথায় এনে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। তারপর তাঁদেরই একান্ত আশীর্বাদে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে পাওয়া এই জমির উপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে নিজস্ব বাড়ীতে অবৈতনিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্থাপিত হয়েছে যোগেন্দ্রনাথ মিত্র স্মৃতি দাতব্য চিকিৎসালয়, এ ছাড়া ব্রহ্মানন্দ কুটীরে অভেদানন্দ পাঠাগার, আশ্রমের দরিদ্র ছাত্রাবাস, নির্মিত হয়েছে মা সর্বমঙ্গলার নাটমন্দির, অভেদানন্দ মঞ্চ, হেমলাল স্মৃতি কুটীর, দক্ষিণাকালী স্মৃতি মন্দির, সত্যকিঙ্কর-শুভঙ্করী ভবন।—এ সকলই ভক্তজনের দানে প্রতিষ্ঠিত। এমন কি এই আশ্রমের দৈনন্দিন সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছেন নানা অঞ্চলের সাধারণ মানুষ।

এই পবিত্র দন্তমন্দির প্রতিষ্ঠায় যারা অর্থে-সামর্থ্যে, সহানুভূতিতে, শ্রমদানে সহায়তা করেছেন, তা যত ক্ষুদ্রই হোক, তাঁদের সকলকেই আশ্রমের পক্ষ থেকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের অধ্যক্ষ স্বামী সদাত্মানন্দ মহারাজজী এই মন্দির-উদ্বোধনে এখানে উপস্থিত হয়ে আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর অধরচন্দ্র দাস আজিকার অনুষ্ঠানে সভাপতি এবং কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেছেন। এঁদের সকলকেই আমি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।”

অতঃপর স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ তদীয় গুরু শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম জ্ঞাপন করিয়া বলেন, "আজ তোমার জন্মশতবার্ষিকীর শুভক্ষণে আমাদের প্রণতি গ্রহণ করো স্বামিজী। বহুকণ্ঠের কলমন্দ্রিত প্রার্থনায়, সহস্রের বন্দনায় বন্দিত তুমি। তীর্থময় তোমার নবমহোল্লাস, প্রাণময় দীপ্ত তোমার তেজ সঞ্চার। দীক্ষা গুরু হে কাণ্ডারী! প্রমুক্ত সত্যদর্শী হে ঋষি! তুমি আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করো, আশীর্বাদ করো।"

পবিত্র দন্তমন্দির প্রতিষ্ঠার পর জামসেদপুরের অধ্যাপক শ্রীশিবদাস মুখোপাধ্যায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দকে পত্রে লিখেন,—

"শ্রীগুরুদেবের আদেশ মত আপনি যে মহৎ কার্য করিতেছেন, তাহাই গুরুভক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আপনার গুরুভক্তির তুলনা নাই। আপনি অবতার-পার্ষদের অশেষ প্রিয়পাত্র। আপনার কার্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া সর্বদেশে ব্যাপ্ত হউক।

শ্রীরামকৃষ্ণ আন্দোলনে আপনি একটি নতুন জিনিস দান করিলেন,—"দন্ত মন্দির"। শ্রীরামকৃষ্ণ ইতিহাসে ইহা অভিনব সংযোজন ও ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের সহায়ক। Simple mind devotion কি বিরাট কাজ করিতে পারে, আপনি তাহা প্রকাশ করিলেন। আমার অশেষ শ্রদ্ধা জানিবেন। April মাসে আমরা সকলে যাইয়া আপনার প্রতিষ্ঠিত মন্দির দেখিব ও পূজা দিব। আপনার সাদর আমন্ত্রণে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি। প্রভু আপনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ রাখুন,—ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা করিতেছি। আপনি বহুজনের আশ্রয় হইয়া সকলের কল্যাণ করুন। সতত আপনার আশীর্বাদ প্রার্থী।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের অন্যতম প্রিয় শিষ্য শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীযুত শ্যামসুন্দর কুমার মহাশয় তদীয় পিতা-মাতার পুণ্য স্মৃতি রক্ষার্থে বেলানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে "সত্যকিঙ্কর-শুভঙ্করী অতিথি ভবনটি" নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী এই অতিথি-ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের অন্যতম গৃহীশিষ্য পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অকালে দেহত্যাগ করিলে তদীয় পত্নী শ্রীযুক্তা অম্বালিকা দেবী তাঁহার লোকান্তরিত স্বামী স্মৃতি রক্ষার্থে আশ্রম প্রাঙ্গণে একটি কুটীর নির্মাণ করিয়া দেন। এই কুটীরের নাম "প্রেমানন্দ কুটীর"। আশ্রম-অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর এই কুটীরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন।

বেলানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাবধি আশ্রম-অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ যে ঘরখানিতে অবস্থান করিতেন, সেই ঘর-খানিতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায়, তাঁহার জন্য অপর একটি গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা বহু দিন যাবৎ অনুভূত হইতেছিল। এইবার তাঁহার ব্যবহারের জন্য নূতন একটি গৃহ নির্মিত হইল। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের ঋষিতুল্য পিতৃদেব ৺সীতানাথ বসু মহাশয়ের নামানুসারে নবনির্মিত এই কুটীরের নামকরণ হইল "সীতানাথ কুটীর"।

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা মার্চ ঐ গৃহে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও চণ্ডীপাঠ করিয়া পরদিন হইতে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ঐ গৃহ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন।

২২

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের মে মাস হইতে প্রায় দেড় বৎসরকাল স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ বেলানগর আশ্রমে নির্জনবাস করেন। এই সময় তিনি কখনও বেলানগর গ্রামের বাহিরে গমন করেন নাই। শেষের দিকে তিনি কিছুকাল মৌনাবলম্বনও করিয়াছিলেন। এই দেড় বৎসর কাল তিনি গভীর তপস্যায় অতিবাহিত করেন।

দেড় বৎসর কাল বেলানগরে নির্জনবাসের পর স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ জামসেদপুরের ভক্তগণের বিশেষ অনুরোধে তথায় গমন করেন।

সেই সময় একদিন, ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৬, তিনি জামসেদপুর সোনাড়ীতে শ্রীযুত বিধুভূষণ ধর ও শ্রীমতী হেনারাণী ধরের বাড়ীতে সন্ধ্যার সময় দুই ঘণ্টা গীতা পাঠ, আলোচনা এবং ব্যাখ্যা করেন। তৎপর সোনাড়ীর শ্রীমতী অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় একটি ধর্মসঙ্গীত করেন। সেই গানখানি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের খুব ভাল লাগে। তিনি গায়িকাকে গানখানি পুনরায় গাহিতে বলেন। অঞ্জলি গানখানি তখন বার দশেক গাহিলেন। তাঁহার সুকণ্ঠের ঐ সঙ্গীত শ্রবণে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। গানখানি এইরূপ,—

"শ্যামা শ্যাম দুটি নাম
একই তারে বাঁধা আছে ;
শ্যাম শ্যামা, কালী কালা—
সবই এক মোর কাছে।

কালীরে সাজাই কালা
কালারে সাজাই কালী ;
কালী পরে পীত ধড়া,
খড়্গ ধরে বনমালী।

নবরূপে নব সাজে
হৃদিমন্দিরে বাজে ;
কারে রেখে কারে দেখি,
একে দুই মিশে আছে
শ্যাম শ্যামা দুটি নাম ॥”

বহুক্ষণ পরে সমবেত ভক্তগণ কীর্তন করিয়া তাঁহার সমাধি ভঙ্গ করেন।

ইহার কয়েকদিন পরেই শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের আবির্ভাব উৎসব আসিয়া পড়িল। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ এইবার জামসেদপুরে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া স্থানীয় ভক্তগণ এই উৎসব বিশেষ জাঁকজমকের সহিত করেন। এতদুপলক্ষে ৫ই অক্টোবর জামসেদপুরের রুক্মিণী মন্দিরের হলটি ভাড়া লওয়া হয় এবং তথায় এক মহতী জনসভা হয়। ঐ জনসভায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের ভাষণ অপূর্ব হইয়াছিল।

সেই ভাষণ শ্রবণে স্থানীয় অধ্যাপক শিবদাস মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, “আমার বহু সৌভাগ্য যে আমার অশেষ শ্রদ্ধাভাজন senior (প্রবীণ) গুরুভ্রাতা স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের ভাষণ শুনতে পেলাম বহুদিন পরে। রুক্মিণী মন্দিরে আমার গুরুজীর 104th. birthday celebration-এর (১০৪ তম জন্মোৎসব) সভায়। সবটাই যেন শ্রদ্ধেয় ঋষি মহারাজের deep devotion-এর outcome (সুগভীর ভক্তির ফল)। কত লোক এল কোথা থেকে। কি আনন্দ হল। কত গান হল। প্রখ্যাত প্রচারক

ভূমানন্দ বললেন। শেষে রবি মহারাজ বললেন। তাঁর সব শব্দ-গুলো যেন surcharged with power (শক্তির দ্বারা পূরিত)। এটা হচ্ছে powèr of conviction (প্রত্যয়ের শক্তি)। শক্তি-প্রবাহ খেলে গেল। গুরুভক্তির ফলে, গুরুসেবার ফলে গুরুর শক্তি প্রবাহাকারে সব ভাসিয়ে যাচ্ছে। মহাশক্তির খেলা দেখলাম। ধন্য রবিদা, ধন্য আমি, আপনাব স্নেহ পাচ্ছি! আপনার মাধ্যমে শ্রীগুরুর শক্তি সারা ভারতবর্ষে প্লাবন আনুন। শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের অনন্ত বিজয়।”

উক্ত ভাষণ শ্রবণে পার্শীকলোনীর Mr. Rusi R. Mabgamwalla লিখিয়াছিলেন, “It is seldom, now-a-days, to hear the name of Swami Vivekananda and Swami Abhedananda taken with such fervour to remind us that real man lies within, that if man develops love for the devine, man will naturally develop love for every body around. It was really a fortunate opportunity for me to hear Ravi Maharaj's message on his Guru's Birthday celebration which was held at the Rukmini Temple on 5th October,

২৩

ভারতের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত কন্যাকুমারী সহরটি একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এইস্থানে মন্দিরাভ্যন্তরে দেবী কন্যাকুমারী জপমালা হস্তে পূর্বাস্য হইয়া দণ্ডায়মান।

কথিত আছে, একদা দানবরাজ বাণাসুরের অত্যাচারে পৃথিবীতে ন্যায়ধর্ম লোপ পায়। ইহার প্রতিকারকল্পে দেবতা ও ঋষিগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে পরাশক্তির আরাধনা করিতে বলিলেন। তাঁহাদের তপস্যায় দেবী প্রসন্ন হইলেন এবং স্বয়ং কুমারীমূর্তি ধারণপূর্বক সাগরমধ্যস্থ শিলাখণ্ডের উপর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

দেবী কন্যাকুমারী বিবাহযোগ্যা হইলে দশ মাইল দূরবর্তী সুচিন্দ্রম্ মন্দিরের শিবের সহিত তাঁহার বিবাহের বন্দোবস্ত হয়। শিবের অনুমতি লইয়া বিবাহের দিন স্থির হইল।

এদিকে দেবর্ষি নারদ দেখিলেন, ইহাতো ঠিক হইতেছে না। কারণ তিনি বিষ্ণুর নিকট শুনিয়াছেন যে, বাণাসুর কেবলমাত্র কুমারীর বধ্য। নারদ কৌশলে এই বিবাহ পণ্ড করিতে মনস্থ করিলেন।

বিবাহের দিন সুচিন্দ্রম্ মন্দিরের শিব সন্ধ্যাবেলা বরবেশে বিবাহ করিতে যাত্রা করিলেন। মধ্যরাত্রে বিবাহ-লগ্ন।

শিব যখন গন্তব্যস্থল হইতে মাত্র তিন মাইল দূরে পৌঁছিলেন, নারদ তখন কাকের রূপ ধারণপূর্বক পথিপার্শ্বে একটি বৃক্ষে বসিয়া

"কা" "কা" রবে ডাকিতে লাগিলেন। কাকের ডাক শুনিয়া ভোলানাথ শিব মনে করিলেন, তবেতো ভোর হইয়া গিয়াছে! বিবাহ-লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে! এখন আর যাইয়া কি হইবে! ভোলানাথ শিব সেইস্থান হইতেই প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এদিকে শিব না আসায় দেবী কন্যাকুমারীর আর বিবাহ হইল না। তদবধি দেবী কন্যাকুমারী—কুমারীই রহিলেন।

কালক্রমে বাণাসুর কন্যাকুমারীর রূপের খ্যাতি শুনিয়া তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন। কন্যাকুমারী সেই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিলে বাণাসুর ক্রুদ্ধ হইয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তথায় আসিয়া দেবীকে বলপূর্বক বিবাহ করিতে চাহিল। কন্যাকুমারীর সহিত বাণাসুরের ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে দেবী বাণাসুরকে বধ করিলেন।

সাগরমধ্যে যে শিলাসনে বসিয়া দেবী কন্যাকুমারী তপস্যা করিয়াছিলেন, তদুপরি দেবীর পদচিহ্ন অদ্যাবধি বিদ্যমান।

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসংবরণের পরে বিভিন্নস্থানে তপস্যাদি করিয়া সমগ্র ভারত পর্যটনান্তে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ কন্যাকুমারী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইহা ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের কথা। তিনি দেবী কন্যাকুমারীর মন্দিরে মাকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন। অতঃপর তটভূমি হইতে প্রায় দুই ফার্লং (৪৪০ গজ) দূরে সমুদ্রবক্ষে অবস্থিত দেবী কন্যাকুমারীর পদরেণুপূত শিলাখণ্ডে তিনি সাঁতরাইয়া উপস্থিত হন। নৌকা ভাড়া করিয়া যাইবার মত পয়সাও তখনও তাঁহার নিকট ছিল না।

তথায় পৌঁছিয়া উত্তরাস্য, অর্থাৎ ভারতবর্ষের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া ভারতের তদানীন্তন দুর্দশার কথা এবং যে মহাকার্যের গুরুভার শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে দিয়া গিয়াছিলেন, কি প্রকারে উহা সম্পন্ন করিবেন, তাহার কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বামী বিবেকানন্দ

গভীর ধ্যানে মগ্ন হন। আর তখনই ভারতের অতীত গৌরবের, তাহার বর্তমান দুরবস্থার এবং তাহার ভবিষ্যৎ মহিমার উজ্জ্বল চিত্র তাঁহার মানস পটে উদ্ভাসিত হয়। আর সেই সঙ্গে তিনি লাভ করেন ভারতের এবং জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য সুস্পষ্ট পথের ইঙ্গিত। এই ধ্যানাসনে বসিয়াই তিনি স্থির করেন যে, ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার চিকাগো শহরে যে ধর্ম মহাসভার অনুষ্ঠান হইবে, তাহাতে তিনি যোগদান করিবেন। ইহাতে দুইকার্য একসঙ্গে হইবে। রাজসিকতায় চঞ্চল পাশ্চাত্যে আধ্যাত্মিকতার বীজ বপন করাও হইবে, এবং ভারতবাসীকে জাগাইবার জন্য সর্বপ্রথম যাহা প্রয়োজন সেই আত্মবিশ্বাসের, নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসের উদ্বোধনও করা হইবে।

সুতরাং ভারতের নবজাগরণের এবং সমগ্র বিশ্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচারের সহিত এই শিলাটির স্মৃতি বিশেষ ভাবে জড়িত। এই জন্য জনসাধারণের মধ্যে শিলাটির নূতন নামকরণ হয় "বিবেকানন্দ শিলা।" সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে শিলাটির সর্বোচ্চ উচ্চতা প্রায় ৫৫ ফুট। এই শিলাটির পার্শ্বে অপর একটি ছোট শিলাও রহিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব পালনের এবং তাহার অঙ্গরূপে এই শিলার সহিত বিজড়িত স্বামিজীর পুণ্যস্মৃতিকে স্থায়ী রূপদানের সঙ্কল্প করিয়া ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে "স্বামী বিবেকানন্দ সেন্টিনারী সেলিব্রেশন এণ্ড বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়্যাল কমিটি" গড়িয়া উঠে। এই কমিটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ঐ বিবেকানন্দ শিলার উপর একটি মন্দির নির্মাণপূর্বক তথায় স্বামী বিবেকানন্দের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা।

সমগ্র পরিকল্পনাটির মোটামুটি তিনটি অংশ ছিল, "বিবেকানন্দ মণ্ডপম" ও "শ্রীপাদমণ্ডপম" নির্মাণ এবং তটভূমি হইতে শিলাখণ্ডে গমনাগমনের জন্য পারাপারের ব্যবস্থা করা। যেখানে দেবী

কন্যাকুমারী তপস্যা করিয়াছিলেন, তথায় শিলাখণ্ডের উপর তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের চিহ্ন আছে। ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই বিবেকানন্দ মণ্ডপের সম্মুখে এই শ্রীপাদমণ্ডপের পরিকল্পনা করা হয়।

বিবেকানন্দ শিলার সর্বোচ্চ দেশে বিবেকানন্দ মণ্ডপম স্থাপিত হইয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে মন্দিরের বিবেকানন্দ শিলায় মন্দিরের পরিকল্পনা ও নির্মাণ-স্থপতির কার্য করিয়াছেন শ্রীএস. কে. আচারী। মন্দিরাভ্যন্তরে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিটি নির্মাণ করিয়াছেন জে. জে. স্কুল অব আর্টস্-এর ভাস্কর্য শাখার অধ্যাপক শ্রী এন্. এল. সোনাব্দেকর। তলদেশের উচ্চতা ৫৫ ফুট। বিবেকানন্দ মণ্ডপ লম্বায় ১৩০ ফুট, চওড়ায় ৪০ ফুট। ইহার দুইটি অংশ,—গর্ভমন্দির (সভামণ্ডপম্) এবং নাটমন্দির (ধ্যান মণ্ডপম্)। গর্ভমন্দিরের চূড়া বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের চূড়ার অনুরূপ। ইহার শীর্ষদেশের উচ্চতা মন্দিরের তলদেশ হইতে ৬৫ ফুট, সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ১২০ ফুট। গর্ভমন্দিরে ৪ ফুট উচ্চ বেদীতে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজজীর একটি ব্রোঞ্জনির্মিত পরিব্রাজক-মূর্তি স্থাপিত। মূর্তিটি ৮ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চ এবং উহা উত্তর পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান।

নাটমন্দিরের ভিতরের দেওয়ালে স্বামিজীর দিব্য জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার চিত্র রিলিফ করা। মন্দিরটির চারি-দিকেই রোয়াক। গর্ভমন্দিরের পশ্চাতে, মন্দিরতলের নীচের লেভেলে কয়েকটি কক্ষ আছে। তাহারও পশ্চাতে গৃহতলসংলগ্ন একটি চত্বর। এই চত্বরের নীচে মন্দির ও শ্রীপাদমণ্ডপ বেষ্টন করিয়া একটি সমতল রাস্তা আছে। শিলাতল হইতে গড়ানো রাস্তা আসিয়া মিলিত হইয়াছে এই সমতল রাস্তাটির সহিত। এখান হইতে অনেকগুলি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়।

'শ্রীপাদমণ্ডপম্' বিবেকানন্দ মণ্ডপের ঠিক সম্মুখে অবস্থিত।

গর্ভমন্দিরস্থ বিবেকানন্দের মূর্তি হইতে শ্রীপাদমণ্ডপের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত দেবী কন্যাকুমারীর শ্রীপাদচিহ্নের দূরত্ব ২১৯ ফুট।

মন্দির হইতে নাটমন্দিরের সম্মুখের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া ২৫-২৬টি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া নীচে নামিয়া আসিলে একটি চত্বর; নাটমন্দিরের প্রবেশদ্বার হইতে ইহার দূরত্ব ৪৮ ফুট। চত্বরে নামিয়া উহার উপর দিয়া ৬০ ফুট অগ্রসর হইলে শ্রীপাদমণ্ডপে উঠিবার সিঁড়ি। শ্রীপাদমণ্ডপটি বর্গাকার, ৫৪ ফুট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট।

এই বিবেকানন্দ মন্দিরের পাদদেশে দাঁড়াইলে দেখা যায়, অতিদূর দিকচক্রবালে যেন অসীম আকাশ ও অসীম সাগর পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া মিলিত হইয়াছে। অসীম আকাশ পরমাত্মার প্রতীক এবং অসীম সাগর জীবাত্মার প্রতীক। আর স্বামী বিবেকানন্দ যেন ভারতের মূলভূখণ্ড হইতে কিঞ্চিৎ প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া সমগ্র জগদ্বাসীকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,

"হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।"

কারণ,

"হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা ওঙ্কারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।"

বিগত ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ শিলায় নবনির্মিত বিবেকানন্দ মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়। মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি. গিরি। ভাষণে তিনি বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে আমাদের ব্যক্তিগত চরিত্র গঠন প্রয়োজন; কারণ ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনই জাতীয় চরিত্র গঠন। কর্ম ও চিন্তাধারা পরিচালনায় মৌলিক নীতিগুলিকে

জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণই শোষণ ও অভাবমুক্ত সমাজ গড়িয়া তুলিবে। একাধাবে দার্শনিক, সন্ন্যাসী, স্বদেশ প্রেমিক, নবচিন্তার উদ্বোধক ও সংস্কারক স্বামিজীর অবদান কেবল আমাদের জাতির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনেই সীমিত নহে, আমাদের দুর্গতি দূব করা ও সাম্য স্থাপনের কাজেও তিনি আমাদেব উদ্বুদ্ধ কবিয়াছেন। ভাবতেব নিপীড়িত ও পদদলিত জনসাধাবণের দুর্গতিমোচনকল্পে ভারতীয় জাতিকে জাগাইয়া তোলার জন্য তাঁহার অবদান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মানুষের বুভুক্ষা, অশিক্ষা ও দারিদ্র্য সর্বাগ্রে দূব কবিবাব কথা তিনি বারংবার আমাদের বলিয়া গিয়াছেন, আব সেই সঙ্গে ধর্মকে সর্বসাধাবণের বোধগম্য ও জীবনে রূপায়িত কবাইবার জন্য অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। স্বামিজী বলিয়াছেন, মানুষেব সেবার মাধ্যমেই চিত্ত শুদ্ধ হয়, অপরের সহিত একাত্মতা বোধও আসে। তিনি বলিয়াছেন, সংসারেব মধ্যে থাকিয়াও সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করা সম্ভব। আজ জাতির ভাগ্য বিপযয়ের দিনে স্বামিজীর শিক্ষা সত্য, মানবতাবোধ, ধর্মের বিশ্বজনীনতা ও নিঃস্বার্থ সেবাই আমাদেব পথের দিশাবী। উপসংহাবে শ্রীগিবি বলেন যে, সমাজ ও জাতিব সেবাপর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ভাবত ও বিশ্বের নিকট স্বামী বিবেকানন্দের একটি মহত্তম দান।

"এতদুপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বীবেশ্বরানন্দজী অদূরের ঐ শিলাখণ্ডে বসিয়া ধ্যানকালে স্বামিজীর মানসপটে যে অমূল্য চিন্তাগুলি ভাসিয়া উঠিয়াছিল তৎসম্পর্কে বলেন যে, কন্যাকুমারীতে পৌঁছিয়া মন্দিরে জগন্মাতাকে পূজা করিবার পর ঐ নির্জন শিলাখণ্ডে বসিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন হইবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের মনে তীব্র ইচ্ছা জাগে। তথায় তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া দেখিলেন যে, ধর্মই হইল ভারতীয় জাতির প্রাণ, ভারতের ভবিষ্য সামগ্রিক নবজাগরণও ঘটিবে ধর্মের মাধ্যমে।

তিনি দেখিলেন, বহুধাবিভক্ত জাতি, ভাষা, আচরণপ্রথা প্রভৃতির ভিতরেও ভারতের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি সুনিশ্চিত একত্ববোধ রহিয়াছে, যাহা সাধারণ সংহতিরূপে জাতিকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ রাখিয়াছে।

আধ্যাত্মিক আদর্শের গুরুত্ব এবং জাতির উপর তাহার প্রভাব উপলব্ধি করিলেও স্বামিজী জনগণের দুর্গতির কথা, তাহাদের দারিদ্র্য ও অজ্ঞানের কথা ভুলিতে পারেন নাই। নিজ ধর্মের নামেই স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগণ কর্তৃক তাহারা শত শত বৎসর ধরিয়া নির্যাতিত ও পদদলিত হইয়া আসিতেছে। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা বিপুল পরিমাণে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুজনগণকে ধর্মের সুফল লাভে বঞ্চিত করিয়া আসিতেছে ; তাহার ফল জাতীয় অধঃপতন।

তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ভারতকে যদি আবার উন্নত হইতে হয় তাহা হইলে সর্বসাধারণের জাগতিক উন্নতিবিধান এবং তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিতে হইবে।

ভারতের অবনতির অন্যতম কারণ হইল, সে নিজেকে বাকী জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, অন্য জাতিগুলির সঙ্গে সে মিশিতে চাহে নাই, সে নিজে যে প্রাণপ্রদ সত্যগুলির অধিকারী তাহার ভাগ তাহাদের দিতে চাহে নাই। প্রাচীনকালে ভারত যখন তাহা করিত, তখন সে উন্নত ছিল। যেদিন হইতে সে দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতে শুরু করিয়াছে, সেইদিন হইতেই ভারতের এই অধঃপতনের সূত্রপাত। বিস্তৃততর ক্ষেত্রে বেদান্তের ভাব প্রচারের ফলে ভারত এবং বহির্জগৎ উভয়ই প্রভূত পরিমাণে লাভবান্ হইবে। মানসনেত্রে তিনি দেখিয়াছিলেন, ভারতীয় আধ্যাত্মিক আদর্শ ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সমন্বয়ে ভবিষ্যৎ সভ্যতা গড়িয়া উঠিবে ; সমগ্র মানবজাতি সেই সভ্যতারই প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। এই ভাবানুপ্রাণিত হইয়াই তিনি পাশ্চাত্ত্যে যাইবার কথা চিন্তা করেন।

ইহাই শিলাখণ্ডে সমাসীন স্বামিজীর ধ্যানের বিষয়। ধ্যান-ভঙ্গের পর তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে তাঁহার জীবনের উদ্দিষ্ট কর্ম—যাহা হইল ভারতে জাতির নবজাগরণের জন্য এবং পাশ্চাত্ত্যে সমগ্র মানবজাতির পুনর্গঠনের জন্য বাণীপ্রচার। আমাদের জাতির কাছে তাই এই শিলাখণ্ডটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব রহিয়াছে; আর সেজন্য ইহার উপর এই মহান্ ভারতসন্তানের স্মৃতিমন্দির থাকা যথোপযুক্ত।"

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে তামিলনাড়ুর (মাদ্রাজের) মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুত এম. করুণানিধি বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সমগ্র মানবসমাজের। স্বামিজীর চিকাগো যাত্রাকালে মহান্ সেতুপতির নেতৃত্বে তামিলনাড়ু তখন স্বামিজীর বাণীবহনে আগাইয়া আসিয়াছিল; এজন্য তামিলনাড়ু গর্ববোধ করে।

তিনি আরও বলেন যে, স্বামিজী কর্তৃক প্রজ্বলিত অগ্নি এখনও উজ্জ্বল শিখা বিস্তার করিতেছে; তাঁহার শিক্ষা ভারতের বিবেককে জাগ্রত করিয়াছে, ঐক্যের প্রতি তাহার আস্থা বর্ধিত করিয়াছে, মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। জনসাধারণের প্রতি স্বামিজীর সহানুভূতি ছিল অপরিসীম। মুক্তি, জনসাধারণের উন্নয়ন ও সাম্যই ছিল তাঁহার বাণীর মর্মার্থ।

উপসংহারে তিনি বলেন যে, তাঁহার স্মারক শিলার উপর মন্দিরটি বস্তুতঃ আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এইটি আমাদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের প্রহরী।

কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসবে যোগদানের জন্য বেলানগরের স্বামী সম্বুদ্ধানন্দও নিমন্ত্রিত হইয়া-ছিলেন। বিবেকানন্দ শিলা স্মারক সমিতির কর্মসচিব শ্রীযুত একনাথ রাণাডে মহাশয়ের সহিত স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের ব্যক্তিগত

পরিচয় না থাকিলেও তাঁহারা উভয়ে উভয়ের কথা শুনিয়াছিলেন। শ্রীযুত রাণাডে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের গুরুজী শ্রীযুত গোলওয়াল-করের সেক্রেটারী। শ্রীযুত গোলওয়ালকর স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম গুরুভ্রাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৃতীয় অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর কৃপাধন্য দীক্ষিত সন্তান। শ্রীযুত গোলওয়াল-করের সহিত স্বদেশপ্রেমিক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের পূর্ব হইতেই বিশেষ পরিচয় ছিল। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ প্রতিষ্ঠিত বেলানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমও একদা গোলওয়ালকরজী পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। এই সূত্রেই শ্রীযুত একনাথ রাণাডে ও স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ পরস্পর পরস্পরের কথা জানিতেন। শ্রীযুত একনাথ রাণাডের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ শিলায় এই সুবৃহৎ স্মৃতি-মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে।

নবনির্মিত বিবেকানন্দ মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। এই উৎসবের শেষ দিকে যোগদানের জন্য ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ মেলযোগে রওনা হইলেন। তাঁহার এই দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণকালে শ্রীসমরেশ সাহা, শ্রীমতী নিভা সাহা এবং শ্রীযুক্তা শ্যামাসুন্দরী রায় চৌধুরীও তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন।

৪ঠা নভেম্বর (১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দ) সঙ্গীগণসহ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ কন্যাকুমারী পৌঁছাইলেন। তথায় তাঁহারা দেবী কন্যাকুমারীর আরতি ও পূজা দর্শন করেন। কন্যাকুমারীতে তাঁহারা প্রায় এক সপ্তাহ অতিবাহিত করেন। এই সময় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ প্রত্যহ লঞ্চে দুই বেলাই বিবেকানন্দ শিলায় গমন করিয়া মন্দির ও বিগ্রহ-মূর্তি দর্শন করিতেন।

কন্যাকুমারীতে অবস্থানকালেই একদিবস গান্ধী স্মারক মন্দিরে শ্রীযুত একনাথ রাণাডের সহিত স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের সাক্ষাৎ

পরিচয় এবং আলাপ হয়। তাঁহাদের এই আলাপ বিশেষ সৌহার্দ্য ও আন্তরিকতাপূর্ণ হইয়াছিল।

১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র চিতাভস্ম কন্যাকুমারীতে সমুদ্রগর্ভে বিসর্জন দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে ঐ স্থানে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে গান্ধী স্মারক মন্দির নির্মিত হয়। বিশিষ্ট গান্ধীবাদী নেতা আচার্য জে. বি. কৃপালনী ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জুন এই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইহার নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হয়।

দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে আরব সাগর—এই তিন সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে বিবেকানন্দ শিলায় অপূর্ব কারুকার্যখচিত মন্দিরের দৃশ্য অতীব মনোরম। উহার সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনাতীত। শীর্ষে অনন্ত-প্রসারিত মহাকাশের নীচে দিগন্তবিস্তৃত মহাসমুদ্রের বক্ষে এই অপূর্ব সুন্দর মন্দিরটি দর্শকের মনে এক বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি করে। এই বিবেকানন্দ মন্দির দর্শন করিয়া স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের মনে হইল,—স্বামিজী মানুষ চাহেন। আমাদের জাতির কাছে এই শিলাখণ্ডের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। সেইজন্যই ইহার উপর এই মহান্ ভারত সন্তানের স্মৃতিমন্দির নির্মাণ উপযুক্ত হইয়াছে। আমরা যেন স্বামিজীর ভাবাদর্শ গ্রহণ করিয়া জাগিয়া উঠি, মানুষ হই। তবেই এই স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা সার্থক হইবে।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ যে কয়দিন কন্যাকুমারী ছিলেন তিনি তিন সমুদ্র দর্শন, দেবী কন্যাকুমারী দর্শন, মায়ের শ্রীপাদ দর্শন এবং বিবেকানন্দ মন্দিরে ধ্যান-জপ করিয়া মহানন্দে কালাতিপাত করেন। এই কয়দিন তাঁহার হৃদয় সর্বদা এক অনির্বচনীয় আনন্দ ও শান্তিতে পূর্ণ থাকিত।

দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণকালে এইবার স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহাবলী-পুরম্, শ্রীরঙ্গম্, রামেশ্বরও দর্শন করিয়াছিলেন। এই সুযোগে তিনি পণ্ডিচেরী অরবিন্দ আশ্রমে গমন করিয়া দুই দিন অতিবাহিত করেন। অরবিন্দ আশ্রমে অবস্থানকালে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ দুই দিনই শ্রীঅরবিন্দের পবিত্র সমাধিস্থলে সশ্রদ্ধ পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ তাঁহার পরিব্রাজক-জীবনে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের সকল তীর্থস্থান, সকল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত স্থান এবং সকল বিশিষ্ট ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন।

২৪

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে কন্যাকুমারী এবং দক্ষিণ ভারত পর্যটনান্তে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজ বেলানগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল তিনি তথায় থাকিতে পারিলেন না। জামসেদপুর নিবাসী ভক্তগণের একান্ত অনুরোধে তাঁহাকে কয়েকদিন পরেই, ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তথায় যাইতে হয়। পূর্ব বৎসর, ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া জামসেদপুরে যেমন সাড়ম্বরে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব পালিত হইয়াছিল, এইবারও তাঁহাদের সেইরূপ উৎসব করিবার ইচ্ছা! সুতরাং ভক্তগণের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ৪ঠা সেপ্টেম্বর জামসেদপুর যাত্রা করিলেন।

সেদিন বন্যার জলে আশ্রম প্রাঙ্গণ ভাসিয়া গিয়াছে। এক হাঁটু জল ভাঙ্গিয়া তিনি মালপত্র লইয়া বেলানগর স্টেশনে আসিলেন। জলপ্লাবনে অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানই জলে ডুবু ডুবু এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে আশ্রমবাসীরাও অশেষ দুর্গতির সম্মুখীন হইয়াছে।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ আসন্ন বন্যাকে অগ্রাহ্য করিয়া ৪ঠা সেপ্টেম্বরই জামসেদপুর রওনা হইলেন। পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনার পরিবর্তন হইবার উপায় নাই!

স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়াই, যতক্ষণ না গাড়ী আসে ততক্ষণ তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে আশ্রমবাসী ভক্তবৃন্দের নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন আর জনে জনে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"আশ্রমে জল আর কতটা বাড়ল ?"

স্টেশনে এই সময় অভয়নগর কলোনী-নিবাসী জনৈক ভদ্রলোক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের অধীরতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব, আপনি এই জল দেখে আমাদের সাধারণ লোকের মত ব্যাকুল হচ্ছেন কেন ?"

বেলানগরের শ্রীযুত জীবনচন্দ্র ঘোষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দকে ট্রেনে তুলিয়া দিতে স্টেশনে গিয়াছিলেন। তিনি উক্ত ভদ্রলোকের প্রশ্নের জবাব দিলেন, "গুরুদেব এই জল দেখেও জামসেদপুর যাচ্ছেন,—পারবেন আপনি এই অবস্থায় জামসেদপুর যেতে ? আমাদের সবাইকার ক্ষুদ্র সংসার, অথচ আমরাই বেশী বিচলিত বোধ করছি ; আর গুরুদেবের বিরাট সংসার, চিন্তা তাঁর সকলের জন্য! এই অবস্থার মধ্যেও তাই তিনি জামসেদপুর যেতে কৃতসঙ্কল্প! বলুন যেতে পারবেন আপনি ?"

—"না"! মুখ নীচু করিয়াই সলজ্জভাবে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন।

যাহা হউক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ জামসেদপুর পৌঁছিয়া বেলানগর আশ্রমের ব্রহ্মচারী আত্মদেবচৈতন্যের পত্র মারফৎ প্রতিদিনই আশ্রমের বন্যাপরিস্থিতির সংবাদ পাইতে লাগিলেন। তিনি জানিলেন, জল ধীরে ধীরে অভেদানন্দ মঞ্চ ও নাটমন্দিরের উপর প্রায় দুই ফুট পর্যন্ত উঠিয়াছে। শ্রীশ্রীমা সর্বমঙ্গলার মন্দিরেও দেড়ফুট জল হইয়াছে, তাঁহার নিজের খাইবার ঘরের ভিতরে জল ঢুকিয়াছে,—তাঁহার শুইবার ঘরের বারান্দায় দেড় ইঞ্চি জল উঠিয়াছে। জল কোনও ফাঁক দিয়া তাঁহার ঘরের ভিতরেও ঢুকিতেছে কিনা,—বুঝা যায় না। তাঁহার তালাবদ্ধ ঘরের চাবি

তাঁহার কাছেই রহিয়াছে। তাঁহার ঘরে জল ঢুকিলে হাজার হাজার টাকার বই ও অন্যান্য জিনিসপত্র নষ্ট হইয়া যাইবে।

বন্যাপরিস্থিতির এই নিদারুণ দুঃসংবাদ শ্রবণ করিয়াও জামসেদপুরে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ কিন্তু আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিতে বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা প্রকাশ করিলেন না। অগ্নিদগ্ধ মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের ন্যায় তিনি জামসেদপুরেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী জামসেদপুরের প্রতিটি কার্য নিষ্ঠাব সহিত সুসম্পন্ন করিয়া পূর্ব-নির্দিষ্ট ২৪শে সেপ্টেম্বরই তিনি আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন এবং আশ্রমের দায়-দায়িত্ব শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে সমর্পণ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট তিনি ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিলেন, "ঠাকুর, বন্যার জল যেন আমার ঘরে না ঢোকে! তা' হলে প্রচুর ক্ষতি হবে! অনেক টাকার বইপত্র ঐ ঘরে রয়েছে! তুমি দেখো ঠাকুর!"

সদানন্দময় ঈশ্বরনির্ভর স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ যথানির্দিষ্ট ২৪শে সেপ্টেম্বরই আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আশ্রমে আসিয়া তিনি বিশদভাবে বন্যাপরিস্থিতি সম্পর্কে শুনিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া তিনি তাঁহার ঘরের দ্বার উন্মোচন করিলেন। উপস্থিত সকলে বিস্মিত নেত্রে দেখিল, তাঁহার ঘরের বইপত্র যেমন ছিল ঠিক তেমনই রহিয়াছে,—এক বিন্দু জলও ঘরে প্রবেশ করে নাই। ভক্তিনম্র চিত্তে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের অপরিসীম করুণার কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন।

উল্লিখিত এই ঘটনা হইতে সুধী পাঠক নিশ্চয়ই স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাইবেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হইতেছে,—(১) সুগভীর শিষ্যস্নেহ, (২) অপরিসীম সত্যনিষ্ঠা, (৩) অনন্ত ঈশ্বরনির্ভরতা এবং (৪) স্বীয় প্রতিষ্ঠিত মঠের উপরও আত্মকর্তৃত্বাভিমানশূন্যতা।

২৫

পৃথিবীতে আমরা সকলেই আমাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার-সমূহ লইয়া জন্মগ্রহণ করি। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দও ইহার ব্যতিক্রম নহেন। এই জন্যই আমরা দেখি, শিশু-রবি তাহার গ্রামের বাড়ীতে সারাদিন একখানি কাটারি হাতে করিয়া জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ান, আর বলেন, "আমি জঙ্গল সাফ করবো।" পরিণত বয়সে ঐ দুরন্ত শিশুই স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ নাম ধারণপূর্ব্বক বিবেক ও বৈরাগ্যরূপ দুইখানি কাটারি দুই হস্তে লইয়া আশ্রিত জনের মন হইতে যাবতীয় অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন। বিভিন্ন দেশাগত বহু তাপদগ্ধ নরনারী এই মহা-পুরুষের মহাজীবনের সংস্পর্শে আসিয়া আজ শান্তিলাভ করিয়াছে। মহাকবির সেই মহাবাণীর কথা স্মরণ হয়,—

"Child is the father of man,
As morning shows the day".

প্রত্যেক সঙ্গীতেই যেমন একটি করিয়া মূল রাগিনী আছে, আমাদের মানবজীবনেরও সেইরূপ একটি করিয়া মূল সুর আছে। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের মহাজীবনের মূল রাগিনীটি হইতেছে—"প্রেম"। তাঁহার এই প্রেমকে আমরা কখনও ক্ষমা, কখনও সেবা, কখনও বা করুণায় রূপান্তরিত হইতে দেখিতে পাই।

To err is human, forgiveness is devine.—ফরিদপুরের রামকৃষ্ণ আশ্রম সংলগ্ন এক পুকুরে একদিন এক ভদ্রলোক বড়শি দিয়া মাছ ধরিতেছিলেন। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দও তখন সেখানে স্নান করিতে আসিলেন। ইহাতে ঐ ভদ্রলোকের মৎস্য শিকারে বিঘ্ন ঘটায় তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া পড়েন এবং বড়শির ছিপ দিয়া স্বামী সম্বুদ্ধানন্দেব মাথায় কয়েকবার সজোবে আঘাত কবেন। সর্বংসহ সন্ন্যাসী স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ নীরবে সেই আঘাত সহ্য করিলেন। আঘাতকারীকে তিনি অভিসম্পাত করা দূরে থাকুক, একটি কথাও বলিলেন না। ঘটনাটি ঐ আশ্রমের অন্যতম কর্মী শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মিত্র (পরবর্তীকালে ইনি শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির সম্পাদক হইয়াছিলেন) লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত ভদ্রলোককে তাহার এই দুষ্কার্যের জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহার রাগ পড়িয়া গেল এবং তিনি সন্ধ্যার দিকে আশ্রমে আসিয়া স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের নিকট তাহার কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

পরবর্তীকালে বেলানগর আশ্রমেও আমরা দেখিয়াছি, কোন ব্রহ্মচারী বা ভক্ত কোন অন্যায় কার্য করিলে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়াছেন, মিষ্টি কথায় তাহার ভুল সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তবে কি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের ক্রোধ হয় না? হ্যাঁ, হয়। কিন্তু "সৎ-এর রাগ, জলের দাগ।" তাঁহার সেই ক্রোধ ক্ষণস্থায়ী। পরক্ষণেই দেখিয়াছি, অপরাধীর সমস্ত অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে তিনি তাঁহার অতলস্পর্শী সুগভীর স্নেহে বশীভূত করিয়াছেন।

পরোপকারং পুণ্যং, পরপীড়নং পাপং।—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের জীবনে এই পরোপকার একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

জীবনে তিনি কখনও কাহারও ক্ষতি করেন নাই, সকলেরই উপকার করিয়াছেন। দীন-দুঃখী, দরিদ্র-আর্ত, সকলের সেবার জন্যই তিনি বেলানগরে আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। কত গরীব বিধবার সন্তান, কত বেকার যুবক, কত দরিদ্র যে এই আশ্রমে স্থানলাভ করিয়া তাহাদের জীবন গঠন করিবার সুযোগ পাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পরদুঃখে কাতর হইয়াই ধ্যাননিষ্ঠ এই সন্ন্যাসী শেষপর্যন্ত পরোপকারকেই তাঁহার জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন,—হিমালয়ের দুনির্বার আকর্ষণ উপেক্ষা করিয়া এক গণ্ড গ্রামে আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন।

আশ্রমের শত সহস্র কর্মযজ্ঞের মধ্যেও তিনি অবসর সময়ে যথারীতি ধ্যান-ধারণা করিয়া থাকেন। গভীর রাত্রিতে এবং প্রত্যূষে যখন আশ্রমের কর্মকোলাহল স্তব্ধ থাকে, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ তখন তন্ময় চিত্তে জপধ্যানে মগ্ন থাকেন।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের গুরুদেব, শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সমস্ত মনপ্রাণ ঢালিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অদ্ভুত সেবা দেখিয়াই তদীয় গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "Kali is the personal attache to His Holiness Sri Ramkrishna Paramhansa." স্বামী সম্বুদ্ধানন্দও তাঁহার গুরুকে সেইরূপ মনপ্রাণ ঢালিয়া সেবা করিয়াছিলেন। সেবানিষ্ঠ শিষ্যের এই গুরুসেবায় সন্তুষ্ট হইয়াই স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহাকে বারংবার প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়া গিয়াছেন,—"তুই চিরদিন আনন্দে থাক্‌বি।"

গুরোঃ সেবা পরং তীর্থং অন্য তীর্থমনর্থকং।
সর্বতীর্থাশ্রয়ং দেবি, মদ্ গুরোশ্চরণাম্বুজম্॥

স্বামিজী মহারাজের এই প্রাণভরা আশীর্বাদে তাঁহার প্রিয় শিষ্য সম্বুদ্ধানন্দ আশ্রমে আনন্দেই আছেন, সদানন্দে বিরাজ করিতেছেন।

গুরু গীতায় আছে,—

ন গুরোবধিকং ন গুবোরধিকং
ন গুবোরধিকং ন গুরোরধিকং।
শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ
শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ ॥
ইদমেব শিবং ইদমেব শিবং
ইদমেব শিবং ইদমেব শিবং।
মমশাসনতো মমশাসনতো
মমশাসনতো মমশাসনতো ॥

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মনে কবেন, তিনি তাঁহাব জীবনে যাহা কিছু লাভ কবিযাছেন, তাহা এই গুরুসেবার মাধ্যমেই লাভ করিয়াছেন।

শাস্ত্রেও স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের এই উক্তিব সমর্থন পাওয়া যায়,—

গুবোকৃপা প্রসাদেন ব্রহ্মবিষ্ণু সদাশিবা।
সৃষ্ট্যাদিযু সমর্থাস্তে কেবলং গুরুসেবয়া ॥
গুবোঃ কৃপা প্রসাদেন আত্মাবামোহি লভ্যতে।
অনেন গুরুমার্গেন স্বাত্মজ্ঞানং প্রপদ্যতে ॥

প্রদীপ হইতে প্রদীপ জ্বালাইয়া আমরা অন্ধকার দূর করি। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদীপ হইতে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতি তাঁহাদের জীবন-প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে স্বামী অভেদানন্দের জীবন-প্রদীপ হইতে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ তাঁহার প্রাণ-প্রদীপের শিখাটি জ্বালাইয়া লইয়াছেন। সমস্ত প্রদীপের শিখাইতো এক! শ্রীবামকৃষ্ণ স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতির মহাজীবনের সংস্পর্শে আসিয়া স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের জীবনও আজ মহাজীবনে রূপান্তরিত হইয়াছে।

১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের ১লা মাঘ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের ৬৫তম জন্মোৎসব উপলক্ষে তদীয় বিশিষ্ট শিষ্য খ্যাতিমান গায়ক শ্রীযুত সুবোধ রায়

একখানি স্বরচিত সঙ্গীত দ্বারা স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের পূজা করিয়াছিলেন। উক্ত সঙ্গীতটি নিম্নে উধৃত করিলাম,—

পুণ্যতীর্থ বেলানগর শান্তির পারাবার,
তাপিত হৃদয় শীতল হয়, ঘুচায় যত আঁধার।
সেথা একজন আছে মহাজন
জ্বালিয়া জ্ঞানের বাতি,
পূর্ণব্রহ্ম রূপ-সনাতন
জপে সারাদিন রাতি।
অবিরাম ঝরে শিশুর হাসিটি
স্নেহভরা মুখে তাঁর।
বলে, শিবজ্ঞানে জীবসেবাই ধর্ম,
বিশ্বাসে সবই পায়।
কেঁদে বলে, হায়, সবই যে যায়,
আয় ছুটে ওরে আয়
আয় ওরে বুকে যায়॥

তাঁর বিশ্বপ্রেমের কোমল পরশে
পাষাণও কেঁদে আকুল,
পঙ্গুরে সে যে লঙ্ঘায় গিরি,
মরুতে ফোটায় ফুল।
সে-যে শৈবের শিব, শাক্তের শ্যামা,
মহাভাবে একাকার॥

ওঁ মহাযোগী তপোমূর্তি গুরুধ্যানপরায় হি।
সম্বুদ্ধানন্দপাদায় ভূয়ো ভূয়ো নমোঽস্তুতে॥
রামকৃষ্ণপদাম্বুজে সদা যো মধুপায়তে।
নমামি সম্বুদ্ধানন্দং পরমানন্দদায়িনম্॥



স্বামী সদ্ভাবানন্দ

(বেলেঘাটা)



দেবী কন্যাকুমারী



শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ



ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্য

বৈশাখী পূর্ণিমায় ভাষণ

বুদ্ধং ধর্মঞ্চ সঙ্ঘং সুগত তনুভবা ধাতু যো ধাতুগব্ভং
লঙ্কায়ং জম্বুদ্বীপে তিদসপুববরে নাগলোকে চ থূপে ॥
সব্বে বুদ্ধস্স বিম্বে সকল দসদিসে কেসলোমাদি ধাতুং।
বন্দে সব্বেপি বুদ্ধং দসবল তনুজং বোধি চেতিং নমামি ॥

—বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ, সুগতের দেহজ ধাতু, চৈত্যস্থিত ধাতু, লঙ্কাদ্বীপে এবং জম্বুদ্বীপে স্থাপিত সমস্ত ধাতুচৈত্য, শ্রেষ্ঠ ত্রিদশপুরের চৈত্য, নাগলোকচৈত্য, দশদিকে স্থাপিত সমস্ত কেশ, লোমাদি ধাতু, সকল বুদ্ধ প্রতিমূর্তি, দশবল বুদ্ধের দেহজাত ধাতু এবং বোধি চৈত্য প্রভৃতিকে আমি বন্দনা করিতেছি।

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা, মহাপুণ্য দিন। এই বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কপিলাবস্তুর (অধুনা নেপালের) লুম্বিনী উদ্যানে, এই তিথিতে তিনি উরুবিল্ব গ্রামে (অধুনা বোধগয়া) তপস্যা করিয়া সম্বুদ্ধত্ব লাভ করেন এবং এই তিথিতেই আশী বৎসর বয়সে তিনি কুশীনগরে পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন;—এইজন্য এই দিনকে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ "Thrice blessed day" বলিয়াছেন। এইরূপ ঘটনা কোন মহামানবের জীবনে দেখা যায় না।

ছেলেবেলায় প্রথম ইতিহাসে বুদ্ধের জীবন ও বাণীর কাহিনী পড়িয়া আমি তথাগত বুদ্ধদেবের প্রতি আকৃষ্ট হই। তাঁহার প্রতি আমার হৃদয়ে যে কি গভীর প্রীতি, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা আছে, তাহা আমি ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না। আজ কুড়ি বৎসর যাবৎ এই বৈশাখী পূর্ণিমার উৎসব পালন করিতেছি। বোধগয়া, সারনাথ, লুম্বিনী উদ্যান ও কুশীনগর এই সকল পবিত্র স্থান যখন দর্শন করিয়া বেড়াইয়াছি, তখন আমার মনে হইত, কেন আমি

সেই সময় জন্মাই নাই! আমি যদি সেই সময় জন্মগ্রহণ করিতাম তাহা হইলে আমি এই মহামানবকে দর্শন করিতাম, আমার সমস্ত প্রাণমন দিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতাম।

আমি যখন রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে থাকিতাম, ১৯৩৭ সনে প্রথম যখন ভগবান বুদ্ধদেবের উৎসব উদযাপন করি, তখন শ্রীশ্রীগুরুদেব (শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ) কলিকাতায় ছিলেন না, দার্জিলিং আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন আমি তাঁহাকে পত্র দিয়াছিলাম, আপনি এই উৎসবে থাকিতে পারিলেন না, অতএব আপনি বুদ্ধদেব সম্বন্ধে একটি বাণী (Message) পাঠাইয়া দিন। তখন তিনি একটি বাণী পাঠাইয়া দেন। প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমা উৎসবে তাঁহাব ঐ বাণী পরম শ্রদ্ধার সহিত পাঠ কবি। তিনি আমাকে আরও বলিয়াছিলেন, 'তুই প্রতি বৎসব বুদ্ধ উৎসব করিস্।'

গৌতম বুদ্ধেব পিতাব নাম শুদ্ধোদন, মাতার নাম মায়াদেবী। বুদ্ধদেবের জন্মের মাত্র সাতদিন পবেই মায়াদেবীব দেহত্যাগ হয়।

মায়াদেবীর ভগ্নী প্রজাপতি গৌতমী নবজাত শিশুর লালন-পালন কবেন। ইনিও রাজা শুদ্ধোদনের মহিষী ছিলেন। বাল্যে বুদ্ধদেবের নাম ছিল সিদ্ধার্থ এবং গৌতম। বাল্যকাল হইতেই গৌতমেব সংসারের কোন বিষয় বস্তুব প্রতি আসক্তি ছিল না, সর্বদাই কি এক গভীর চিন্তায় থাকিতেন! রাজা শুদ্ধোদন তাঁহার জন্য ভোগবিলাসের কোন সামগ্রীর অভাব রাখেন নাই। তথাপি গৌতমের মনকে কোন ভোগ্যবস্তুতে লুব্ধ করিতে পারে নাই। রাজা তাহার এই বৈরাগ্যেব অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে ষোল বৎসর বয়সে শাক্য সুপ্রবুদ্ধের কন্যা যশোধারার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। বিবাহের পর তিনি দুই বৎসর উদ্যান ভবনে নানা বিলাসিতার মধ্যে দিন যাপন করেন। পরিশেষে তাঁহার এই বিলাসিতা ভাল লাগিল না। তিনি নগর ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

রথে তিনি ভ্রমণে বাহির হইলেন। কিছুদূর যাইতেই সিদ্ধার্থ দেখিলেন, একটি দন্তহীন পক্ককেশ জরাগ্রস্থ লোক, শরীর কম্পান্বিত, যষ্ঠিভর করিয়া অতিকষ্টে অগ্রসর হইতেছে।

এই বৃদ্ধকে দেখিয়া গৌতমের অন্তরে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সঞ্চার হইল। তিনি অতি ব্যাকুলভাবে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

—"এ কি, ছন্দক ?

—"একটি জরাগ্রস্থ লোক।"

—"এর কি এই ভাবেই জন্ম হইয়াছে ?"

—"না ! এই লোকটি পূর্বে আমাদের মতই ছিল।"

—"এই সংসারে এইরূপ লোক কি আরও আছে ?

—"অনেক আছে। এইরূপ অবস্থা সকল জীবেরই হয়।"

—"আমারও কি এই অবস্থা হইবে ?

—"হ্যাঁ, কুমার। সকল জীবেরই এই গতি হইবে।"

ইহার পর সিদ্ধার্থ আর রথে চড়িয়া অগ্রসর হইলেন না, তিনি চিন্তান্বিত অবস্থায় গৃহে ফিরিলেন।

এই ঘটনা জানিয়া রাজা শুদ্ধোদন খুবই ভাবিত হইয়া পড়িলেন। যাহাতে পুনরায় এইরূপ কোন দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টিপথে না পড়ে, তিনি তাহারই ব্যবস্থা করিলেন।

আবার কয়েক মাস পরে কুমার একদিন ভ্রমণে বাহির হইলেন। তাঁহার চোখে এইবার রোগে-শোকে অভিভূত, জীর্ণ-শীর্ণ ব্যাধিগ্রস্থ এক ব্যক্তি পড়িল। উহাকে দেখিয়া গৌতম সারথিকে বার্ধক্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার উত্তরে সারথি পূর্বের ন্যায় বলিল, "শরীর ধারণ করিলে সকলকেই এই অবস্থায় পরিণত হইতে হইবে।" ইহাতে কুমার বিষন্ন চিত্তে গৃহে ফিরিলেন, আর ভ্রমণে গেলেন না।

কিছুদিন পর কুমার পুনরায় নগরভ্রমণে বাহির হইলেন।

এইবার তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল এক শবদেহ। এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার চিত্ত বড় ব্যথিত হইল। তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকলেই কি মরিবে ?"

তাহার উত্তরে সারথি কহিল, "প্রত্যেক মানবকেই মরিতে হইবে।"

ইহা শুনিয়া কুমারের মন জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইল।

অপর একদিন নগরভ্রমণে বাহির হইয়া গৈরিকধারী এক সন্ন্যাসীকে তিনি দর্শন করিলেন। তাঁহার সৌম্যমূর্তি, প্রশান্তভাব দেখিয়া গৌতমের মনে এক গভীর রেখাপাত করিল। সারথিকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে ?"

সারথি কহিল, "ইনি ভিক্ষু। সংসারের সকল আসক্তি, রাগদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া ইনি অপার শান্তির অন্বেষণ করিতেছেন।"

জরাগ্রস্থ বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি, একটি শবদেহ,—মানবজীবনের এই ত্রিবিধ পরিণতির বিষয় চিন্তা করিয়া সিদ্ধার্থের চিত্ত ভীষণ বিষাদময় হয় এবং সন্ন্যাসীর সৌম্যমূর্তির দৃশ্যে তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের ভাব উদয় হয় এবং তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণে প্রণোদিত করিয়াছিল।

এই সময় যশোধারার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। এই ঘটনা শুনিয়া গৌতম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন, "রাহুলঃ জাতো", আমার একটি বন্ধন জন্মিয়াছে।" নবজাত শিশুর নাম রাখা হইল 'রাহুল'। ইহার পরেই গৌতমের অন্তঃকরণ নির্বাণ-চিন্তায় ভরিয়া উঠিল।

রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগের পূর্বে গৌতমের মনে তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্মিনী যশোধারা এবং পুত্রকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিল। তিনি যশোধারার গৃহে চলিলেন, অতি সন্তর্পণে সূতিকাগারে প্রবেশ করিয়া সদ্যোজাত শিশু রাহুলের মুখপানে চাহিলেন, ইচ্ছা ছিল

পুত্রকে একটিবার ক্রোড়ে করেন। কিন্তু যশোধারার নিদ্রাভঙ্গের আশঙ্কায় তাঁহার মনের ব্যাকুল কামনা অন্তরেই রহিল। শেষবারের মত স্ত্রী ও পুত্রের মুখপানে ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি নির্বাণ পথের যাত্রী হইলেন,—গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার গৃহত্যাগের ঘটনা—"মহাভিনিষ্ক্রমণ"—নামে প্রসিদ্ধ।

গৃহত্যাগ করিয়া গৌতম সন্ন্যাস লইয়া বিহার প্রদেশের নানাস্থানে ঘুরিয়া তাপস আড়ার কালাম ও আচার্য রুদ্রকের আশ্রমে কিছুকাল থাকিয়া তপশ্চর্যা করেন। তাঁহাদের সাধনা ও জীবনের উদ্দেশ্য গৌতমের মনের মত হইল না। এখান হইতে তিনি উরুবেলাভিমুখে রওনা হইলেন। এই গ্রাম নিরঞ্জনা নদীর তীরে। চীনদেশের লোকেরা এই নিরঞ্জনা নদীকে লিলাজন বলিত।

উরুবেলা গ্রামে আসিয়া গৌতম এখানে তপস্যা করিতে মনস্থ করিলেন। একদিন তিনি নদীতে স্নান করিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় তপস্যায় রত হইলেন। গৌতমের সন্ধান পাইয়া কৌণ্ডিল্য ও তাঁহার চারিজন সঙ্গী সর্বদা তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত রহিলেন। গৌতম দিন দিন কঠোরতা করিতে লাগিলেন। আহারের পরিমাণ কমাইতে কমাইতে ক্রমে কণামাত্রতে পৌঁছিল। এক সময় একটি মাত্র আমলকী খাইয়া তিনি দিন কাটাইতেন; শেষে একটি মাত্র তিল ভক্ষণ করিতেন। এইরূপ কঠোরতা করিতে করিতে তিনি জীর্ণ-শীর্ণ হইলেন, তাঁহার পেটে হাত দিলে পিঠে ঠেকিত। একদিন তিনি সংজ্ঞা হারাইলেন। পরে তাঁহার চেতন হইলে, তিনি ভাবিলেন,—এই কঠোরতা অসার। তাঁহার মনে আবার যাশোধারা, পুত্র রাহুলের কথা স্মরণ হইল। তিনি চিন্তা করিলেন,—এই পথ ঠিক নহে; 'মধ্যপন্থা' অবলম্বন করিতে হইবে। তিনি ভিক্ষাপাত্র হস্তে করিয়া, ভিক্ষা করিয়া আহার গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার শরীর সুস্থ হইল। এই সময় তাঁহার পাঁচ জন সঙ্গী তাঁহাকে ভোগী মনে করিয়া ত্যাগ করিয়া গেলেন।

তাঁহারা ভাবিলেন, গৌতম এখন ভোগী ও বিলাসী হইয়াছেন, তিনি নির্বাণ লাভ করিতে পারিবেন না।

সিদ্ধার্থ ছয় বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার কিছুই লাভ হয় নাই, বৃথাই সময় নষ্ট হইয়াছে। তাঁহার খুব মনস্তাপ হইল।

এই অঞ্চলের সেনানী নামক জনৈক ধনীর অশেষ রূপগুণ-সম্পন্না একমাত্র কন্যা সুজাতা তাহার মনোমত স্বামী ও সর্বপ্রথম পুত্র সন্তান লাভ করিয়াছেন বলিয়া বনদেবতার পূজা করিবার মানস করিয়াছিলেন।

একদিন প্রাতে ঐ বৃক্ষতলে বসিয়া গৌতম ধ্যানস্থ ছিলেন; —তাঁহার দেহ হইতে দিব্য জ্যোতি চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছিল। সুজাতা গৌতমকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া তাহার হৃদয় এক অভূতপূর্ব আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। তিনি স্বর্ণথালে পায়সান্ন আনিয়া কাছে দাঁড়াইলেন, গৌতমকে সেই পায়সান্নপূর্ণ স্বর্ণথালা অর্পণ করিলেন; গৌতমও উহা গ্রহণ করিলেন। সুজাতা প্রদত্ত পায়সান্ন উনপঞ্চাশৎ ভাগে বিভক্ত করিয়া একে একে সমস্ত ভাগই তিনি আহার করিলেন। ভাবী উনপঞ্চাশৎ দিনের আহার হইয়া গেল।

এইবার গৌতম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সাধনা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। শালবৃক্ষতল পরিত্যাগ করিয়া তিনি বোধিদ্রুমতলে গমন করিলেন। তথায় তিনি তৃণগুচ্ছ আসনাকারে বিস্তৃত করিয়া উপবেশন করিলেন আর প্রতিজ্ঞা করিলেন,—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতি॥"

—'এ আসনে বসি' যদি শুকায় শরীর,
ত্বক, অস্থি, মাংস মোর হয়ে যায় লয়,

তনু-মন হেথা তবু রহিবেক স্থির
যাবৎ সম্বোধি—রত্ন লাভ নাহি হয়।'

মার চঞ্চল হইয়া নানারূপ বাধা দিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই গৌতম প্রলোভিত হইলেন না। তিনি একমনে ধ্যান করিতে লাগিলেন। মার রূপক মাত্র, মানসিক সমস্ত কুপ্রবৃত্তি মাররূপে কল্পিত হইয়াছে। সাধক যখন মনকে স্থির করিয়া ধ্যান করিতে থাকেন তখন মনের কুবাসনা, কুপ্রবৃত্তি সকল জাগরিত হইয়া বাধা দেয়।—বীব সাধক তখন মনের কুপ্রবৃত্তিকে দূব করিয়া দিয়া, গ্রাহ্য না করিয়া, বিচাব দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করেন এবং তখন তিনি একাগ্রাবস্থায় উপনীত হইয়া মনকে নিরুদ্ধ করিয়া সমাধিব অবস্থায় গমন করেন। মনের সকল কামনা-বাসনাকে, তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিতে হইবে। গৌতমের কাছে মাবেব পরাজয় হইল। বৈশাখী পূর্ণিমাব রাত্রি তৃতীয় প্রহবে তিনি নির্বাণ লাভ করিলেন। প্রথম প্রহরে গৌতম জাতিস্মরত্ব, দ্বিতীয় প্রহরে সর্বজ্ঞত্ব লাভ করিলেন। নির্বাণের অবস্থায় তাঁহার কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল,—

"অনেক জাতি সংসারং
সন্ধা বিস্‌সম্‌ অনিব্বিসং।
গহকারকঙ্গ বেসন্তো
দুক্‌খা জাতি পুনপ্পুনং॥
গহকারক! দিট্‌ঠো হাসি
পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্‌গা
গহকুটং বিসংখিতং॥
বিসংখারগতং চিত্তং
তন্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা"।—

—'দেহঘর নির্মাতারে অন্বেষণ কবি,
বার বাব কবিলাম জনমধারণ ;
পরিভ্রমণ কবিলাম অসংখ্য সংসার,
কিন্তু হায়! তবু তাঁব দেখা মিলিল না,
বিড়ম্বনা পুনঃ পুনঃ জনমগ্রহণ!
এবার চিনেছি তোমা ওগো গৃহকাব!
পারিবে না গৃহ আব করিতে নির্মাণ ;
গৃহভিত্তি নির্মাণেব যত উপাদান
ভগ্ন, নষ্ট, বিসংস্কৃত করিয়াছি সব—
বীততৃষ্ণ চিত্তলীন নির্বাণ-সায়বে।'

শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা। তাপস গৌতম আজ সম্যকরূপে বোধি লাভ কবিয়া "বুদ্ধ" হইলেন। উনপঞ্চাশৎ দিবস তিনি নির্বাণেব আনন্দে মগ্ন বহিলেন,—কেবল আনন্দ, আনন্দ,—সমাধি সম্ভোগ! আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবল আনন্দ! পঞ্চাশৎ দিবস পরে ধীরে ধীবে তাঁহার চিত্ত নিম্নস্তবে নামিল। বুদ্ধ ভাবিতে লাগিলেন,—'নির্বাণ লাভ কবিলাম। জগতে এই লব্ধ সত্যেব প্রচার হইবাব সম্ভাবনা আছে কি?, তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় ব্রহ্মা আসিয়া করজোড়ে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন এবং কাতবভাবে বলিলেন,—"হে ভগবন্, আপনি যে সত্যধর্ম উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা জগতে প্রচার করুন মানবের কল্যাণের ও শ্রেয়ের জন্য!" ইহাতে বুদ্ধেব হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি সম্মতি জ্ঞাপন কবিলেন। কি ভাবে এই মহৎ ধর্ম প্রচার করিবেন, তিনি ভাবিতে লাগিলেন। সহসা ধর্মচক্রপ্রবর্তী বোধিসত্ত্ব তথায় আবির্ভূত হইলেন। বোধিসত্ত্ব তথাগত বুদ্ধকে একটি অলঙ্কারমণ্ডিত চক্র প্রদর্শন করিলেন। বুদ্ধদেব বুঝিলেন, গতিহীন ধর্মচক্রকে গতিপ্রদান করিতে হইবে। বোধিসত্ত্ব ইহাই ইঙ্গিত করিতেছেন।

ধর্মচক্র প্রবর্তনের জন্য বুদ্ধদেব বারাণসীর নিকটে ঋষিপত্তন (অধুনা সারনাথ) গ্রামে যাইয়া মৃগদাবে সেই পঞ্চজন সঙ্গী, যাঁহারা তাঁহার তপস্যার সময় উপস্থিত ছিলেন,—তাঁহাদের নিকট ধর্মপ্রচার করিলেন। এই পাঁচজনই বুদ্ধদেবের প্রথম শিষ্য।

বুদ্ধদেব শান্ত, সংযত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সংসারত্যাগীর দুইটি চরম পন্থা পরিহার্য ;—প্রথম, ইন্দ্রিয় সুখ-সম্ভোগ ; দ্বিতীয়, কষ্টদায়ক অতি কঠোর তপশ্চর্যা।—ইহাতে বিশেষ লাভ নাই।

ভিক্ষুগণ, একটি মধ্যপন্থা আছে। তথাগত সেইটি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পথ মনে শান্তি দান করিবে এবং নির্বাণ রাজ্যে পৌঁছাইয়া দিবে।

এই মধ্যপন্থা কি ? অষ্টাঙ্গিক মার্গ। সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কর্মাণ্ড, সম্যকাজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।

(১) সম্যক দৃষ্টি : উহার অর্থ অস্তিত্ব যে ধর্মের দ্বারা নিয়ত সেই ধর্মের সম্যক জ্ঞান, অর্থাৎ চারি আর্য-সত্যের জ্ঞান।

(২) সম্যক সংকল্প : চিত্তের বিশুদ্ধ অবস্থা। যে অবস্থায় চিত্ত কাম, দ্বেষ, হিংসা হইতে মুক্ত হয়।

(৩) সম্যক বাক্ : বাক্য যাহা মিথ্যা নহে, যাহা কর্কশ নহে, যাহা অপরের অখ্যাতিকর নহে, যাহা তুচ্ছ নহে।

(৪) সম্যক কর্মাণ্ড : অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত প্রাণীহিংসা হইতে বিরতি, চৌর্য হইতে বিরতি, ব্যভিচার হইতে বিরতি।

(৫) সম্যকাজীব : জীবিকা নির্বাহের জন্য এইরূপ বৃত্তি যাহা কোনও প্রাণীর অনিষ্টজনক বা দুঃখজনক নহে।

(৬) সম্যক ব্যায়াম : কায়, মন এবং বাক্য দ্বারা কৃত পাপ-কর্মের পরিহার ও বর্জনের নিমিত্ত প্রয়াস এবং ধর্মপরায়ণতা, আধ্যাত্মিক শান্তি ও প্রজ্ঞার বর্ধন ও রক্ষণের নিমিত্ত প্রয়াস।

(৭) সম্যক স্মৃতিঃ অর্থাৎ কর্মে, বাক্যে ও চিন্তায় অথবা অস্তিত্বের প্রকৃত ধর্ম (সর্ব বস্তু অনিত্য, অনাত্ম ও দুঃখ—এই সত্য) ভাবনা করিবার কালে সর্বক্ষণ মনের তীক্ষ্ণতা।

(৮) সম্যক সমাধিঃ অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা।

এইরূপে এই অষ্টাঙ্গমার্গ শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত। পূর্বে যে সম্যক বাক্, সম্যক কর্মাণ্ড ও সম্যকাজীব কথিত হইয়াছে, উহাই শীলের অন্তর্ভুক্ত। পূর্বোক্ত সম্যক স্মৃতি ও চিত্তের একাগ্রতাই সমাধি। সম্যক দৃষ্টি এবং সম্যক সঙ্কল্প প্রজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। অতএব এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ অধ্যাত্মিক উন্নতির মার্গ।

হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ সম্বন্ধে আর্যসত্য এখন শ্রবণ কর। জন্ম দুঃখময়, জরা দুঃখময়, দুঃখময় রোগ, মৃত্যুও দুঃখময়, অপ্রিয় মিলনে দুঃখ, প্রিয় বিচ্ছেদেও দুঃখ, কোন ইচ্ছার অপূবণ,—সেও দুঃখময়।

হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ সমুদয় (উৎপত্তি) সম্বন্ধে আর্যসত্য এই,— অদম্য তৃষ্ণাই এই দুঃখের মূলে বিদ্যমান। এই তৃষ্ণাই মানবকে জন্ম জন্ম ঘুরাইয়া থাকে।

প্রিয় ভিক্ষুগণ, এইবারে দুঃখনিরোধ সম্বন্ধে আর্যসত্য শ্রবণ কর। তৃষ্ণার একান্ত নাশই দুঃখনিরোধ। তৃষ্ণাকে সর্বদা পরিহার, তৃষ্ণার হস্ত হইতে মুক্তি, তৃষ্ণাকে কোনক্রমে প্রশ্রয় না দেওয়া,— এইরূপে দুঃখনিরোধ হইতে পারে।

চারি আর্যসত্য :—

প্রথম সত্য : দুঃখ (সত্তা যে আকারই ধারণ করুক না কেন, উহা দুঃখের বশীভূত।)

দ্বিতীয় সত্য : দুঃখের কারণ আছে (সর্বদুঃখের মূলে তৃষ্ণা ও অবিদ্যা।)

তৃতীয় সত্য : দুঃখের ধ্বংস আছে। অবিদ্যা ও তৃষ্ণার নিরোধে সর্বদুঃখের নাশ হইয়া জন্ম ও মৃত্যুর প্রবাহরূপ সংসার হইতে মুক্তি লাভ হয়।

চতুর্থ সত্য : দুঃখ ধ্বংসের উপায় আছে (দুঃখ, দুঃখ সকল দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধের উপায় স্বরূপ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ মধ্যপন্থা।)

ব্যাধি, জরা, দুঃখ ও মৃত্যুর কারণ জন্ম, জন্মের কারণ ভব, অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্ম। ভবের কারণ উপাদান, অর্থাৎ আসক্তি। উপাদানের কারণ তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণ বেদনা, অর্থাৎ স্পর্শ, অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্পর্ক।

স্পর্শের কারণ ষড়ায়তন, অর্থাৎ মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়। আয়তনের কারণ নামরূপ, অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণ সংস্কার, সংস্কারের কারণ অবিদ্যা ও অজ্ঞান। অবিদ্যা ও অজ্ঞানই সকল দুঃখের মূলীভূত কারণ। অবিদ্যার উচ্ছেদ হইলেই সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব এবং জন্মবন্ধন ছিন্ন হয়। জন্মদুঃখের সহিত ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুমুখ ও সর্ববিধ দুঃখ সর্বকালের তরে বিনষ্ট হইবে।

ভিক্ষুগণ দশ শীল পালন করিবে ;—

(১) জীবহিংসা করিবে না।

(২) পরদ্রব্য হরণ করিবে না।

(৩) ব্যাভিচার করিবে না।

(৪) মিথ্যাবাক্য বলিবে না।

(৫) মদ্যপান করিবে না।

(৬) নৃত্যগীত, বাদ্য দেখিবে না বা শুনিবে না।

(৭) অকাল ভোজন করিবে না।

(৮) মাল্য, গন্ধ, বিলেপন প্রভৃতি ব্যবহার করিবে না।

(৯) উচ্চশয়ন, মহাশয়ন করিবে না।

(১০) রৌপ্য এবং স্বুবর্ণ গ্রহণ করিবে না।

বুদ্ধদেবের ধর্মের ব্যাখ্যা ও নব-উপলব্ধ বাণী ও উপদেশ শুনিয়া তাঁহার পঞ্চশিষ্য অর্হত্ব লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইলেন।

অতঃপর মগধ, কোশল প্রভৃতি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। দলে দলে নরনারী তাঁহার ভক্ত ও শিষ্য হইতে লাগিলেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ও মগধরাজ বিম্বিসার তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত হইয়াছিলেন।

তিনি শিষ্যদের আদেশ করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, দেশে দেশে গমন কর, 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' দিকে দিকে পরিভ্রমণ কর,—অনুকম্পায় তোমাদের হৃদয় দ্রবীভূত হউক।

প্রত্যেকে বিভিন্ন দিকে গমন কর; ভাবে, ভাষায় আনন্দদায়ক এই সঞ্জীবনী ধর্মপ্রচারে জীবনপাত কর। সকলের সম্মুখে নিখুঁত পবিত্র জীবনের আদর্শ তুলিয়া ধর। আপনিই আপনার দীপস্বরূপ হও, আপনিই আপনার আশ্রয়স্থল হও, অন্য আশ্রয়ের শরণ লইও না! সত্য তোমার দীপ হউক, সত্যই তোমার আশ্রয় হউক, অন্য আশ্রয়ের সন্ধান করিও না।

চল ভিক্ষুগণ, আমিও প্রচারের উদ্দেশ্যে তোমাদের সঙ্গে যাইব।"

পাপাত্মা মার বুদ্ধদেবকে তাঁহার সম্বোধি লাভের ঠিক পরেই পরিনির্বাণ লাভের জন্য প্ররোচিত করিতে থাকে। এই সম্পর্কে বুদ্ধদেব তদীয় প্রধান শিষ্য এবং সেবক আনন্দকে বলিয়াছিলেন,—"আনন্দ, সম্বোধি লাভ করিবার অল্পকাল পরে একদা আমি উরুবিল্ব গ্রামে নিরঞ্জনা নদীতীরে অজপল-ন্যগ্রোধে অবস্থান করিতেছিলাম। তখন মার আমার কাছে আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল, —'ভগবান সুগত, এখন আপনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হউন। অস্তিত্ব হইতে মুক্ত হউন।' আমি তাহার কথা শুনিয়া বলিয়াছিলাম, "পাপাত্মা মার, যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীগণ, উপাসকগণ, উপাসিকাগণ প্রকৃত শ্রাবক-শ্রাবিকা (শিষ্য-শিষ্যা) না হয়, জ্ঞানী, বিনীত, বহুশাস্ত্রজ্ঞ, সত্যধর্মজ্ঞ, বিনয়ধর, বিশেষ ও সাধারণ ধর্মানুষ্ঠানকারী বিশুদ্ধ জীবন ও ধর্মানুসারে জীবনযাত্রা নির্বাহকারী

না হয় এবং যতদিন স্বয়ং ধর্মাচরণ করিয়া অন্যকে বলিতে ও উপদেশ দিতে না পারে, অন্যকে বুঝাইয়া দিতে, সত্য প্রকাশ করিতে, পরিষ্কার রূপে ব্যাখ্যা করিতে না পারে এবং যতদিন মিথ্যা প্রবাদ ধর্ম উপস্থিত হইলে তাহারা সত্যের দ্বারা পরাজিত ও খণ্ডিত করিয়া এই অদ্ভূত শক্তিসম্পন্ন সত্যধর্ম প্রচার করিতে সমর্থ না হয়, ততদিন আমি অস্তিত্ব ত্যাগ করিব না। যতদিন এই ব্রহ্মচর্যধর্ম প্রভাবশালী, বর্ধনশীল ও বহুবিস্তৃত জনসাধারণ কর্তৃক গৃহীত না হয়, ততদিন আমি অস্তিত্ব হইতে চলিয়া যাইব না।

আজ আমি যখন চাপাল মন্দিরে বসিয়াছিলাম, তখন পাপাত্মা মার আমার কাছে আসিয়া বলিল, "ভগবান, এইবার পরিনির্বাণ লাভ করুন।"

মায়ের কথা শুনিয়া তাহাকে আমি বলিলাম, "পাপাত্মা, শুনিয়া আনন্দ লাভ কর যে, তথাগত অচিরে পরিনির্বাণ লাভ করিবেন। অদ্য হইতে তিনমাস পরে আমি অস্তিত্ব (জীবন) ত্যাগ কবিব।"

বুদ্ধদেব যখন চাপাল মন্দিরে স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তথায় অতি ভীষণ এক ভূমিকম্প হয়। ঐ ভূমিকম্প সম্পর্কে আনন্দ বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি মহাভূমিকম্পের বিবিধ কারণ উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে দুইটি কারণ হইতেছে, যখন কোন তথাগত স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাতভাবে নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল ত্যাগ করেন,—আর যখন কোন তথাগত কোনরূপ উপাধি অবশিষ্ট না রাখিয়া পরিনির্বাপিত হন, তখন পৃথিবী কম্পিত, সঞ্চালিত ও ভয়ানক রূপে আন্দোলিত হয়।"

অতঃপর তিনি আনন্দকে বলেন, "সকল প্রকার জাতবস্তুই বয়োধর্মের অধীন, অতন্দ্রিতভাবে নির্বাণ সাধন করে। অচিরে তথাগত পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। অদ্য হইতে তিনমাসের পর তথাগতের মৃত্যু হইবে।"

জীবনের এই শেষ তিনমাস কাল বুদ্ধদেব কখনও রাজগৃহের

গৃধ্রকূট পর্বতে থাকিয়া, কখনও গ্রামে-গ্রামে, জনপদে-জনপদে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘের বুনিয়াদ দৃঢ় করিতেছিলেন এবং ভক্ত শিষ্যদিগের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। বুদ্ধদেবের জীবনের এই শেষ তিনমাস কালের ঘটনাবলী সংক্ষেপে পালিগ্রন্থ "মহাপরিনির্বাণ সূত্তে" বিবৃত হইয়াছে।

ভগবান বুদ্ধ একবার বহু ভিক্ষুসহ পাওয়া নগরে (অধুনা পাওয়াপুরী) চুন্দ কর্মকারের আম্রবনে যাইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। সংবাদ পাইয়া চুন্দ তাঁহার নিকট গমন করে। তথাগত চুন্দকে কৃপা করিয়া উপদেশ প্রদান করিলেন। চুন্দ ভিক্ষুদলসহ পরদিবস তাঁহাকে স্বীয় গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। বুদ্ধও সম্মতি দিলেন।

পরদিবস চুন্দ স্বগৃহে শূকরমাংস ও নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া তথাগতের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

তথাগত যথাসময়ে চুন্দেব গৃহে আসিয়া তাহাকে বলিলেন, "তুমি যে শূকরমাংস রন্ধন করিয়াছ তাহা আমাকে দাও,—আর অন্যান্য খাদ্য ভিক্ষুদিগকে দাও।" চুন্দও সেইভাবে পরিবেশন করিল। বুদ্ধদেব ভক্তের দেওয়া দুষ্পাচ্য শূকরমাংস যতখানি পারিলেন আহার করিলেন, অতঃপর অবশিষ্ট মাংস চুন্দের দ্বারা গর্ত করাইয়া পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিলেন।

বুদ্ধদেব জানিতেন, চুন্দের শুষ্ক শূকরমাংস বিষাক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহা খাইলে ভিক্ষুদের মৃত্যু ঘটিত; কিন্তু নিজের জন্য তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ভক্তের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি ঐ বিষাক্ত মাংস একাই আহার করিলেন।—এই মাংস আহারের পর তিনি কালব্যাধি কঠিন রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন। এই রোগযন্ত্রণার মধ্যেও কোন প্রকার কাতরোক্তি বুদ্ধদেবের মুখ হইতে বাহির হয় নাই।

ব্যাধির কিঞ্চিৎ উপশম হইলে বুদ্ধদেব শিষ্য আনন্দের সহিত

কুশীনগরের দিকে যাত্রা করিলেন। যাত্রার পূর্বে বুদ্ধদেব বলিলেন, "আমার জীবনে আমি দুইবার মহাভোজন করিলাম।—সুজাতার পায়সান্ন ভোজন করিয়া নির্বাণ লাভ করিয়াছি। সেই এক! আর এই এক! ভক্ত চুন্দের ভক্তি উপহার বরাহের দুষ্পাচ্য মাংস আহার করিয়া আমি মহানির্বাণ লাভ করিতে চলিয়াছি।"

অতঃপর তিনি আনন্দকে বলিলেন, "দেখ, চুন্দের অন্ন আহার করিয়া আমি ব্যাধিগ্রস্থ হইয়াছি এবং দেহত্যাগ করিতে যাইতেছি! ইহাতে লোক নিশ্চয়ই চুন্দকে দোষী করিবে, হয়ত তাহাকে নির্যাতনও করিবে। চুন্দেরও মনে হয়ত এই বলিয়া অনুতাপ হইবে যে, 'আমার অন্ন আহার করিয়াই প্রভুর প্রাণ গেল।' আনন্দ, চুন্দকে তোমরা এই বলিয়া সান্ত্বনা দিও যে, ইহাতে চুন্দেরই লাভ হইয়াছে। তাহার অন্ন ভোজন করিয়া তথাগত পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন; ইহা তাহার গৌরবেরই কথা। তথাগতকে যাহারা সম্বোধি লাভের পূর্বে ও পরিনির্বাণের পূর্বে অন্নদান করিয়াছে, তাহাদের সমান ফল ও সমান মুক্তি লাভ ঘটিবে। এই কার্যের দ্বারা চুন্দ দীর্ঘায়ু লাভ করিবে এবং জন্মান্তরে তাহার উত্তম বর্ণে জন্ম হইবে।

চুন্দ কাঁদিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেব তাহাকে জ্ঞান দান করিলেন। ব্যাধির একটু উপশম হইতেই ভগবান বুদ্ধ তাঁহার শিষ্য আনন্দের সহিত কুশীনগরের দিকে যাত্রা করিলেন। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া বুদ্ধদেব কুশীনগরের নিকটবর্তী মল্লদের শালবনে আসিয়া একজোড়া শালবৃক্ষের উপর চীবর দ্বারা শয্যা নির্মাণ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। শালবৃক্ষের ও মন্দারবৃক্ষের পুষ্পে তাঁহার শরীর ঢাকিয়া গেল।

বৈশাখী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না রাত্রি! উপযুক্ত সময়ে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া শাল্মলী বৃক্ষতলে শয়নাসনে তথাগত অবস্থিত। বৃক্ষতলে সমবেত শত শত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ বুদ্ধের সম্মুখে

করজোড়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে নীরবে বসিয়া আছেন। শাস্তা ক্ষীণকণ্ঠে সকলকে উপদেশ দিতেছেন। সকলেই তাঁহার অমৃতময় বাণী শ্রবণ করিতেছেন। তিনি উপদেশ দিতেছেন, "শাস্তার উপদেশ অতীতের। এখন তোমাদের আর কোন উপদেষ্টা নাই। তথাপি তোমরা সম্যক দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইবে না; কারণ আমি যে ধর্ম নিয়ম রাখিয়া যাইতেছি, আমার দেহত্যাগের পরে তাহাই তোমাদের পরিচালক হইবে।"

অতঃপর তিনি বুদ্ধ, ধর্ম বা সঙ্ঘ সম্বন্ধে কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি না জানিতে চাহিলেন। তখন সকলেই নীরব। কাহারও কোন জিজ্ঞাস্য নাই। সকলেই সমস্ত সন্দেহের পারে গিয়াছেন। সকলেই নির্বাক, নিব্যূঢ়, নিস্পন্দ, নিশ্চল।

বুদ্ধদেব বলিলেন, "তোমরা একান্ত মনে আপন আপন মুক্তি সাধন কর। ভিক্ষুগণ, তবে বিদায়।"

অন্তরতমের অন্তিমবাণী সকলের অন্তরের তারে তারে প্রতি-ধ্বনিত হইল, "ভিক্ষুগণ, তবে বিদায়!"

তথাগত দেহত্যাগ করিবেন বুঝিয়া আনন্দ রোদন করিতে লাগিলেন। আনন্দ তাঁহার সেবক; বহুবৎসর, বহুদিন কায়মনো-বাক্যে, ঐকান্তিকভাবে শাস্তার সেবা করিয়াছেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে বলিলেন, "রোদন কবিতেছ কেন, আনন্দ? শোক করিতেছ কেন? সকল প্রিয়জনের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবেই; ইহাই যে প্রকৃতির নিয়ম। আমিতো বহুবার তোমাকে এই কথা বলিয়াছি। যাহা জাত হইয়াছে, সংহত হইয়াই যাহা অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে, তাহার বিনাশ হইবে না, ইহা কি সম্ভব? আমার সেবা করিয়া তুমি বহু পুণ্য অর্জন করিয়াছ। আমার দেহত্যাগের পর তুমি একটু চেষ্টা করিলেই অবিদ্যা অতিক্রম করিয়া অর্হত্ব লাভ করিবে।"

সুভদ্র বুদ্ধদেবের শেষ শিষ্য। বুদ্ধদেব সেইদিন দেহত্যাগ

করিবেন, সর্বক্ষণ তিনি নিবাণের ধ্যান করিতেছেন, কাহারও সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিবেন না। প্রধান শিষ্য ও সেবক আনন্দ এবং অন্যান্য শিষ্যগণ তথাগতের সহিত কাহাকেও সাক্ষাৎ করিতে দিবেন না।

এমন সময় এক প্রাচীন পরিব্রাজক বহু কষ্ট সহ্য এবং বহুপথ অতিক্রম করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আনন্দকে বলিলেন, "আমি তথাগতের নিকট শিক্ষালাভ করিতে চাই।"

আনন্দ বলিলেন, "আর না। তথাগত এখন পরিনির্বাণের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।"

তথাপি সুভদ্র দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আগ্রহ দেখাইলেন।

আনন্দ বলিলেন, "আর তথাগতকে কষ্ট দিবেন না, ভগবান এখন ক্লান্ত।"

সুভদ্র তখন ভীষণভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। সেই সময় সহসা শাস্তার হৃদয়মধ্যে আঘাত লাগিল এবং তিনি বুঝিলেন যে একজন তাঁহাকে ব্যাকুলভাবে স্মরণ করিতেছে। তিনি ব্যাপারটা সব বুঝিয়া আনন্দকে তখনই আদেশ করিলেন, "সুভদ্রকে আমার নিকট আসিতে দাও।"

সুভদ্র তথাগতের নিকট আসিলেন এবং বুদ্ধদেবের চরণপদ্মে মস্তক অবনত করিলেন। বুদ্ধদেব সুভদ্রের মনের সকল সংশয় দূর করিয়া তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞান দিলেন এবং তাঁহাকে একেবারে উপসম্পদ দীক্ষা দান করিয়া সঙ্ঘভুক্ত করিলেন। ওঃ! বুদ্ধদেবের কি দয়া! কি অদ্ভুত জীবনী! এমন আর জগতে দেখা যায় না!

তথাগত বুদ্ধদেবের ধর্ম ছিল আচরণের ধর্ম। উহাতে ঈশ্বর উপাসনা অথবা দেবদেবীর পূজা ইত্যাদি ছিল না। স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-নির্ধননির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য তিনি একটি সহজ, সরল ধর্মজীবনের আদর্শ দিয়া গিয়াছেন। কর্মফল এবং জন্মান্তরবাদে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি বেদের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন

না। তিনি কথ্য ভাষাতেই (পালিভাষা) উপদেশ দান করিতেন। সাধারণ মানুষের দুঃখমোচন ও শান্তি বিধানই ছিল তাঁহার ধর্ম-প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য !

বৌদ্ধ সঙ্গীতি ও বৌদ্ধশাস্ত্র :—বুদ্ধদেব নিজে তাঁহার ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই। তাঁহাব দেহত্যাগের পরে তাঁহাব বাণী ও উপদেশসমূহ সংগৃহীত করিয়া গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ কবা হয়।

বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের কিছুকাল পরে তাঁহার শিষ্যগণ একত্রিত হইয়া বাজগৃহের নিকটে এক গুহায় প্রথম সম্মেলন কবেন। ইহাই প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি। ইহাব এক শতাব্দী পবে বৈশালী-নগরে দ্বিতীয় সঙ্গীতির অনুষ্ঠান হয়। অশোকেব সময় পাটলিপুত্র নগরে তৃতীয় সঙ্গীতিব অধিবেশন হয। অতঃপব কুষাণবাজ কনিষ্কের সময় চতুর্থ সঙ্গীতি হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে বৌদ্ধশাস্ত্রেব অনেক ভাষ্য ও টীকা সকল রচিত হইয়াছিল। পাঁচশত বৎসবে চারিটি সঙ্গীতির অধিবেশনেব মধ্য দিয়া বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ বৌদ্ধশাস্ত্রের একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দান করেন। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের নাম ত্রিপিটক। ত্রিপিটক তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল,—বিনয়পিটক, সুত্তপিটক এবং অভিধম্মপিটক।

(১) **বিনয়পিটক** :—ইহাতে লিখিত আছে বৌদ্ধ সঙ্ঘ এবং সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের কর্তব্যবিধি।

(২) **সুত্তপিটক** :—ইহাতে লিখিত আছে বুদ্ধদেবের বাণী ও উপদেশসমূহ।

(৩) **অভিধম্মপিটক** :—ইহার বিষয়বস্তু বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক তত্ত্বসমূহ এবং তাহার আলোচনা।

এই ত্রিপিটক পালি ভাষায় লিখিত।

বৌদ্ধগণের কাছে অপর একটি পবিত্র গ্রন্থ আছে—"জাতক"। ইহা বুদ্ধদেবের জন্মসম্বন্ধীয় কাহিনীর মালা।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে মঠে বা বিহারে বাস করিতেন। সঙ্ঘের পরিচালনা হইত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। এক একটি মঠকে কেন্দ্র করিয়া বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ চারিদিকে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া ধর্মপ্রচার করিতেন। মঠাধ্যক্ষকে সকল শ্রমণ মান্য করিতেন। তাহার অনুশাসন সকলকেই মানিয়া চলিতে হইত। প্রত্যেককেই সন্ন্যাসের কঠোর নিয়মবিধি পালন করিতে হইত।

ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ঃ—সিংহল, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, মধ্য এশিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার হয়, এমন কি আফগানিস্থান, নরওয়ে এবং সাইবেরিয়া পর্যন্ত এই ধর্মের প্রচার হইয়াছিল। এই সকল স্থানে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও তাহার প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সম্রাট অশোক, কুষাণরাজ কণিষ্ক এবং বাংলার পাল রাজগণ এই বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের জন্য বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। ইহার জন্যই এই বৌদ্ধ ধর্ম এত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সম্রাট অশোক এই ধর্মের প্রচারের জন্য যাহা করিয়াছিলেন তাহার তুলনা হয় না। উহা অভিনব। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রা পর্যন্ত এই বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই যুগে শিল্পকলা বিদ্যা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৌদ্ধ-যুগ মহাগৌরবের যুগ।

বৌদ্ধদের মধ্যে মহাযান এবং হীনযান নামক দুইটি সম্প্রদায় আছে। মহাযান বৌদ্ধমতে যিনি নিজের মুক্তিকে উপেক্ষা করিয়া সমগ্র জীবের মুক্তি প্রার্থনা করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। এ বড় সহজ কথা নয়! তিব্বতী লামাদের দেবতা বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর নিজে সাধন করিয়া যখন নির্বাণ-মুক্তির দ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি বলিলেন, "আমি নির্বাণ-মুক্তি চাহি না। শুধুমাত্র আমার নিজের মুক্তি লইয়া আমি কি করিব? যতদিন একটি-

মাত্র জীবও অপূর্ণাবস্থায় থাকিবে ততদিন আমি মুক্তি চাহি না। আগে সমস্ত জীবকে মুক্তির পথে আনয়ন করি, তারপর নিজের মুক্তি!" কি উদারতা! কি দেবপুরুষ!

বৌদ্ধ লামাদের ঐ দেবতার মূর্তি এখনও তিব্বতে পূজিত হয়। শ্রীগুরুদেব (শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ) একবার ঐ মূর্তি দেখিবার জন্য পায়ে হাঁটিয়া হিমালয়ের তুষারপথ ভাঙ্গিয়া তিব্বতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি বৌদ্ধ লামাদের মন্দিরে যান। মন্দিরটি চারিতলা। মূর্তিটি একতলা হইতে আরম্ভ করিয়া চারিতলা পর্যন্ত উচ্চ। প্রথম তলায় দেবতার চরণ, দ্বিতীয় তলায় বক্ষ, তৃতীয় তলায় কণ্ঠ এবং চতুর্থ তলায় মস্তক পূজা হয়। এইরূপ বিরাট মূর্তি!

শ্রীগুরুদেব (শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ) বলিতেন, "বুদ্ধদেবের মত মহামানব জগতে কদাচিৎ, বিরল আগমন করেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "ভগবান বুদ্ধদেবের মত জগতে এতবড় নির্ভীক নীতিতত্ত্বের প্রচারক আর দেখা যায় না। তিনি কর্মযোগীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই কৃষ্ণই যেন নিজেরই শিষ্যরূপে তাঁহার মতগুলি কার্যে পরিণত করিবার জন্য আবির্ভূত হইলেন।

আর কোন্ মানুষ তাঁহার অপেক্ষা অধিক কার্য করিয়াছিলেন? ইতিহাসে এমন একটি চরিত্র দেখাও, যিনি সকলের উপরে এতদূর গিয়াছেন? সমুদয় মনুষ্যজাতি কেবল এইরূপ একটিমাত্র চরিত্র প্রসব করিয়াছে,—এতদূর উন্নত দর্শন। এমন অদ্ভুত সহানুভূতি! এই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন প্রচার করিয়াছেন, আবার অতি নিম্নতম প্রাণীর উপর পর্যন্ত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, অথচ লোকের নিকট কোন দাবি-দাওয়া নাই। বাস্তবিক তিনিই আদর্শ কর্মযোগী। তিনি সম্পূর্ণ অভিসন্ধিশূণ্য হইয়া কার্য করিয়াছিলেন; আর মনুষ্যজাতির ইতিহাস দেখাইতেছে,—যতলোক জগতে জন্মিয়াছেন, তিনি তাহাদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার সহিত আর সকলের তুলনা হয় না।

স্বামিজী স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে বলেন, "বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর! তাঁর ঈশ্বরবাদ নেই,—তিনি নিজে ঈশ্বর,—আমি খুব বিশ্বাস করি।"

বুদ্ধদেবের ত্যাগ ও তপস্যা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনেও গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় ষোড়শ দিবসের অধিবেশনে ২৬শে সেপ্টেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ ভাষণদান প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের সহিত হিন্দু ধর্মের সম্বন্ধ সম্পর্কে বলেন, "আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন যে, আমি বৌদ্ধ নই, তথাপি একভাবে আমি বৌদ্ধ। চীন, জাপান ও সিংহল সেই মহান গুরু বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণ করে। কিন্তু ভারত তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করে। আপনারা এইমাত্র শুনিলেন যে, আমি বৌদ্ধধর্মের সমালোচনা করিতে উঠিতেছি; কিন্তু আমি চাই তাহা পূর্বোক্ত অর্থেই গ্রহণ করিবেন। যাঁহাকে আমি ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করি, তাঁহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করা আমার অভিপ্রায়ই নয়। কিন্তু বুদ্ধদেব সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে ঠিক ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। ইহুদীধর্মের সহিত খ্রীস্টানধর্মের যে সম্বন্ধ, হিন্দুধর্ম অর্থাৎ বেদবিহিত ধর্মের সহিত বর্তমান কালের বৌদ্ধধর্মের প্রায় সেইরূপ সম্বন্ধ। যিশুখ্রীস্ট ইহুদী ছিলেন ও শাক্যমুনি হিন্দু ছিলেন। তবে প্রভেদ এইটুকু যে, ইহুদীগণ যিশুখ্রীস্টকে পরিত্যাগ করিলেন এবং এমন কি, ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিলেন; হিন্দুগণ কিন্তু শাক্য-মুনিকে ঈশ্বরের উচ্চাসন দিয়া এখনও তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু আধুনিক বৌদ্ধধর্মের সহিত বুদ্ধদেবের প্রকৃত শিক্ষার যে পার্থক্য আমরা, হিন্দুরা দেখাইতে চাই, তাহা প্রধানতঃ এই,—শাক্যমুনি নূতন কিছু প্রচার করিতে আসেন নাই। যিশুর মত তিনিও পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে আসেন নাই। প্রভেদ এইটুকু যে, যিশুর ক্ষেত্রে প্রাচীনগণ, অর্থাৎ ইহুদীরাই

তাঁহাকে বুঝিতে পারে নাই, আর বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে তাঁহার শিষ্যগণই তাঁহার শিক্ষার মর্ম বুঝিতে পারেন নাই। ইহুদীরা যেমন (যিশুর মধ্যে) ওল্ড টেস্টামেন্টের পূর্ণ পরিণতি বুঝিতে পারেন নাই, বৌদ্ধগণও তেমনি (বুদ্ধের মধ্যে) হিন্দুধর্মের সত্যগুলির পূর্ণ পরিণতি বুঝিতে পারে নাই। আমি পুনর্বার বলিতেছি,—শাক্যমুনি পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে নয়; তিনি ছিলেন হিন্দু ধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি ও যুক্তিগত সিদ্ধান্ত, ন্যায়সম্মত বিকাশ।

হিন্দুধর্ম দুইভাগে বিভক্ত—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড; সন্ন্যাসীরাই জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা করিয়া থাকেন। ইহাতে জাতিভেদ নাই। ভারতে উচ্চতম বর্ণের মানুষও সন্ন্যাসী হইতে পারে, নিম্নতম বর্ণের মানুষও সন্ন্যাসী হইতে পারে, তখন উভয় জাতিই সমান। ধর্মে জাতিভেদ নাই; জাতিভেদ কেবল সামাজিক ব্যবস্থা। শাক্যমুনি স্বয়ং সন্ন্যাসী ছিলেন এবং তাঁহার হৃদয় এত উদার ছিল যে লুকানো বেদের মধ্য হইতে সত্যকে বাহির করিয়া তিনি সেগুলি সমগ্র পৃথিবীর লোকের মধ্যে ছড়াইয়া দিলেন,— ইহাই তাঁহার গৌরব। পৃথিবীতে ধর্মপ্রচারের তিনিই প্রথম প্রবর্তক; শুধু তাই নয়, ধর্মান্তরিত করণের ভাব তাঁহারই মনে প্রথম উদিত হইয়াছে।

সকলের প্রতি, বিশেষতঃ অজ্ঞান ও দরিদ্রগণের প্রতি অদ্ভুত সহানুভূতিতেই তাঁহার গৌরব প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার কয়েকজন শিষ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। যে সময় বুদ্ধ শিক্ষা দিতেছিলেন, সে সময়ে সংস্কৃত আর ভারতের কথ্য ভাষা ছিল না। ইহা সে সময়ে পণ্ডিতদের পুস্তকেই দেখা যাইত। বুদ্ধদেবের কোন কোন ব্রাহ্মণ শিষ্য তাঁহার উপদেশগুলি সংস্কৃতে অনুবাদ করিতে চান; তিনি কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন, "আমি দরিদ্রের জন্য—জনসাধারণের জন্য আসিয়াছি; আমি জনসাধারণের ভাষাতেই কথা

বলিব।” আজ পর্যন্ত তাঁহার অধিকাংশ উপদেশ সেই সময়কার চলিত ভাষায় লিখিত।

দর্শনশাস্ত্র ও তত্ত্ববিদ্যা যত উচ্চ আসনই গ্রহণ করুক, যতদিন জগতে মৃত্যু বলিয়া ব্যাপারটি থাকিবে, যতদিন চরম দুর্বলতায় মানুষের মর্মস্থল হইতে রোদনধ্বনি উত্থিত হইবে, তত দিন ঈশ্বরে বিশ্বাসও থাকিবে।

দর্শনশাস্ত্রের দিক দিয়া সেই লোকগুরু বুদ্ধের শিষ্যগণ বেদরূপ সনাতন শৈলের অভিমুখে সবেগে পতিত হইলেন, কিন্তু তাহাকে চূর্ণ করিতে পারিলেন না। অপর দিকে যে সনাতন ঈশ্বরকে নরনারী সকলে সাদরে ধরিয়া থাকে, তাঁহাকে সমগ্র জাতির নিকট হইতে অপসৃত করিলেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবেই হইয়াছিল। বর্তমান কালে বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভারতে এমন একজনও নাই, যিনি নিজেকে বৌদ্ধ বলেন।

কিন্তু এই সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মও কোন কোন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সেই সমাজ সংস্কারের জন্য আগ্রহ, সকলের প্রতি সেই অপূব সহানুভূতি ও দয়া সর্বসাধারণের ভিতর বৌদ্ধধর্ম যে ব্যাপক পরিবর্তনের ভাব প্রভাবিত করিয়া দিয়াছিল, তাহা ভারতীয় সমাজকে এতদূর উন্নত ও মহান করিয়াছিল যে তদানীন্তন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া জনৈক গ্রীক ঐতিহাসিককে বলিতে হইয়াছে,—কোন হিন্দু মিথ্যা বলে না বা কোন হিন্দুনারী অসতী—একথা শোনা যায় না।

(সভামঞ্চে যে সকল বৌদ্ধ উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া বক্তা বলিতে লাগিলেন)—

হে বৌদ্ধগণ, বৌদ্ধধর্ম ছাড়া হিন্দুধর্ম বাঁচিতে পারে না; হিন্দুধর্ম ছাড়িয়া বৌদ্ধধর্মও বাঁচিতে পারে না। অতএব উপলব্ধি করুন—আমাদের এই বিযুক্ত বিচ্ছিন্নভাব স্পষ্টই দেখাইয়া দিতেছে যে ব্রাহ্মণের ধীশক্তি ও দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য না লইয়া বৌদ্ধেরা

দাঁড়াইতে পারে না এবং ব্রাহ্মণও বৌদ্ধগণের হৃদয় না পাইলে দাঁড়াইতে পারে না। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের এই বিচ্ছেদই ভারতবর্ষের অবনতির কারণ। এইজন্যই আজ ভারতবর্ষ ত্রিশকোটি ভিক্ষুকের বাসভূমি হইয়াছে, এইজন্যই ভারতবাসী সহস্র বৎসর ধরিয়া বিজেতাদের দাসত্ব করিতেছে। অতএব এস, আমরা ব্রাহ্মণের অপূর্ব ধীশক্তির সহিত লোকগুরু বুদ্ধের হৃদয়, মহান আত্মা এবং অসাধারণ লোককল্যান শক্তি যুক্ত করিয়া দিই।"

ওঁ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধর্মং শরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

ওঁ মণিপদ্মে হুঁ। ওঁ মণিপদ্মে হুঁ। ওঁ মণিপদ্মে হুঁ॥

ওঁ নমো তস্স ভগবতে অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স
ইতিপি সো ভগবা অরহং সম্মা সম্বুদ্ধ বিজ্জাচরণসম্পন্ন
সুগতো লোক বিদু অনুত্তোরা পরিশধম্মা
সারথি সখা দেবঃ মনুষ্যাণাং বুদ্ধো ভগবতি॥

ওঁ নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়
ওঁ নমো নমো গৌতম চান্দমায়।
নমো নমোঽনন্ত গুণন্নবায়
নমো নমো সাকিয় নন্দনায়॥*

---

* ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে বেলানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বৈশাখী পূর্ণিমায় তথাগত বুদ্ধদেবের ২৫০০তম জন্মোৎসব উপলক্ষে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজের ভাষণ।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে

শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের ভাষণ

পরাধীন, পরপদানত ভারত-আত্মার বাণীকে বিশ্ববাসী প্রথম শ্রবণ করিল স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে চিকাগো ধর্ম মহাসভায় ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে। ইহার কুড়ি বৎসর পরে বিশ্ববাসী আর একবার ভারত-আত্মার বাণীর সহিত পরিচিত হইল ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলির মাধ্যমে। ভারত-আত্মার সত্য প্রকাশিত হইয়াছে স্বামিজীর বক্তৃতার মাধ্যমে, আর ভারত-আত্মার সৌন্দর্য বিকশিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের লেখনীর মাধ্যমে।

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৌন্দর্যের উপাসক; কি নাটকে, কি উপন্যাসে, কি কাব্যে, কি সঙ্গীতে, কি নৃত্যে, কি চিত্রে,—যাহা কিছুর মাধ্যমে সৌন্দর্যকে ব্যক্ত করা যায়,—সকল ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্বাক্ষর রহিয়াছে। তাঁহার সৃষ্টির বিশালতা এবং গভীরতা দুই-ই অসীম। এই জন্যই উহা কালজয়ী।

আমরা দেখি, যৌবনে নদীমাতৃক বাংলার প্রকৃতি, বাঙ্গালীর সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাই ভাষা পাইয়াছে কবির লেখনীতে। পরের পর্বে দেখি তিনি গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছেন বৃহৎ ভারতবর্ষকে। বেদ, উপনিষদ, বৌদ্ধ সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস, সন্ত সাধক, বৈষ্ণব ও বাউলেরা বিম্বিত হইয়াছেন তখন তাঁহার সৃষ্টিতে। আরও পরে আমরা বিবর্তিত হইতে দেখি তাঁহাকে আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও বিশ্বপ্রেমের মহান উত্তর সাধক-রূপে। সর্বশেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশমান হইয়াছেন বিজ্ঞান-বোধির সমর্থক এবং শ্রমকারী মানুষের দরদী সুহৃদরূপে।

এই সহস্রশীর্ষ বিরাট পুরুষকে আমরা বুঝিতে পারি না। ইহার জন্য সুগভীর অনুধ্যান আবশ্যক। কিন্তু তরলমতি আমরা,—সেই-জন্যই যাহা সর্বাপেক্ষা সুসাধ্য,—নৃত্য, গীত, অভিনয়াদি,—শুধুমাত্র তাহারই আড়ম্বরে আমরা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছি রবীন্দ্রনাথকে।

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিগোষ্ঠির অন্যতমতো বটেই, মনে হয়, তিনি যেন আরও কিছু বেশী। তিনি আমাদের কাছে সামগ্রিক জীবনচর্যার একখানি জীবন্ত বিগ্রহ। আচারে, ব্যবহারে, আলাপে, গল্পে, হাস্যে, পরিহাসে একটি সুন্দর শুচিস্নিগ্ধ পরিমণ্ডল গড়িয়া তুলিতেন তিনি। সভ্য সমাজের সমস্ত নগ্নতা, কুশ্রীতা এবং হিংস্রতার প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন তিনি। আমাদের দেশের চপলমতি তরুণেরা হয়তো তাহা জানে না। সেইজন্যই দেখি, অসুন্দরকে সুন্দরের আসনে বসাইয়া, হিংসা উন্মত্ততাকে প্রেমভক্তির বেদীতে বসাইয়া তাহারা পূজা-অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছে। তাহারা যেন রবীন্দ্রনাথকে খণ্ডিত করিয়া না দেখে। সমগ্র রবীন্দ্রনাথের অনুধ্যান যেন তাহাদের সার্থক হয়।

আজ সময় আসিয়াছে সেই দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ,—ঋষি রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ-মননের। আজ আমাদের এই অনৈক্য, অশান্তি, সর্বশূন্যতা ও সর্বরিক্ততার হাত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি পারেন অপ্রত্যয় হইতে জাতিকে মুক্ত করিয়া সুদৃঢ় সংহতি এবং আত্মবিশ্বাসের দেশে জাতিকে পৌছাইয়া দিতে।

"ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনার খ্যাতি।
আমি বারংবার
তোমারে করির নমস্কার।"

কবির চির জীবনের প্রার্থনা--

"তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে,
এসো গন্ধে বরণে এসো গানে।
এসো অঙ্গে পুলকময় পরশে,
এসো চিত্তে সুধাময় হরষে,
এসো মুগ্ধ মুদিত দু' নয়নে।
এসো দুঃখে-সুখে, এসো মর্মে,
এসো নিত্য নিত্য সর্ব কর্মে,
এসো সকল কর্ম অবসানে।"

আমাদের হৃতশ্রী, হৃতমান জীবনের কল্যাণমন্ত্র আছে রবীন্দ্রনাথে। আজ আনন্দময় লোক হইতে তাঁহার শুভ আশীর্বাদ এই শুভলগ্নে তাঁহার জাতির শিরে বর্ষিত হউক,—এই প্রার্থনা।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন সাধক-কবিগণের সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থের লেখকের সহিত স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের একদিন আলোচনা হইয়াছিল। সেই সময় আলোচনাপ্রসঙ্গে লেখক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কবি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?"

ইহার উত্তরে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ বলিয়াছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার অনুভূতি হচ্ছে,—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সত্যম্, শিবম্ এবং সুন্দরমের উপাসক। সত্যস্বরূপ, মঙ্গলময় ও সুন্দরের মহাসাধক তিনি। কবির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বিশ্ব স্রষ্টার সকল সৃষ্টির মধ্যে সুন্দরকে,—চির সুন্দরকে দর্শন বা উপলব্ধি করা। তিনি ছিলেন সুন্দরের পূজারী। তাই বিশ্বের সকল পদার্থের মধ্যেই তিনি সুন্দরকে দেখতেন, সুন্দরের অনুসন্ধান করতেন। উপনিষদের আলোকে তাঁর জীবন শতদল পদ্মের মত প্রস্ফুটিত হয়েছিল। তাই তাঁর প্রতিভার বিকাশের উৎস ছিল সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। সেই উৎসের মূলে তিনি উপনীত হয়েছিলেন। আর সেইজন্যই তাঁর মধ্য হতে এত সুন্দর সুন্দর কবিতা, গল্প, গান ও বিভিন্নমুখী প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল।"

বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ পুরী

নমঃ শ্রীযতিরাজায় বিবেকানন্দসূরয়ে।
সচ্চিদ্‌সুখস্বরূপায় স্বামিনে তাপহারিনে॥

১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দ। যুগপ্রয়োজনে অবতীর্ণ জগতেকারাধ্য পরম পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্ম-শতবার্ষিকী বৎসর। শঙ্করাচার্যের জ্ঞান, শ্রীচৈতন্যের প্রেম ও বুদ্ধদেবের সংগঠনী প্রতিভা লইয়া যে লোকোত্তর মহাপুরুষ অদ্য হইতে শতবর্ষ পূর্বে এই আত্মবিস্মৃত, আচারসর্বস্ব, জরাজীর্ণ, বীর্যহীন জাতির মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া উল্কার বেগে সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণান্তর মেঘমন্দ্র স্বরে বেদান্তের সুমহান্ বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই স্বামী বিবেকানন্দকে আজ ভক্তিবিনম্র শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করি। যিনি ছিলেন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, তথাপি যাঁহার হৃদয়ের সমস্তখানি স্থান জুড়িয়া ছিল দেশমাতৃকা ভারতবর্ষ; ভারতকে যিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন, ভারতের দুর্দশার জন্য অশ্রু বিসর্জন করিতেন এবং এই অধঃপতিত ভারতের সেবাতেই যিনি তনুত্যাগ করিয়াছেন; যাঁহার প্রতিটি শিরা-উপশিরার শোণিতস্রোতে স্পন্দিত হইত ভারতবর্ষ; ভারতের মৃত্তিকা ছিল যাঁহার স্বর্গ, যৌবনের উপবন ও বার্ধক্যের বারাণসী,—এক কথায় ভারতবর্ষ যাঁহার জীবনের ও ধ্যানের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছিল, তাঁহার কার্যাবলীর যথাযথ সমালোচনা করিবার প্রয়াস আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র,—সে ক্ষমতা আমাদের কাহারও নাই। যথার্থই তিনি শ্রীমুখে উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন, "যদি এখন আর একজন বিবেকানন্দ থাকিত, তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিত বিবেকানন্দ কি করিয়াছে।"

বর্তমান বৎসর যুগচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী বৎসর। আজ আনন্দের দিন নয়, আজ আত্মজিজ্ঞাসার দিন, আত্মসমালোচনার দিন। পূজ্যপাদ স্বামিজী যে মহান্ আদর্শ প্রচারের জন্য এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আমরা তাঁহার উত্তরপুরুষগণ উহা কতখানি গ্রহণ করিতে এবং বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারিয়াছি, তাহাই আজ বিচার করিবার উপযুক্ত দিন। যে দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী নিজের মুক্তিকামনা ত্যাগ করিয়া অবহেলিত, নিপীড়িত স্বদেশবাসীর সর্বাত্মক উন্নতির জন্য অকালে আত্মবিসর্জন করিয়া গিয়াছেন, যে সন্ন্যাসী সমাজ ও সংসার ত্যাগ করিয়াও ছিলেন অদ্বিতীয় সমাজ-সংস্কারক, যে সন্ন্যাসীর জীবনের একমাত্র মূলমন্ত্র ছিল স্বদেশপ্রেম এবং স্বজাতিপ্রীতি, তাঁহার সেই ত্যাগপূত দিব্য জীবনের সুমহান্ আদর্শ আমরা কতখানি গ্রহণ করিয়াছি, তাহাই আজ বিচার্য বিষয়। ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী একটা ভাবাবেগে উদ্বেলিত হইয়া লোকসমক্ষে বাহবা পাইবার আশায় সাড়ম্বরে তাঁহার শতবার্ষিকী জন্মোৎসব যেন আমরা পালন না করি! আজ যেন আমরা শান্ত ও সংযত-ভাবে শুচিশুদ্ধ মনে নীরবে নিভৃতে সাধক বিবেকানন্দ, আচার্য বিবেকানন্দ, যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ, মানবমিত্র বিবেকানন্দকে যথাযথ স্মরণ, মনন ও অনুধ্যান করি। যে ত্যাগের মন্ত্র, যে বীর্যের মন্ত্র, যে আদর্শেব মন্ত্র তিনি তাঁহার স্বল্পকালস্থায়ী জীবনে স্বদেশ-বাসীর সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়া রাখিয়া গেলেন, দুর্ভাগা আমরা তাহা হইতে যে কতখানি ভ্রষ্ট হইয়াছি, তাহা যেন আজ সম্যক উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি।

দেশ আজ স্বাধীন হইয়াছে। স্বাধীন হইয়াও কিন্তু আজ আমরা সেই আয়াসলব্ধ স্বাধীনতার আস্বাদ যথাযথরূপে লাভ করিতে পারিলাম না; মহাভারত গঠন করিতে যাইয়া পুনঃ পুনঃ পর্যুদস্ত হইয়া পড়িতেছি; দেশ সংগঠনের কার্যে সম্যক সাফল্য

লাভ করিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ কি? ইহার একটি মাত্র কারণ, আমরা ভারতবর্ষীয়েরা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ যথাযথভাবে গ্রহণ করি নাই, কিংবা গ্রহণ করিতে পারি নাই। তিনি কি বলেন নাই, "হে ভারত,—হে পাশ্চাত্ত্যভাবে অনুপ্রাণিত ভারত! ভুলো না বৎস, এই সমাজে এমন কি সমস্যা রয়েছে, এখনও তুমি বা তোমাব পাশ্চাত্ত্য গুরু যার মানেই বুঝতে পারছো না, মীমাংসা করা তো দূরের কথা!" অথচ আমরা এমনই নির্বোধ পরানুকরণপ্রিয় যে, জড়বাদী, ভোগসর্বস্ব, নবজাগ্রত পাশ্চাত্ত্য আদর্শজাত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আমরা আধ্যাত্মবাদী, ত্যাগসর্বস্ব, সনাতন এই ভারতভূমির সমস্যাসমূহের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করি; আর তাহারই পরিণামে আমাদের প্রতিপদে বিফলতা, তাহারই পরিণাম, আমাদের জাতীয় সমস্যাসমূহের দিন দিন বৃদ্ধি!

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকীর শুভক্ষণে আজ যেন আমরা স্বার্থপরতারূপ সর্বনাশের পথ পরিত্যাগ করিয়া শুচিশুদ্ধ মনে, ভক্তিবিনম্র চিত্তে বারংবার স্মরণ করি সেই বজ্র-গম্ভীর উদাত্ত বাণী, "লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভগবানে দৃঢ়বিশ্বাসরূপ বর্মে সজ্জিত হইয়া দরিদ্র, পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক। মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করুক।" যাহাদিগকে এই মহৎ ব্রতের জন্য পূজ্যপাদ আচার্যদেব আহ্বান করিলেন, তাহাদিগকে বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে বলিলেন, "গণ্যমান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন ভরসা রাখিও না। ভরসা তোমাদের উপর; পদমর্যাদাহীন, দরিদ্র কিন্তু বিশ্বাসী তোমাদের উপর।"

এসো তবে আজ অনাগত যুগের শক্তি-সাধকবৃন্দ,—অতীত গৌরবের জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কাল-আকীর্ণ মহাভারতের এই মহাশ্মশান

প্রান্তরে! তোমাদেরই জাতীয় জীবনের এক ঐতিহাসিক পুরুষ, বেদান্তকেশরী যুগন্ধর স্বামী বিবেকানন্দের ত্যাগ ও প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দেশমাতৃকা ভারতভূমির সেবায় অগ্রসর হও। ক্ষুধিতের কাতর ক্রন্দন, দীন-আর্ত ও দরিদ্রের বুকফাটা হাহাকার, নিপীড়িত-অক্ষমের মর্মভেদী সকরুণ দীর্ঘশ্বাসে শিহরিত হইও না; এই ভীমা, ভীষণাই তোমার একমাত্র উপাস্যা! মনে রাখিও, তুমি জন্ম হইতেই এই মায়েব নিকট বলিপ্রদত্ত! মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া ছুটিয়া যাও দেখি একবার সেখানে, যেখানে বন্যা-দুর্ভিক্ষ-মহামারী! ছুটিয়া যাও দেখি সেখানে, যেখানে অশিক্ষা, কুসংস্কার, দারিদ্র্য! যাও সেখানে, যেখানে জড়তা,মূঢ়তা ও হীনতা! এই মহাশ্মশানস্থিত প্রেতের অট্টহাসি, পিশাচের নৃত্য ও শিবার চীৎকারে ভীত হইয়া মোহিনী রমণীর অঞ্চলতলে কাপুরুষের মত আত্মগোপন করিয়া থাকিও না। তোমরা "অমৃতস্য পুত্রাঃ", অজর-অমর বীর বৈদান্তিক। এই ভীরুতা, কাপুরুষতা তোমাদের পক্ষে শোভা পায় না। মন হইতে সমূলে উৎপাটিত কর নারী-মায়া, সজোরে দূরে নিক্ষেপ কর ভোগ-বিলাসের কলুষ-কামনা! ভয় কি? কিসের নৈরাশ্য?

"বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়।
বাঙ্গালীর ছেলে ব্যাঘ্রে-বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।"

যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত ব্যথা, নিরাশা ও জড়ত্ব জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া একবার সেই মাভৈঃ বাণীর রুদ্রমন্ত্রে রুধিরাক্ত-বদনা, লোলরসনা, করাল দংষ্ট্রা মৃত্যুরূপা ভীমাকে সপ্রেমে মাতৃনামে সম্বোধন কর দেখি! তোমার সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম মুহূর্তে সার্থক হইবে, সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ এবং স্বজাতির এই দুর্দশাও দূর হইবে। ঐ শোন,—

"জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন শিয়রে শমন
ভয় কি তোমার সাজে!

দুঃখ ভার এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার
প্রেতভূমি চিতা মাঝে!
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার সদা পরাজয়
তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক্ স্বার্থসাধ-মান, হৃদয় শ্মশান,
নাচুক তাহাতে শ্যামা।"

মহাভারতের যুগে মহামতি ভীষ্ম ছিলেন জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ভারত-পুরুষ। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চপাণ্ডবকে প্রেরণ করিয়াছিলেন সেই পিতামহ ভীষ্মের নিকট বিবিধ নীতিশাস্ত্র শিক্ষার জন্য। শরশয্যায় শায়িত শান্তনুনন্দন মহাবীর্যবান্, মহাজ্ঞানবান্ ভীষ্মদেব পঞ্চপাণ্ডবদিগকে ধর্মনীতি, সমাজনীতি, সংসারনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি শিক্ষা দিয়াছিলেন।

বর্তমান যুগেও বেদান্তকেশরী দিগ্বিজয়ী শাস্ত্রজ্ঞ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠেও তদ্রূপ জ্ঞানপূর্ণ উপদেশের কথাই ধ্বনিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী যেন বর্তমান যুগের ধর্মনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতি-জ্ঞানের একটি আকর বিশেষ। দেশের যুবকগণ স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে বর্তমানের যুগ-সমস্যা-সংক্রান্ত বহু প্রশ্নের উত্তর পাইবে। আমার অনুরোধ, তাহারা যেন গভীর মনোযোগের সহিত উহা পাঠ করে।

প্রাচীন ভারতের ঋষির মত একদা দৃপ্ত বজ্র নির্ঘোষে উদাত্ত কণ্ঠে যিনি ভারতবাসীদের উদ্দেশে তাঁহার অমৃতবাণী ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তিনিই আমাদের এই যুগের অন্যতম পুরুষশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ। শঙ্করাচার্যের পরে এমন তেজস্বী পুরুষ ভারতের মাটিতে আর আবির্ভূত হন নাই। তাঁহার কণ্ঠে যেন ছিল উপনিষদের ঋষির অমৃতনিষ্যন্দী অমোঘ মন্ত্র, তাঁহার কল্পনায় যেন ছিল অনাগত যুগের মহামানবের প্রদীপ্ত রূপ, তাঁহার ওজস্বিনী

শব্দে যেন ছিল বেদমন্ত্রের বিশুদ্ধ বহ্নিশিখা, আর তিনি চাহিয়াছিলেন ভারতবর্ষকে নূতন রূপে গড়িয়া তুলিতে।

এইজন্যই আজ তাঁহার অমোঘ বাণী আমাদিগকে সর্বদা স্মরণ-মনন করিতে হইবে,—"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?"

"হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও। মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

ওঁ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-বেদান্তাম্বুজ-ভাস্করম্
নমামি যুগকর্তারং আর্তনাথং বীরেশ্বরম্ ॥

ভারতাত্মা বিবেকানন্দ

—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ পুরী

ইউরোপীয় মানবিকতার আত্মা যিশু এবং সাংসারিকতার প্রাণ রাজনীতি; ভারতীয় মানবতার আত্মা রাম ও কৃষ্ণ—ইদানিং রামকৃষ্ণ এবং সাংসারিকতার প্রাণ ধর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ বিভূতি স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা, সিদ্ধি ভারতাত্মা বিবেকানন্দ; শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতি, স্বামিজী পুরুষ; শ্রীরামকৃষ্ণ বেদ, স্বামিজী ভাষ্য; শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব, স্বামিজী ভাষা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে ভারত খুঁজে পাবে তার সনাতন ধর্মের ইতিহাস, উজ্জ্বলতম অধ্যায়। ভাবস্থা হয়ে ভগিনী নিবেদিতা, যাঁকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'লোকমাতা' বলে সম্মান করতেন, একদিন বলেছিলেন, "Sri Ramkrishna represents India five thousand years old ; Swami Vivekananda represents India three thousand years to come." শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতীয় ধর্মের বিগত পাঁচ হাজার বছরের প্রতিনিধি, স্বামী বিবেকানন্দ ভাবী ভারত-ধর্মের আগামী তিন হাজার বছরের প্রতিনিধি।

বর্তমান ভারত, যুব ভারত, ভাবী ভারত যুগাদর্শানুযায়ী জীবন ও জাতি গঠনে বিবেকানন্দের মধ্যেই তাঁর মত, পথ ও পাথেয় প্রচুর পরিমাণে পাবে। স্বাধীনতা, সমাজ-সংস্কার, জনসেবা, সাধনা ও সিদ্ধির কৌশল, আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞানের মিলন সব কিছুরই পরম যুক্তিসিদ্ধ নির্দেশ তাঁর কথা ও কাহিনীতে রয়েছে। বিদেশীও তা' বুঝতে পেরেছিল। বিশেষভাবে জড়বাদী হলেও ইউরোপীয় মণীষা তাঁর প্রকৃত পরিচয় পেয়েছিল। তাই তাঁকে

বলেছিল 'Condensed India'—ঘনীভূত ভারতবর্ষ। আবার তাঁর অপ্রমেয় শক্তির পরিচয়, যার মূল আধ্যাত্মিকতা পেয়ে ইউরোপ তাঁকে দেখল 'Cyclonic Hindu'—ঝোড়ো হিন্দুরূপে।

বিবেকানন্দের মধ্যেই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, তথা ভারত, ভারতীয় জীবনের দিব্য এবং পরিপূর্ণ পরিচয় পেয়েছিল। ঋষি অরবিন্দ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, বালগঙ্গাধর তিলক, মহাত্মা গান্ধী, নেহেরু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র—সবাই নবভারত গঠনে স্বামিজী-জীবনের আদর্শ ও প্রেরণার পরিচয় পেয়েছিল ও পেয়েছেন। প্রাচ্যের অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও পাশ্চাত্ত্যের জড়বিজ্ঞানের মিলনভূমি রচনা স্বামিজীই বেদান্ত-প্রচারের মাধ্যমে বিশেষভাবে করেছিলেন। আজকের বিজ্ঞানের সাধনা জড় ও চৈতন্যের সীমারেখা প্রায় মুছে ফেলেছে। অদূর ভবিষ্যতে বেদান্তবিজ্ঞানের বা আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞানের মিলনে বিশ্বে আর এক নবযুগ সৃষ্টি শুরু হবে—যার প্রাণপুরুষ ছিলেন স্বামিজী; তিনি শাস্ত্রের গোমুখী উৎস হতে যুগপাবনী বেদান্ত-গঙ্গাকে বিশ্বজনতার সমভূমিতে এনেছিলেন। ইউরোপের জ্ঞানী-বিজ্ঞানী যেদিন শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে ভারতীয় সন্ন্যাসী বেদান্তকেশরীর নিকট প্রণত হলেন, সেদিনই তাঁরা ভারতকে আধ্যাত্মিক গুরুরূপে কার্যতঃ বরণ করলেন। ভারতের ভাবী বিশ্বজয়ের সম্ভাবনা আধ্যাত্মিক পথেই চিহ্নিত হলো। আজিকার ভারতকে এই বিশ্বজয়ের মর্ম উপলব্ধি করতে হবে।

দেশকে. বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিকতা অর্থহীন ;—তাই বিবেকানন্দ দেশসেবার জন্য বলিপ্রদত্ত এক সহস্র যুবক চেয়েছিলেন—যারা বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ ও মেধাবী এবং যাদের মাংসপেশী লৌহদৃঢ়, শিরা-উপশিরা ইস্পাতের মত মজবুত। তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করে বলেছিলেন, "আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্যন্ত জননী ও জন্মভূমিই তোমাদের একমাত্র উপাস্য হউক।"

স্বামিজী যে স্বদেশী আন্দোলনের সত্যিকারের জনক ছিলেন, তার সত্যকারের সাক্ষ্য মেলে পণ্ডিত নেহরুর একটি বিশেষ উক্তিতে,—"Swami Vivekananda was no politician in the ordinary sense of the word ; yet he was, I think, one of the great founders, if you like, you may use any other word, of the national movement of India, and a great number of people who took more or less an active part in that movement in a later date drew inspiration from Swami Vivekananda. Directly or indirectly he has powerfully influenced the India of today. And I think that our younger generation will take advantage of this foundation of wisdom, of spirit and fire that glows through Swami Vivekananda."

এই সম্পর্কে এক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় নেতা শ্রীঅরবিন্দের বাণী স্মরণীয়,—"ভারতের বিরাট প্রাণ পুরুষ বলিয়া যদি কাহাকেও স্বীকার করা যায়, তবে তিনি একমাত্র বিবেকানন্দ,—নরকেশরী বিবেকানন্দ।" যখন ইউরোপের বাহ্য চাকচিক্য আমাদের দেশের লোকের দাসজাতিসুলভ অন্ধ অনুকরণে মত্ত ছিল—তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীই এই দেশের লোককে জাতীয় সম্মানবোধের দিকে ফিরিয়ে এনেছিল।" তিনি আরো বলেছিলেন, "Sri Ramkrishna was God manifested in a human being ; Vivekananda was a radiant glance frym the eye of Siva."—শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মানবদেহে মূর্ত ভগবান ; বিবেকানন্দ ছিলেন শিবের চোখের প্রোজ্জ্বল দৃষ্টি।

সর্বশেষে স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বামিজীর সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তর-সাধক, বীরত্বের অনুপমেয় প্রতিনিধি নেতাজী সুভাষচন্দ্র নিজ জীবনে

স্বামিজীর প্রেরণা সম্পর্কে বলেছেন,—"স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রতিকৃতি ও তাঁহার উপদেশ উভয়ের পরিপূর্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্ব লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। যে সমস্যাসমূহ আমার মনকে অনিশ্চিত ভাবে আলোড়ন করিতেছিল এবং যেগুলি সম্বন্ধে আরও আমি অবহিত হই, উহাদের সন্তোষজনক সমাধান তাঁহার মধ্যে আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্বামিজী বলেছিলেন, "আমি নিজেকে বহু শতাব্দীর পর আবির্ভূত এক পুরুষ বলে মনে করি।" আর তাঁর স্বপ্ন ছিল—তাঁর নিজের ভাষায়—"Spiritual conquest of England, Europe and America—this should be our supreme "mantra" at present. In it lies the welbeing of our own country. Expansion is the sign of life and we must spread over the world with our spiritual ideals." আর এই স্বপ্ন সফল করার জন্য চাই—তাঁরই ভাষায়—"Every improvement in India requires first of all an upheaval of religion. Before flooding India with socialistic or political ideas." তিনি আমাদের অন্তহীন উদ্যম ও উপনিষদের 'অভীঃ'-র বাণী শুনিয়েছেন নিজের অতুলনীয় আত্ম-বিশ্বাস ও বীরত্বের বজ্রকণ্ঠে।

"To work with undaunted energy! What fear! Who is powerful enough to thwart you? We shall crush the stars to atoms and unhinge the Universe. Don't you know who we are! We are the servants of Sri Ramkrishna. Fear! Whom to fear forthwith!"

জীব-শিব ও দরিদ্র নারায়ণবাদী বিবেকানন্দ ছিলেন শ্রেষ্ঠতম

মানবপূজারী। তাই বলেছিলেন তিনি, "We, Indians are Man-worshippers—after all our God is man." আজ চাই জীব ও শিবের ভেদ দূর করা। শুনুন তাঁর আত্মবাণী —"সোঽহং সোঽহং বিবেকানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।" আবার শুনুন,—"হে বীর, তোমার সর্বশক্তি সত্তাকে আহ্বান জানাও, নিখিল বিশ্ব তোমার পদতলে লুণ্ঠিত হইবে। কেবল আত্মা—আত্মারই সর্বপ্রভুত্ব, জড়ের নয়।"

জয়তু স্বামিজী।

যেমন দেখিয়াছি

স্বামী অভেদানন্দজীকে

শাস্ত্রজ্ঞায় প্রশান্তায় বেদান্তপ্রতিপাদিনে।
নমোঽস্তু অভেদানন্দায় জ্ঞানবিজ্ঞানদীপ্তয়ে ॥

একটি মহাজীবন দেখিবার আমার পরম সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে প্রায় ষোল বৎসর অবস্থান করিয়াছি, তাঁহার সেবা করিয়াছি, তাঁহার কত ভালবাসা, কত স্নেহ ও আশীর্বাদ পাইয়া এই জীবন ধন্য হইয়াছে। আহা, কি অপূর্ব ভালবাসা! তাঁহার ভালবাসায় কোন স্বার্থ জড়িত ছিল না। তিনি আমাদের কল্যাণ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আমাদের ভালবাসিতেন। এইরূপ নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিতে কাহাকেও দেখি নাই। আমরা প্রত্যেকেই মনে করিতাম,—স্বামিজী মহারাজ আমাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন! একদিন এই কথা শুনিয়া তিনি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমরাও শ্রীশ্রীঠাকুরের ভালবাসা পেয়ে মনে করতাম —ঠাকুর আমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন! এরূপ মনে হওয়া ভাল।"

দেখিয়াছি এই জীবনের মধ্যে গীতার

"সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজস্ব নৈবং পাপমবন্স্যসি ॥" ২।৩৮
"তুল্যনিন্দাস্তুতিমৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতি ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ ॥"

তাঁহার দেহত্যাগের সময় দেখিলাম, তিনি আজ্ঞাচক্রে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া, পরে নাসাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া ধীরে ধীরে শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, মহাসমাধিতে মগ্ন হইয়া এই দেহকে ত্যাগ করিলেন—যেমন আমরা জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করি।

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরানি।
তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মা সেইরূপ জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া নূতন শরীর গ্রহণ করেন। দেহত্যাগের পর তিনি বলিলেন, "শরীরে কষ্ট হচ্ছিল। আর শরীর রাখতে ইচ্ছা করলাম না; তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মরণ করলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামিজী সকলে আসলেন,—শরীর ত্যাগ করে চলে এলাম।"

এই কথাও তিনি বলিতেন, "সাধন কর, ভজন কর, মরতে জান্‌লে হয়।" দেহত্যাগের পর তাঁহার প্রিয় সেবককে দর্শন দিয়া তিনি বলিলেন,—"আমার কি বিনাশ আছে? না ধ্বংস আছে? আমি আত্মাস্বরূপ। আমি অনন্তকাল রয়েছি।" আর সেই সঙ্গে তিনি বলিলেন,—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্ নায়ং ভূত্বাঽভবিতা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে, দেখিয়াছি তাঁহার জীবনে সেই সকল লক্ষণ। দেখিয়াছি তাঁহার মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করা—আত্মসমর্পণ। সকল কার্যে তিনি বলিতেন, "ঠাকুরের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।" যেমন যিশুখ্রীস্ট বলিতেন,—"Let Thy will be done."

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥"

"Absolute resignation to the will of Lord." জীবন ছিল ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণে সমর্পণ।—দেহত্যাগের কিছু দিন আগে তিনি বলিতেন,—"আমার ভাব কি জানিস্? প্রভু, মৈঁ গোলাম তেরা। আমি ঠাকুরের গোলাম। এই দেহ, মন, প্রাণ ঠাকুরকে

দিয়ে দিয়েছি। পাঁঠার লেজ কাটলেও যা, মুণ্ড কাটলেও তা।" সেইজন্যই তিনি তাঁহার উপলব্ধিতে প্রকাশ করিয়াছেন,—

"তুমি যে কৃপা করেছ প্রভু!
তাহা কি ভুলিতে পারি?
তুমি যেমন খেয়েছ আমায়
আমি তেমন খেয়েছি তোমায়,
এ রহস্য বুঝিবে কে-বা,
তাহা আমি বলিতে নারি।
তোমার আদেশে এ রহস্য
প্রকাশ আমি করিতে নারি!
তুমি আমি এক হয়েছি,
তুমি আমি ভিন্ন নহি!
আমি আধার তুমি আধেয়
এ দেহ মন প্রাণ তব পদে সমর্পিনু।
যাহা ইচ্ছা তাহাই কর॥"

তাঁহার জীবনের কথাই ছিল—"তুমি ভগবান্ মান বা না-ই মান, তাতে কিছু এসে যায় না। নিজেকে চিনলেই ভগবান্‌কে জানা হ'ল। Self-কে জানা। Highest ideal হচ্ছে—Know thyself."

তিনি বলিতেন,—"তোমার আত্মা ও আমার আত্মা এক। এই হচ্ছে অদ্বৈতজ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করতে হলে তপস্যা চাই। কেবল পাণ্ডিত্যে, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিচারের দ্বারা এই আত্মজ্ঞান লাভ হয় না।"

স্বামী অভেদানন্দ বলিতেন,—"সমস্ত দুনিয়া ঘুরেছি, এখন আর আমার বেড়াবার সাধ নেই। এই ঘরের মধ্যেই থাকব, ঐ চেয়ারে বসে বসেই সমাধিস্থ হয়ে যাব।

দেহস্তিষ্ঠতু কল্পান্তং গচ্ছত্বদ্যৈব বা পুনঃ।
বৃদ্ধিঃ ক্ব চ বা হানিস্তব চিন্মাত্ররূপিণঃ॥

—এই দেহ কল্পান্ত পর্যন্ত স্থায়ী হোক বা আজই ধ্বংস হোক, তাতে চৈতন্যরূপীর (আত্মার) ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।—এ বোধ আমার হয়েছে !—এ-ই হচ্ছে আমার ভাব।"

দার্জিলিং-এ একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "স্বামিজী, আপনার কাছে যদি পাঁচ হাজার যুবক উপদেশ চাইতে আসে, তাহলে আপনি তাদের কি উপদেশ দিবেন ?"

তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন,—"শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আদর্শ গ্রহণ করে নিজের নিজের চরিত্র গঠন কর ; আর, দেশোদ্ধারের জন্য কাজ কর, নিজের জীবনকে দেশমাতৃকার চরণতলে বলি দাও। দেশেরও জাতির যাতে কল্যাণ ও উন্নতি হয়, সেই গঠনমূলক কর্ম কর।"

এই ভারতবর্ষ বহু জাতি, বহু সমাজ, বহু সম্প্রদায় সত্ত্বেও ভারতবর্ষের আত্মা এক। সেই আধ্যাত্মিক ঐক্যের উপরেই স্বামিজী এই যুগে এক নূতন মহাভারতের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বাণীই স্বামিজীর বাণী। উহাই জাতীয়তার মন্ত্রবাণী। এই বাণীতেই নেতাজী অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সুভাষচন্দ্র তাঁহার জীবন গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন।

আবেগ-আকুলকণ্ঠে সুভাষচন্দ্র বলিতেন স্বামিজীকে উদ্দেশ্য করিয়া,—"হে মহাপুরুষ, হে মহাসন্ন্যাসী, আমি ধর্ম জানি না, দেবতা জানিনা, আমি জানি শুধু তোমাকে। তোমাকে অনুসরণ করে চল্‌ব আমি জীবনের পথে। তুমিই হবে আমার জীবনের ধ্রুবতারা ; তুমিই বলেছ, 'জীবের সেবা মানব জীবনের সবচেয়ে বড় ধর্ম।' সেই সেবায় আমি আমার জীবনকে উৎসর্গ করলাম। তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর।"

নেতাজী বলিয়াছিলেন, "বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণের আদর্শকে জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করার ফলে বহু সমস্যা, বহু সঙ্কট আমি সহজেই পার হয়ে এসেছি।"

১৯৪০ সনে জুন মাসে কার্সিয়াং-এ নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁহার এক ভাগিনেয়কে বলেন, "স্বামিজীর বই প্রত্যেক দেশবাসীর ও বাঙ্গালীর পড়া খুবই দরকার। ওঁর বই না পড়লে ছেলেমেয়েদের চরিত্রগঠন হতেই পারে না। জাতির চরিত্রবল না থাকলে কোন কিছু হওয়া অসম্ভব। ওঁর আদর্শে যদি কিছু লোকও অনুপ্রাণিত হয় তা'হলে এদেশের চেহারা ফিরে যাবে।"

নেতাজীর মধ্যে স্বামিজীর বাণীকেই মূর্তিমান হইতে দেখি,— "Believe that you are free and you will be."

নেতাজীর জীবনে যৌবনকালে প্রথমেই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের মানস-সন্তান পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মাহারাজের আশীর্বাদ লাভ করেন, আর যখন তিনি ভারত হইতে অন্তর্ধান করেন, তাহার পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের অপর এক সন্তান পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের আশীর্বাদ লাভ করেন।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে দর্শন করিয়া নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্নেহের শ্রীমান হরিদাস মিত্রকে বলিয়াছিলেন,—"কি সুন্দর চেহারা দেখে এলুম। জ্বল্ জ্বল্ করছে! যেন আগুনের এক হল্‌কা! এক বিরাট জ্যোতির্ময় পুরুষ! তাঁকে দর্শন করে এলুম।"

১৩২৯ সালে শিলং হইতে প্রত্যাবর্তনের পর পুরতান মঠ বাড়ীর পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজজীর ঘরের সংলগ্ন সিঁড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে যে বড় ঘরটি আছে, তাহাতে কাশ্মীর যাইবার প্রাক্কালে স্বামিজী মহারাজ অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন প্রভাতে যখন তিনি চা পান করিতেছিলেন তখন পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজজী (শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ) তাঁহার কাপড়ের জুতাটি পায়ে দিয়া হাত-জোড় অবস্থায় স্বামী অভেদানন্দজীর ঘরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এই অবস্থা দর্শনে চমকিত ও বিমুগ্ধ হইয়া স্বামিজী মহারাজ বলিয়া উঠিলেন,—"একি

তারকদা! মহাপুরুষ, আপনি ?"—এই উচ্চারণ করিয়া ভাববিহ্বলে মহাপুরুষ মহারাজের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন।

পূজনীয় মহাপুরুষ বলিলেন,—"ভাই কালী, মায়ের স্তব পাঠ করছিলাম। যখনই মায়ের এ স্তব পাঠ করি তখনই কি এক আনন্দে ডুবে যাই। যাঁর কণ্ঠ হতে এমন স্তব, এমন সুন্দর মধুর স্তব নিঃসৃত হয়েছে, তাঁকে দর্শন ও তাঁর প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য আমি এখানে এসেছি। তাই ভাই, তোমার কাছে এসেছি!"

তখন পরস্পরের দৃষ্টিতে যে ভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়।

স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকা হইতে ফিরিয়াছেন, বেলুড় মঠে অবস্থান করিতেছেন। একদিন প্রাতর্ভ্রমণ করিয়া তিনি ঠাকুর ঘরের (পুরাতন ঠাকুর ঘর) কাছে আসিয়া করজোড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন, সেই সময় পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার ঘরের পশ্চিম দিকের জানালার রড ধরিয়া দাঁড়াইয়া স্বামিজী মহারাজের প্রণাম-করা দেখিতেছেন আর সম্মুখে বরিশালের এক যুবক ভক্তকে বলিতেছেন, "গ্যাখো, গ্যাখো, কালীভাই কেমন ঠাকুরকে প্রণাম করছে! ওঁর চালচলন, কথাবার্তা সব স্বামিজীর (স্বামী বিবেকানন্দের) মত।"

স্বামী অভেদানন্দ শ্রীশ্রীসারদাদেবী সম্বন্ধে একটি স্তব "প্রকৃতিং পরমাং অভয়াং বরদাং···" রচনা করিয়া শ্রীশ্রীমাকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা ঐ স্তবটি শুনিয়া অতীব আহ্লাদের সহিত তাঁহকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "তোমার জিহ্বায় সরস্বতী বসুক।" সত্যই তাঁহার এই আশীর্বাদ স্বামিজী মহারাজের জীবনে বিকাশ হইয়াছিল।

বরাহনগর মঠে তাঁহার অদ্ভুত কঠোরতা ও তপস্যা দেখিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ তাঁহাকে "কালী তপস্বী" আখ্যা দিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় অদ্ভুত দখল ও ষড়দর্শন-বেদান্ত শাস্ত্রাদিতে তাঁহার

অগাধ পাণ্ডিত্য, জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে "কালী বেদান্তী" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। হৃষিকেশের কৈলাস মঠের ষড়দর্শনবিদ্ আচার্য ধনরাজ গিরি মহারাজের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের যখন সাক্ষাৎ হইয়াছিল তখন তিনি স্বামী অভেদানন্দের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, "অভেদানন্দ অলৌকিকী প্রজ্ঞা!"

বারাণসীর ভাস্করানন্দ স্বামী, এই ধনরাজ গিরি মহারাজ এবং উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর জ্ঞানীগুণী মণীষীগণ কেহ তাঁহাকে তর্কে পরাজিত করিতে পারেন নাই। জীবনে তিনি যে কত পড়াশুনা করিয়াছেন, পৃথিবীর কত পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তাঁহার নিজস্ব গ্রন্থাগার দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। পৃথিবীর যে-কোন শাস্ত্র, বিজ্ঞান এবং যে-কোন বিদ্যা লইয়া তিনি পণ্ডিতগণের সহিত আলোচনা করিতেন। তিনি সতেরবার আটলান্টিক ও পাঁচবার প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া সুদীর্ঘকাল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে বেদান্তের আলোক ছড়াইয়াছেন। এই কার্যের জন্য তাঁহাকে বহু পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহার জন্য সকলেই কৃতজ্ঞ।

রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয়ও স্বামিজী মহারাজের প্রণীত স্তোত্রগুলি পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এমন সুন্দর সুললিত ছন্দে সহজ, সরল ভাষায় স্তব ভগবান শঙ্করাচার্যের পর আর কেহ রচনা করেন নাই।" এইরূপ সংস্কৃত ভাষার উপর দখল জগতে বিরল দেখা যায়।

মার্কিন দেশ ত্যাগের সময় Sanfrancisco বেদান্ত আশ্রম হইতে তাঁহাকে যে মানপত্রখানি দেওয়া হইয়াছিল, তাহার একস্থানে বলা হইয়াছিল,—"Although there are many teachers amongst us still we have not found another like you who have such a vast treasure of

wisdom and such a deep spiritual realisation and who have the power to awaken the Divine Consciousness in the earnest mind of seeker after truth."

স্বামী অভেদানন্দ পঁচিশ বৎসর কালের মধ্যে কমপক্ষে পঁচিশ হাজার বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যেকটি বক্তৃতাই ছিল বেদান্তের আলোকে সমুজ্জ্বল, বিশ্বমানবের হিতসাধনকারী। স্বামী বিবেকানন্দের মত স্বামী অভেদানন্দও পাশ্চাত্ত্য জগতে ভারতের মহাবাণী, সভ্যতা ও সংস্কৃতি অতি উজ্জ্বলভাবে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা শুনিয়া উচ্ছ্বসিত ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন,—"Even if I perish out of this plane my message will be sounded through these dear lips and the world will hear it."

"You have a resonant voice which has carrying power."

Captain Saviorও তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া অতি আনন্দ সহকারে বলিয়াছিলেন, "Swami Abhedananda is a born preacher ; wherever he will go he will have success."

স্বামী অভেদানন্দের এই বক্তৃতা শুনিবার পর স্বামী বিবেকানন্দ আলমবাজার মঠে লিখিয়াছিলেন, "The new Swami delivered his maiden speech yesterday at a friendly Society's meeting. It was good and I liked it ; he has the making of a good speaker in him, I am sure."

ব্যারিস্টার বি. সি. চ্যাটার্জি বলেন, "কলম্বাস আমেরিকার দেহ আবিষ্কার করেন ; কিন্তু ভারতের দুই অমর সন্তান, বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ আমেরিকার আত্মা আবিষ্কার করেন।"

বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক Sir C. V. Raman বাঙ্গালোর হইতে লিখিয়াছিলেন, "আমি ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে দার্জিলিং-এ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে স্বামী অভেদানন্দজীকে দর্শন করিয়াছিলাম। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যে আমি মুগ্ধ। তিনি বিদেশে আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি যে ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে চিরস্মরণীয়।"

আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রপতি Sir Sarvapalli Radhakrishnan মাদ্রাজ হইতে লিখিয়াছিলেন, "আমাদের সাংস্কৃতিক সম্পদ এবং ধর্মতত্ত্ব তিনি যে ভাবে পাশ্চাত্ত্য শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট প্রচার করিয়াছেন, উহার উচ্চ প্রশংসা আমি সর্বত্র শুনিয়াছি। ভারতবর্ষে আমরা অনেকে তাঁহার রচনা পাঠে উপকৃত হইয়াছি।"

Sri Sarvapalli Radhakrishnan এবং মিঃ জে. এইচ্. মুইরহেড্ কর্তৃক সম্পাদিত "আধুনিক ভারতীয় দর্শন" নামক সুবৃহৎ ইংরাজী গ্রন্থে স্বামী অভেদানন্দের "ভারতীয় হিন্দুদর্শন" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ আছে। উক্ত প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন,—

"অদ্বৈত-বেদান্ত পৃথিবীর সমস্ত দর্শনের শীর্ষস্থানীয়। পৃথিবীর অতি অল্পসংখ্যক দার্শনিকই এই বেদান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অথচ বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের জটিল সমস্যার সমাধান উহাতে নিহিত।"

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের "The Religion of the twentieth century" বইখানি আপনারা পড়িবেন। এই পুস্তকখানিতে স্বামিজী মহারাজ বলেন যে, "একমাত্র বেদান্ত-ধর্মই, যাহা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, জগতে প্রচার করা উচিত; এবং ইহার দ্বারাই পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম-মতাবলম্বীদিগের মধ্যে শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে। বিংশ শতাব্দীতে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে সামঞ্জস্য স্থাপনের

প্রয়োজন—একমাত্র বৈদান্ত ধর্মপ্রচারকের মাধ্যমেই তাহা করা সম্ভব।”

এই সম্পর্কে মণীষী ম্যাক্সমূলার বলেন,—“বেদান্তই যাবতীয় দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ; ইহা পৃথিবীর প্রচলিত ধর্মগুলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ! বেদান্তই পৃথিবীর 'সমস্ত প্রচলিত ধর্মকে আকড়াইয়া রহিয়াছে।”

স্বামিজী মহারাজ বলিতেন, “ধর্মকে বাদ দিয়ে কোন কার্যই এ জগতে করা যায় না, যেহেতু সর্ব জিনিষের ভিত্তিই (foundation) হচ্ছে ধর্ম। ধর্মের অর্থ ভগবান্ মনু যা বলেছেন তা' এই,— 'ধৃতি ক্ষমা দমোঽস্তেয়ম্ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

ধীর্বিদ্যা সত্যঽক্রোধো দশকম্ ধর্মলক্ষণম্॥'

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধাবস্থাই মানুষকে ঠিক ঠিক দেবত্বের ও চিরশান্তির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ইহার প্রত্যবায়ে মানুষ পশু হতেও অধম শ্রেণীতে পরিণত হয়।”

বর্তমান শিক্ষাকে তিনি Godless Education বলিতেন। এই শিক্ষা দ্বারা মানুষের চরিত্র, জীবন গঠিত হয় না। বর্তমান বিশ্ব যে অবস্থায় পৌঁছিয়াছে তাহাতে আধ্যাত্মিকতার (spirituality) বিশেষ প্রয়োজন। পৃথিবীর মানুষকে শান্তি লাভ করিতে হইলে আধ্যাত্মিক পথে চলা একান্ত আবশ্যক।

আর একটি কথা তিনি বলিতেন, “মান, যশঃ, অর্থ, প্রতিষ্ঠার জন্য মারামারি, দলাদলি করলে চল্‌বে না, ঠিক আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত কর্তব্য জ্ঞানে কর্ম করতে হবে—পরহিতায়। তবেই দেশের উত্থান সম্ভব। সকলেই নিজের মত চালাতে চাইবে। স্ব স্ব প্রধান। তাতে দেশের ও জাতির উন্নতি হবে না বরং আরো দেশের অধঃপতন হবে।”

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে

ফিরিতেছেন,—পথে রেঙ্গুন সহরে আসিয়াছেন। একদিন প্রাতঃকালে একটি যুবক ভক্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে কি ধর্ম-কর্ম হয়?" তাহাতে স্বামিজী মহারাজ কহিলেন, "স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে কি ভাল করা যায় না? এই ছাখ্ না! আমি খুব রোগা ছিলাম (কালী তপস্বীর ফটো দেখাইয়া)।" এই কথা কহিয়া তিনি দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, "এই দেখ্ছিস! এখন কেমন আমার স্বাস্থ্য!" এবং তিনি পদচারণ করিয়া আরও বলিলেন,—"I walk like a prince, I talk like a prince and I am a prince."

সত্যই তিনি যুবরাজ! তিনি রামকৃষ্ণের প্রিয় সন্তান। রামকৃষ্ণ মহারাজা, সত্যই। বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও অভেদানন্দ রাজপুত্র! তাঁহাদের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল রাজকীয়তা। কি ভারতবর্ষে, কি আমেরিকায়, পৃথিবীর যেখানেই তিনি গিয়াছেন, সেখানেই মহাসম্রাটের ন্যায় সম্মান পাইয়াছেন। ঐ জন্য তিনি একটি গান গাহিতেন,—

"যিনি মহারাজা বিশ্ব যার প্রজা,
জান না রে মন, আমি পুত্র তাঁর;
আমি সামান্য তো নই, রাজপুত্র হই,
পিতার ধনে আমার পূর্ণ অধিকার।"

ইংরাজী ১৯২১ সালের শীতকালে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজী ভারতে পদার্পণ করিয়াই বলিয়াছিলেন, "আমার বাকী জীবন এই আর্যভূমিতেই অতিবাহিত হবে।" জাহাজঘাট হইতে তিনি মোটরযোগে বেলুড় মঠের বর্তমান চন্দন গাছটি যেখানে আছে, সেইস্থানে অবতরণ করিলেন। উজ্জ্বল গৌরকান্তি, হাস্যোৎফুল্ল বদন, সকলের সহিত অমায়িক ব্যবহার। পরিচিত, অপরিচিত সকলকেই তিনি কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া ঠাকুর ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। ঠাকুর ঘর তখন বন্ধ ছিল। তিনি

সিঁড়িতে প্রণাম করিয়া, তাঁহার জন্য মঠের পুরাতন বাড়ীতে নির্দিষ্ট ঘর ঠিক ছিল, সেই ঘরে যাইয়া জামাকাপড় ছাড়িয়া গঙ্গার দিকের বারান্দায় একটি আরাম কেদারায় বসিয়া মঠের সাধুদের সহিত নানারূপ কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। সুদীর্ঘ পঞ্চবিংশ বৎসর পাশ্চাত্ত্য দেশে থাকিয়াও তাঁহার ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের কিঞ্চিৎ-মাত্রও ন্যূনতা হয় নাই। তিনি উপস্থিত সাধুবৃন্দের মধ্যে একজনকে একটি হুঁকা আনিতে বলিলেন। হুঁকা আনা হইলে তিনি বলিলেন, "আজ যেন আমার বহুদিনের একটা অভাব দূর হল।"

তাঁহার প্রকৃত বয়স অপেক্ষা তাঁহাকে অধিকতর অল্পবয়স্ক বলিয়া মনে হইত। একজন সাধু কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনাকে একজন যুবক বলে ভ্রম হয়। আপনার এখন কত বয়স হবে?"

তদুত্তরে তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমার বয়স মাত্র ছত্রিশ বৎসর।"

সমাগত সকলেই ইহার অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। স্বামিজী মহারাজ যেন তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "জান, শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসার দিন হতেই আমার পুনর্জন্ম হয়েছে। সেজন্যই আমার বয়স ছত্রিশ বৎসর।"

উপস্থিত সাধুরা তখন এই কথার মর্ম বুঝিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন এবং মনে মনে মহারাজের শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অগাধ বিশ্বাসের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে লাগিলেন।

স্বামিজী মহারাজ গঙ্গার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি পবিত্র স্থান! মা ভাগীরথী এর পাশ দিয়ে প্রবহমানা।"

স্বামিজী মহারাজকে একজন সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি

আজ কি আহার করবেন?" তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "কেন? ঠাকুরকে যে ভোগ নিবেদন করা হয়েছে, তা' হতে আমায় প্রসাদ দেবে।" ঠাকুরের ভোগের কোন এক ব্যঞ্জনের মধ্যে সেইদিন সজিনার ডাটা ছিল। তিনি তাহা খাইয়া বারবার বলিতে লাগিলেন, "এমন সব ভাল ভাল তরকারী থাকতে আমরা ঐ দেশে বাজে জিনিস খেয়ে মরি।"

১৯০৬ ইং সনে স্বামিজী মহারাজ আমেরিকা হইতে প্রথমবার ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কুটীর শিল্পের উপকারিতা সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন।

১৯২১ ইং সনে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন এবং খদ্দর প্রচলনের বিশেষ উদ্যোগ দেখা গিয়াছিল। স্বামিজী মহারাজের চিন্তাধারা কার্যে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া, জামসেদপুরের বক্তৃতাকালীন সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি আমেরিকায় থেকেও যদি খদ্দরের পরিধেয় ব্যবহার করতে পারি, তবে আপনারা এই দেশে থেকে কেন পারবেন না? জাতীয় ধর্ম এবং দেশীয় জিনিসের ওপর যতদিন আমাদের শ্রদ্ধা-প্রীতি ফিরে না আসবে, ততদিন আমাদের দেশ স্বাধীন হতে পারে না।"

"আমেরিকায় আমি question invite করতাম class-এর পর। একবার Sanfrancisco-তে একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলে, "How old are you?" আমিও জবাব দিলাম "As old as I look."

আমার পৃথিবীর নানাস্থানের বেড়ানোর কথা শুনে একবার এক Roman Catholic priest বললেন, "You look so young, how have you travelled on so many countries? What is your age?" আমি তখনই বললাম, "Before Abraham was, I am." সে-তো একেবারে চুপ!

I had much fun with them. Humour আমার ছিল বরাবরই।"

সম্প্রতি Lucknow-তে অভেদানন্দ-শতবার্ষিকীতে রাজ্যপাল শ্রীযুত বিশ্বনাথ দাস বলেন, "ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অবতার। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দুইজন বিশিষ্ট শিষ্য শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন যেরূপ মহাপ্রভুর বাণী সারা ভারতে প্রচার করেছিলেন, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ঠিক তেমনি তাঁর দুইজন প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ সমগ্র বিশ্বে প্রচার করে গিয়েছেন।" লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য Dr. A. V. Rao তাঁহার ভাষণে বলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ দুজনেই ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের প্রচারক।"

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে বলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্যানের তিনটি বিশিষ্ট ফুল হল জাতীয়তাবাদী সিদ্ধসাধক বিবেকানন্দ, পণ্ডিত সিদ্ধসাধক অভেদানন্দ, বিপ্লবী সিদ্ধসাধিকা নিবেদিতা। বেদান্তের সিদ্ধান্ত নিজ জীবনে উপলব্ধি করে এঁরা সেই সৌরভ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন।"

একদিন গভীর রাত্রে স্বামিজী মহারাজ এই শ্লোকটি আবৃত্তি করেন,—

"গুণদোষবিবর্জিত তত্ত্বমসি
সুখদুঃখবিবর্জিত তত্ত্বমসি।
যদি গগনোপম তত্ত্বমসি
কিম্ রোদসি মানসি সর্বশিবম্॥"

আর তিনি বলিতে লাগিলেন, "এইটি যখনই আমি আবৃত্তি করি, তখন শান্তি পাই। এইটি আউড়িয়ে আমি জগৎ ঘুরে এলাম।"

আজ বিশ্বের মহাদুর্দিনে যদি আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও

অভেদানন্দের আদর্শ গ্রহণ করিয়া চলি, তবে নিশ্চয় দেশ ও জাতির এবং পৃথিবীর সকল মানবের শাশ্বত কল্যাণ হইবে।

ত্যাগ, তিতিক্ষা, শৌর্য, বীর্য, বেদান্তের ভাস্বর মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। এই মহান্ আচার্যের অমর আত্মা যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের মধ্যে তাঁহার অনন্ত শক্তি সংক্রামিত ও সঞ্চারিত করুন, আমি শতবার্ষিকী উৎসবে মহাজাতি সদনে এই সন্ধ্যায় প্রার্থনা করি।

ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদো লীলাসহচরোহি যঃ
অভেদানন্দরূপং তং কালীতপস্বিনং তথা
প্রণমামি সদা ভক্ত্যা বেদান্তজ্ঞানভাস্করম্ ॥"

---

* বরাহনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তনের উদ্যোগে স্বামী অভেদানন্দ শতবার্ষিকী উপলক্ষে সাংস্কৃতিক সম্মেলনে মহাজাতি সদনে পঠিত। ১৭।১০।৬৬

পরিশিষ্ট

এই অংশে শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজজীর কোষ্ঠি-বিচার এবং নেতাজী শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু ও ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় রচিত বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে দুইটি অমূল্য প্রবন্ধ মুদ্রিত হইল। প্রবন্ধ দুইটি কলিকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের মুখপত্র "বিশ্ববাণী" হইতে পুনর্মুদ্রনের অনুমতি লাভ করায় আমরা উক্ত সংস্থার কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞ।

শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজের কোষ্ঠি-বিচার

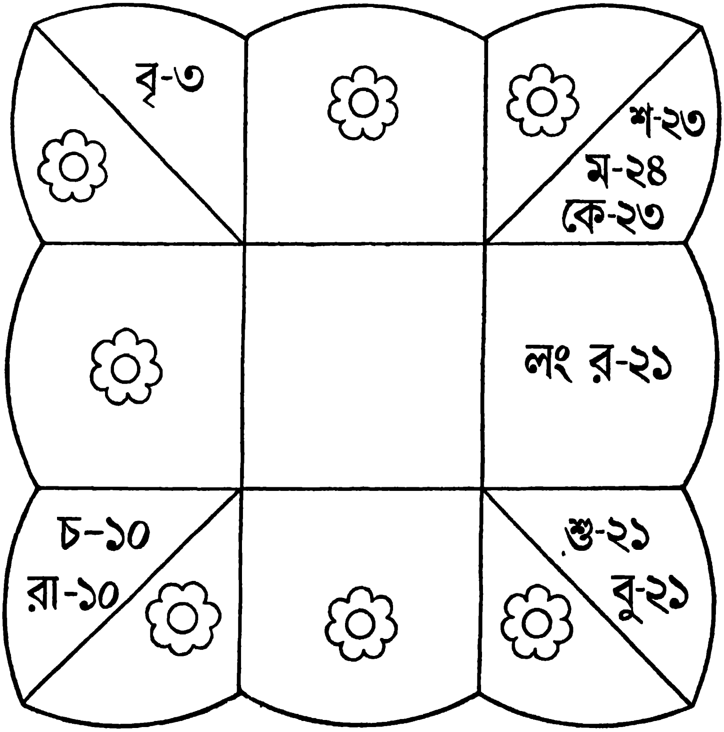
ওঁ নমো ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমো নমঃ

ওঁ যথা শিখা ময়ূরাণাং নাগানাং মনয়ো যথা।
তদ্বদ্বেদাঙ্গ শাস্ত্রাণাং জ্যোতিষাং মূর্ধ্নি সংস্থিতম্ ॥

গ্রহালোকে সাধকোত্তম রবি মহারাজ (সম্বুদ্ধানন্দ স্বামী মহারাজ)

ওঁ শুভমস্তু জন্ম শকাব্দি ১৮২৮। বঙ্গাব্দা ১৩১২ সাল, ১লা মাঘ, রবিবার। ইংরাজী ১৯০৬। ১৫ই জানুয়ারী, প্রাতঃ ৬।৫০ মিনিট জন্ম সময়॥ ১৮২৮।৯।০।১।৩।২৭।৩০॥ জ্যোতিষ্মান্ রবির মণ্ডলে যে হিরণ্যগর্ভ ভগবানের কল্যাণতম রূপ আছে, যে রূপ স্থূল দৃষ্টিতে দেখা যায় না, কলহপ্রিয় কলির অত্যাচারে, অবিচারে, হিংসা, দ্বেষ, ব্যভিচারে মানবসমাজ যখন দিগ্ভ্রান্ত, করুণাময় রবি লোকমঙ্গলের নিমিত্ত সাধক রবিরূপে সত্য, সরলতা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, দয়া, স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসার মূর্ত বিগ্রহ ধারণ-পূর্বক, যে সৌর চক্রপথে, রবির জ্যোতিশ্চক্র নিরন্তর অখিল মানবের বাণী বহন করিয়া বিঘুর্ণিত হইতেছে, সেই বিঘুর্ণনের একটি পরম শুভ দিনে ১৩১২ সালের ১লা মাঘ স্বর্গের রবি মর্ত্যে প্রাকৃত মানবশিশুর আকারে উদিত হইলেন। যে শুভ মুহূর্তে এই দেবশিশু জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময় সৌরচন্দ্রের মকর রাশির স্থান সংলগ্ন ছিল। লগ্নপতি দ্বিতীয়ে স্বক্ষেত্রে এবং দশম পতি পঞ্চম পতির সহিত ক্ষেত্র বিনিময় করায় বৃহস্পতি বুদ্ধি ও প্রতিভা ভাবে থাকায় পঞ্চম এবং নবমাধিপতিকে পূর্ণ দৃষ্টি করায় আত্মার কল্যাণতম স্বরূপটির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে।

ব্রহ্মময় সাধকোত্তম রবি মহারাজ হইলেন গৈরিক বসন-পরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। ব্যোমলোকে গ্রহ সন্নিবেশের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায়, জন্মকালে তিনি সাধারণ মানুষের মত ("স্বকর্মফলভুক্ পুমান্") সুখদুঃখ ভোগ করিতে আসেন নাই। রবি মহারাজের সিংহ রাশি, মকর লগ্ন, শনির ক্ষেত্রচর পৃথ্বীরাশি, লগ্ন তুঙ্গ নবাংশসহ বিশেষ বর্গবলে বলীয়ান্। লগ্নে



আত্মকারক রবির স্থিতি ও গুরুর পূর্ণদৃষ্টি বিশেষ শুভ। গুরু শুক্রের প্রথম সম্বন্ধ অর্থাৎ ক্ষেত্র বিনিময় রবি মহারাজের জীবন শুভ ভাবে বিকাশের হেতু। নবম দশম পতির গুরুক্ষেত্রে সহাবস্থান বিশেষ রাজযোগ কারক। দ্বিতীয়ে স্বক্ষেত্রস্থ লগ্নপতি, পঞ্চমে ও নবমে ত্রিপাদ দৃষ্টি করায় মহারাজকে উচ্চ শ্রেণীর ত্যাগী ও তপস্বী

করিয়াছে। শনিদৃষ্ট চন্দ্র মহারাজের সন্ন্যাসের কারক। দ্বিতীয় পতি স্বক্ষেত্রে থাকায় বাগ্মিতাযোগ হইয়াছে। সপ্তম স্থানে রবির পূর্ণ দৃষ্টি ও পাপযুক্ত চন্দ্রের সপ্তমে তিনটি পাপগ্রহ থাকায় প্রবল সন্ন্যাসযোগ ও বিবাহনাশক হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দেরও এই যোগ ছিল। ব্যয়ে রাহু দৃষ্ট শুক্র, বুধ বহুদেশ ও তীর্থভ্রমণের কারক। লগ্নাধিপতি দ্বিতীয়ে স্বক্ষেত্রে থাকায় মহারাজের আয়ু কিছু কম ৮০ বৎসর। পঞ্চমস্থ গুরু মহারাজকে প্রতিভা, কর্মের বিকাশ, জ্ঞানের পূর্ণতা, সৎ গুরু, আশ্রম, লোকসেবা, গুরুনিষ্ঠা, সরলতা, শিষ্য বাৎসল্য প্রভৃতি মহৎ গুণগুলি দিয়াছেন। ষট্ রিপুর সাধনায় জয়ী, মনে, জ্ঞানে, কর্মে ও চরিত্রে মহান্ করিয়াছে। লগ্নে আত্মকারক রবি গুরু দৃষ্ট হওয়ায় রবি মহারাজকে প্রজ্ঞালোকে অন্তর্বহিঃ আলোকিত করিয়াছে,—অর্থাৎ সত্যম্ অনন্তম্ জ্ঞানম্ শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ অপাপবিদ্ধম্ সাধনায় সফল মনোরথ করিয়াছে। অষ্টমস্থ পাপগ্রহ, অষ্টম স্থানদর্শী পাপগ্রহ,—অষ্টম পতি, অষ্টম পতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত পাপগ্রহ, দ্বিতীয় এবং সপ্তম পতি, তৃতীয়, একাদশ পতি গ্রহগণ অল্প, মধ্য ও দীর্ঘায়ুভেদে মারক হয়, অর্থাৎ এই সকল ভাবস্থ ও ভাবপতির দশায় অন্তর্ধান সূচনা করে॥

—শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
জ্যোতিঃশাস্ত্রী।

সমাজের নিম্নস্তরে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, সমবেত ভদ্রমহিলাগণ এবং ভ্রাতৃবৃন্দ !

আজকের এই সভায় আমাকে বক্তৃতা করতে হবে, সেই কথা ভেবে আমি সঙ্কোচ বোধ করছি। কারণ আমি নিজে মনে করি, যার যা নিজস্ব কর্মক্ষেত্র, তার সেই সম্বন্ধেই সেখানে বলা অথবা বক্তৃতা করাই ঠিক। যে বিষয়ে যে অভিজ্ঞ অথবা বিশেষজ্ঞ নয়, সে বিষয়ে তার কোন কথা বলা মোটেই শোভা পায় না এবং এ কার্য তার পক্ষে আদৌ উচিতও নয়। কিন্তু আপনাদের দ্বারা একান্ত অনুরুদ্ধ হয়েছি বলে আজ এখানে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছি। যাঁরা এবিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাঁদেরই ভগবান বুদ্ধদেব সম্বন্ধে নানাভাবে বলা উচিত,—আমাদের কর্তব্য তাঁদের কথা শুধু আগ্রহ করে শোনা ভিন্ন আর কিছু নয়।

কয়েক বছর আগে যখন রাজবন্দীরূপে বর্মায় ছিলুম তখন সেখানকার লোকের ধর্মসম্বন্ধে বিশ্বাস ও আচার-আচরণ দেখবার সুযোগ কারাগারে বাসকালে হয়েছিল। সেই কারাগারে কয়েদীর উপর বৌদ্ধদের কী ভয়ানক প্রভাব তা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলুম। আমরা যাদের ঘৃণা করি, সর্বদা হেয় জ্ঞান করে দূরে রাখি, সেই সব চোর-ডাকাতদের মধ্যেও এমন সব গুণ দেখা যায় যে আমরা আশ্চর্য না হয়ে থাকতে পারি না। ব্রহ্মদেশের লোকের ওপর বৌদ্ধধর্মের যে কী প্রভাব তা কোনদিনই ভুলতে পারবো না। এ শুধু সংযমী-তপস্বী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা—যাদের সেখানকার ভাষায় বলে 'ফুঙি'—তারা অথবা সুশিক্ষিত ভদ্রলোকেরাই নয়, অজ্ঞ-অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেও ধর্মের আশ্চর্য প্রভাব সেখানে বর্তমান। আমি বর্মায় যে জেলে ছিলাম

সেখানে তখন যে সব কয়েদী থাকতো তারা প্রত্যেকদিন সন্ধ্যে-বেলায় উপাসনা করবার অনুমতি পেয়েছিল। যখন তারা তাদের ভাষায় ভক্তির সঙ্গে বুদ্ধদেবের স্তব-স্তুতি-প্রার্থনা উচ্চারণ করতো তখন সেখানে এমন একটা atmosphere সৃষ্টি হতো যে তা কখনও জেলখানায় পাওয়া যায় না।

সেই সব কয়েদীরা বছরে একদিন করে ছুটি পায় বুদ্ধদেবের উৎসব করবার জন্য। আমি একদিন তাদের সারাদিন ধরে বুদ্ধোৎসব দেখবার সুযোগ পাই—তাতে তাদের সমস্ত দিন ধরে বুদ্ধদেবের পূজা, আরতি, স্তব-স্তুতি—বুদ্ধদেবের জীবনের কোন কোন ঘটনা নিয়ে নাটক অভিনয়—সব আমাকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল। সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছি সেই সব কয়েদীদের দেখে—যাদের প্রাণ-দণ্ডের আদেশ হয়েছিল। বুদ্ধদেবের নামের বলে মানুষের মনে যে কী নির্ভীকতা আসে—এমন কি সে মৃত্যুকেও গ্রাহ্য করে না, এসব তাদের না দেখলে অনুভব করা যায় না। সাধারণ মানুষ হয়তো অনেক বিষয়ে নির্ভীকতা দেখাতে পারে। ওদেশে (ইউরোপে) থাকতেও দেখছি—France, Italy প্রভৃতি স্থানের অনেক সব যোদ্ধা দেশের জন্য কামানের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধ করছে—মরতে কোনমতেই ভয় পায় নি।

কিন্তু তারাই দেখেছি প্রাণদণ্ডের আদেশ পেয়ে একেবারে collapse হয়ে গেছে। কিন্তু মান্দালে জেলে দেখেছি একেবারে উল্টো ব্যাপার। সেখানে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদী বেপরোয়া মালা জপ করছে! মানুষের মনের অবস্থা তখনই টের পাওয়া যায়—যখন সে মৃত্যু বা বিপদের মুখে পড়ে। এই ভয়কে অগ্রাহ্য করা—মৃত্যু বলে মনে না করাতেই মানুষের মনের চরম অভিব্যক্তি হয়, তার অনেক নিদর্শন আছে। মানুষ ভয়কে জয় করে—অন্ততঃ করতে পারে। যে মৃত্যুকে জয় করেছে সে নিজেকেও জয় করেছে। এই মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করবার দুর্লভ গুণ এই সব কয়েদীর মধ্যেও দেখেছি।

এরা ভদ্র নয়, শিক্ষিত নয়, সাধারণ চোর, ডাকাত প্রভৃতি—যাদের আমরা অবজ্ঞা, অবহেলা করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে এরা এই অদ্ভুত সব গুণের অধিকারী, তার মূলে আছে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব।

বর্মায় থাকতে আমি সেখানকার ভদ্রলোকদেরও পরিচয় পেয়েছিলুম—অবশ্য সে রাজনৈতিক কারণে। কিন্তু তা ছাড়া আরও সুযোগ পেয়েছিলুম বৌদ্ধ ভিক্ষু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মেশবার। দেশের জনসাধারণের ওপর তাঁদের প্রভাব দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। যে দেশে সাধারণ লোকের, এমন কি চোর ডাকাতেরও এমন ধর্মবিশ্বাস, তখন সেখানকার সাধুসন্ন্যাসীদের তপস্যা, সংযম, নীতিনিষ্ঠায় যে মানুষ আশ্চর্য হবে, তা বলাই বাহুল্য।

মান্দালে জেলে আমরা যে ক'জন বাঙালী হিন্দু বন্দী সে সময় ছিলুম, সেখানে একবার দুর্গোৎসব করি। কয়েদীদের বলেছিলুম যে তারা আমাদের উৎসবে যোগ দেবে কিনা।—তারা খুব উৎসাহ নিয়ে যোগ দিলে। তারা উৎসবের প্রত্যেক কাজেই লেগে গেলো। কয়েকজন দুর্গাপ্রতিমাকে এমন সুন্দর ভাবে সাজিয়ে দিলে যে তাদের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য আমাদের সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিল।

আপনারা জানেন যে বৌদ্ধযুগ ও বৌদ্ধসভ্যতা বুদ্ধদেবকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল—সে শুধু ধর্মসাধনার দিক দিয়েই নয়—সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, দর্শনে নানাভাবে প্রতিভার আশ্চর্য প্রকাশ পেয়ে ইতিহাসে সে যুগ এখনও এক বিশেষ উন্নত স্থান অধিকার করে আছে। এই কারণে বৌদ্ধসভ্যতা ও সংস্কৃতির যুগ ভারতের গৌরবময় যুগগুলির মধ্যে অন্যতম। তারপর আর এক কথা। বৌদ্ধসভ্যতা শুধু ভারতীয় সভ্যতাই নয়,—ভারতবর্ষে জন্ম হলেও বৌদ্ধ সভ্যতা ভারতবর্ষের সীমাকে ছাড়িয়ে জগতের নানাদেশে ছড়িয়ে গেছে। বৌদ্ধসভ্যতা তাই একটা আন্তর্জাতিক সভ্যতা।

এই যে এতবড় বিরাট সভ্যতা, যা এশিয়ার বহুস্থান এমন কি,

অন্য মহাদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে,—এই এতবড় আন্তর্জাতিক সভ্যতার মূলকেন্দ্র স্বয়ং বুদ্ধদেব। ভারতবর্ষের সভ্যতা থেকে বৌদ্ধসভ্যতাকে বাদ দিলে তার অতি সামান্যই গৌরব থাকে।

দার্শনিক মতবাদের দিক দিয়ে যে অবদান তা' ছাড়া আর একটি দিক বুদ্ধদেবের মহান চরিত্রের মধ্যে আমরা দেখি। সেটি তাঁর সমস্ত মানুষ, সমস্ত জীবের প্রতি অগাধ অসীম ভালবাসা। বিশ্বপ্রেম, জীবের প্রতি করুণা, মৈত্রী,— এইটেই বুদ্ধদেবের জীবনের একটা মস্ত বড় দিক। আমার মনে হয়, এই বিরাট প্রেমের শক্তিতেই বুদ্ধদেব আজ কোটি কোটি লোকের কাছে পূজার পাত্র হয়ে আছেন। এই বিশ্বপ্রেম—সকলকে সমান ভালবাসা, যার আছে, সে মানুষ নয়—দেবতা। মানুষ যা করে তার মূলে দুই প্রবৃত্তি—হিংসা ও ভালবাসা। হিংসা দিয়ে অপরকে জয় করা যায় না—তাতে বরং আরও হিংসা বেড়ে যায়। বর্তমান ইউরোপের যে মহাযুদ্ধ চলেছে—সে হিংসার বশে সংগ্রাম। অপরদিকে আছে প্রেমের বলেই মানুষ বিশ্ববিজয়ী হয়—প্রেমের শক্তিতেই মানুষ অপরের বশীভূত হয়। প্রেমের প্রেরণায় মানুষ খুব বড়, খুব মহৎ সব কাজ করে যায়।

আমাদের ইতিহাসে যাঁরা অবতার বা মহামানব বলে পরিচিত তাঁদের মধ্যে বুদ্ধের মত চরিত্র পাওয়া দুর্লভ। কারুর কারুর কাছে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সর্বাঙ্গসুন্দর চরিত্র। কিন্তু অনেকের কাছে বুদ্ধদেবের চরিত্র যেমন মহান তেমনি অতুলনীয়। কোন ভেদ বা পার্থক্যের ভাব বুদ্ধদেবের শিক্ষায় বা কার্যে পাওয়া যায় না। তিনি সকল দেশের সকল জাতির মানুষকে সমান ভালবাসা দিয়ে কাছে টেনে এনেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে চলে যাবার পর ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিষ্ঠা না হলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যরকম হতো। বোধ হয় আমাদের দেশে পরাধীনতা আসতো না। মানুষে মানুষে ভেদ না থাকলে সেই দেশের কখনও

অধঃপতন ঘটে না—বৌদ্ধধর্ম গোড়া থেকে ভারতবর্ষে চলতে থাকলে ভারতবর্ষের এমন অবনতি হয়তো হতো না। অবশ্য চীন ও জাপানকে দেখে অনেকে এ উক্তি স্বীকার করবেন না,—কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলা যায়, বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের চেয়ে ঢের উদার। এই উদারতা, এই সকলকে ভালবাসার ভাব আজ আমাদের মধ্যে জাগানো চাই। যেখানে এই ভালবাসার ভাব—সেই জাতির মধ্যেই creative faculty বেড়ে যায়। কারণ মানুষের সমস্ত মহৎ ও অদ্ভুত কাজের মূলে আছে একমাত্র প্রেমের প্রেরণা। এই ভেদ নীতির বর্জন, জাতির সকলের সঙ্গে সমান ভ্রাতৃভাব ও ভালবাসা আমাদের মধ্যে এলে তবেই আমরা বুদ্ধদেবের প্রকৃত ভক্ত হতে পারবো। আজ তাঁর পবিত্র উৎসবের দিনে আমরা তাঁকে স্মরণ করে তাঁর উপদেশকে পালন করতে প্রাণপণ চেষ্টা করবো।*

---

* শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের উদ্যোগে কলিকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত-মঠে অনুষ্ঠিত বুদ্ধোৎসবে দেশগৌরব শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর ভাষণ।

শ্রীবুদ্ধ

ডঃ শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম. এ., পি-এইচ্. ডি.

সভার রীতি অনুসারে সভাপতির কিছু বলা উচিত। সেই জন্যে আমি মাত্র দুচার কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। রাত্রি অনেক হয়েছে —বেশী কথা বলবার সময় নেই—তাতে শ্রোতাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে —তাঁদের পক্ষে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা পীড়াদায়ক হবে।

এই সভায় এসে আপনারা পূর্ব পূর্ব বক্তাদের কাছ থেকে অনেক অনেক ভাল ভাল কথা শুনেছেন—পূর্ব পূর্ব বক্তারা ভগবান বুদ্ধদেবের ধর্মপ্রতিভা, কর্মশক্তি হৃদয়বত্তা প্রভৃতি প্রত্যেকটি গুণ সমুদ্রের ন্যায় ব্যাপক ও গভীর বলে বর্ণনা করেছেন। সাধারণ মানুষের বুদ্ধি ও ধারণাশক্তি সীমাবদ্ধ। কোন দুরূহ বিষয়ের সমগ্র অংশ গ্রহণ বা আয়ত্ত করা তার পক্ষে অসম্ভব। সেই কারণে আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, ভগবান বুদ্ধদেব প্রভৃতি মহা-পুরুষদের মহিমা অতি সামান্যই আমরা নিতে পারি। ভগবান বুদ্ধকে সমগ্রভাবে জানতে হলে ভগবান বুদ্ধ হতে হবে। আমাদের দেশে যে, "অন্ধ হস্তীন্যায়ের" কথা আছে, সে কথা এ সম্বন্ধে খুব ভাল করেই খাটে।—এ বিষয়ে মানুষ হাজার চেষ্টা করুক, সে একদেশদর্শী হবেই।

বৌদ্ধ ধর্ম যখন ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হলো—তখন তাতে যেমন ভারতের একদিক থেকে অনেক ক্ষতি হলো কিন্তু হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মের অনেক ভাল ভাল দিক হজম করে ফেলায় তার আর দিক দিয়ে তেমনি মঙ্গল হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের অনেক সব সুন্দর ভাব ভারতবর্ষের অনেক ধর্মসম্প্রদায়ে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে

মিশে গেছে। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যদি সাংখ্য, বেদান্ত অথবা জৈন দর্শনের তুলনা করা যায়, তাহলে দেখি দার্শনিক চিন্তার রাজ্যেও ভারতবর্ষ অনেক নূতন বস্তুর সন্ধান পেয়েছে। ভগবান বুদ্ধের বাণী, অনুশাসন, তাঁর তপস্যা ও সংযমের আদর্শ আজ আমাদের জাতির জীবনে মজ্জাগত হয়ে বসে গেছে— তাই থেকে আমরা সত্যলাভ করবার জন্য, মহৎ হবার জন্য নূতন নূতন প্রেরণা পাচ্ছি। ডাক্তার বড়ুয়া তাঁর বক্তৃতায় যে বললেন, এখন আমরা ভগবান বুদ্ধের আদর্শকে ভুলে গেছি, আমরা কার্যে, বাক্যে, চিন্তায় সংযম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছি—সে কথা আমি স্বীকার করি না।

আমাদের মধ্যে যে অসংযম আজ ঢুকেছে, আমাদের অনেক শত বছর ধরে পরাধীনতার ফলে; বিশেষতঃ ইংরাজ-শাসনের কালে শিক্ষা গ্রহণের পর থেকেই এই অসংযম আমাদের আরও পেয়ে বসেছে। তার কারণ—এই ইংরাজী শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ আমাদের জাতীয় ভাব ও আদর্শ থেকে একেবারে ভিন্ন ও একেবারে বিজাতীয়। এ আমাদের স্বভাবের সঙ্গে মোটেই মেলে না। এর সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের যোগ নেই—সেই কারণে ইংরেজদের যে সব ভাল গুণ আছে, সেগুলোও আমরা নিতে পারিনি।

ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সাধনার একটা বিশিষ্ট গতি,—একটা বিশিষ্ট ধারা আছে। যুগে যুগে এই দেশে অনেক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁদের আশ্চর্য আধ্যাত্মিকতা, অদ্ভুত শক্তি, অতুলনীয় পবিত্রতা। তাঁদের Prophet বলুন, Saint বলুন, মহাত্মা বলুন, মহাপুরুষ কিংবা অবতার বলুন, তাতে বড় কিছু যায় আসে না। তাঁদের আবির্ভাবেই ভারতবর্ষ এত পবিত্র স্থান,— এঁদের তপস্যা ও বিরাট আধ্যাত্মিকতাই ভারতবর্ষের গৌরব। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বহু বক্তৃতায়, বিশেষতঃ "Sages of India"-তে এই কথা খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন। এই ভারতবর্ষ এক আশ্চর্য দেশ। যখনই এখানে অধর্ম, অবিশ্বাস অথবা পাপ

ভয়ানক প্রবল হয়ে উঠেছে, তখনি এখানে এক একজন ঐশ্বরিক শক্তিমান মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়ে আবার ধর্মকে নূতন ভাবে জাগিয়ে দেশকে, জাতিকে রক্ষা করেছে। এই ভাবেই ভগবান বুদ্ধদেব একদিন এদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন,—আর এই সেদিন ভগবান রামকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে সমস্ত জগতে ধর্মের বিশুদ্ধ অসাম্প্রদায়িক রূপ নিজের জীবনে উপলব্ধি করে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। বহু শত বছর ধরে ভারতবর্ষে ধর্মসাধনার দুটি বিরাট ধারা চলে আসছে,—ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম। ভারতবর্ষের ধর্ম সাধনায় এই দুই ধারাকে নিজের জীবনে সমন্বয় করে গেলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। পরমহংসদেবের জীবন বেদান্ত ও বৌদ্ধধর্মের আশ্চর্য সমন্বয়। বুদ্ধদেবের আগে এই ভারতবর্ষে একটা অভাব ছিল সেটা সঙ্ঘজীবনের discipline অথবা ধর্মজীবন যাপনের জন্য বিধি-নিষেধের ঠিক ঠিক অভ্যাস। ভগবান বুদ্ধ এসে এই discipline-কে প্রথমে নিজের জীবনে, পরে বৌদ্ধসঙ্ঘের ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুললেন। এছাড়া এদেশে আর একটা ধর্মসাধনা তখন ছিল সেটা জৈনধর্মের কূর্মবৃত্তি। অন্য জাতি, অন্য সমাজ, কারুর সঙ্গে সাধনার ব্যাপারে সংস্রব রাখবো না,—সে সব নিজের মধ্যে সঙ্কোচ করে আটকে রেখে দেব—এই ভাব।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের সাধনায় এই সঙ্কীর্ণ ভাব এতটা ছিল না—ধর্ম সাধনায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের মত এর চেয়ে কোন কোন বিষয়ে অনেক উদার ছিল। এটা হলো ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভেতরের দিক, আর তার বাইরের দিক হলো বর্ণাশ্রম ধর্ম—সামাজিক জীবনে ভয়ানক কড়াকড়ি, নিয়ম-কানুনে চারিদিক বাঁধা। ব্রাহ্মণ্যধর্মের নেতা ছিলেন ব্রাহ্মণেরা। পৃথিবীর কোন জাতির কাছে কোন দিনই মাথা নত করবো না—এই ছিল তাঁদের মনের ভাব। এদের নির্দেশে সমস্ত হিন্দু সমাজ চলতো। হিন্দুসমাজের অপর সকল জাতই ব্রাহ্মণদের মেনে চলতো। এই যে সমাজে ব্রাহ্মণজাতির

একাধিপত্য, তা শুনে কেহ যেন না মনে করেন, সে সময় হিন্দুসমাজে শিক্ষা, জ্ঞান প্রভৃতি ছিল না—অথবা হিন্দুসমাজ কুসংস্কারে একেবারে ভরা ছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মীদের মধ্যে বিদ্যা, তপস্যা, জ্ঞান এসব বেশ ব্যাপকভাবেই ছিল—মহা মহা জ্ঞানী, বড় বড় সব তপস্বী এঁদের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু এঁদের এত পাণ্ডিত্য, জ্ঞান, তপস্যা থাকা সত্ত্বেও ছিল একটি দারুণ অভাব। সেটি হচ্ছে সকল মানুষের প্রতি সমান ভালবাসা—তাদের প্রতি সহানুভূতি—যাকে বলে বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বমানবতা। এই বিশ্বমানবতার কথা পূর্বযুগের ঋষিদের মধ্যে কারু কারুর জীবনে দেখা গেলেও তাকে বিশেষভাবে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলেছেন ভগবান বুদ্ধ। এই বিশ্বপ্রাণতা অথবা বিশ্বপ্রেমই বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা ও সাধনার খুব বড় একটা দিক—যা ভারতবর্ষকে এক নূতন গৌরব দান করেছে। মানুষের জীবনে যেটা ethical side, অর্থাৎ মৈত্রী, করুণা, বিশ্বপ্রেম—তা: ভগবান বুদ্ধদেবের মধ্য দিয়েই জগৎ পরিপূর্ণ ভাবে দেখেছে। সেই কারণে গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে এইসব গুণের বহু উল্লেখ থাকলেও অথবা বুদ্ধদেবের আগে ভারতবর্ষে বহু সাধক তা সাধনা করলেও, লোকে এই গুণগুলিকে অজ্ঞতাবশতঃ শুধু বৌদ্ধধর্মেরই নিজস্ব সম্পদ বলে মনে করে। কোনও গুণ কারুরই নিজস্ব নয়—গুণ শুধু গুনীর মধ্যে জীবন্ত হয়ে ফুঠে ওঠে।

ধর্মসাধনা, সত্যান্বেষণের তপস্যা যেমন দুঃসাধ্য তেমনি মহা গৌরবময়। সেই আদর্শ শাস্ত্রগ্রন্থে পড়ে থাকলেও তাতে মানুষের কোন উপকার হয় না—যতক্ষণ না কোন মহাপুরুষের আসাধারণ চরিত্রে তা সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট না হয়ে ওঠে ততক্ষণ তা কেউই বিশ্বাস করতে চায় না,—গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয় না। ধর্ম তখনই জীবন্ত হয়,—সত্যকে তখন আমরা দেখতে পাই যখন তা কোন আসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিমান পুরুষের ভেতর দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করে। যে জাতির মধ্যে এই রকম সব আধ্যাত্মিক

শক্তিশালী মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন তার কোনদিন ধ্বংস নেই। ভারতবর্ষ যে আজ এতকাল নানা দুঃখ, নানা কষ্ট, নানা সঙ্কট সত্ত্বেও এখনও বেঁচে আছে, তার প্রধান করাণ, সে এই আধ্যাত্মিক সাধনাকে আঁকড়ে ধরে আছে বলে। পৃথিবীতে গ্রীস, রোম, চালডীয়ান, ব্যবিলোনীয়ান, আসিরিয়ান কত সব জাতি উঠলো,—তাদের আশ্চর্য রকম সব উন্নতি অভ্যুদয় হলো,—আবার তারা কোথায় মিলিয়ে গেল। কিন্তু ভারতবর্ষ বৈদিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত হাজার হাজার বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে, বেঁচে আছে,—তার কারণ উপনিষদের ঋষিরা অথবা ভগবান বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেব, ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রভৃতির তপস্যা ও আধ্যাত্মিক শক্তি। সত্যকে যিনি জ্বলন্তভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন—তাঁর জীবন চিরনির্মল, চির উজ্জ্বল ও মহীয়ান—তাঁর বাণী সকল দেশের লোকেরাই মুক্তিলাভের পথ দেখিয়ে দেয়। ভগবান বুদ্ধ নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, বিশাল বুদ্ধি ও কঠোর তপস্যা দ্বারা সত্যকে সাক্ষাৎকার করেছিলেন। শুধু তাই নয়, বহু লোককে সেই সত্যলাভের দিকে টেনে নিয়ে গেছেন। তাঁর এই সর্বত্যাগের ভাব সকল মানুষ এমন কি সমস্ত জীবের প্রতি ভালবাসা,—নৈতিক আদর্শ—ধর্মসাধনায় কঠোরতা—সঙ্ঘজীবনের নীতি ও শৃঙ্খলা—সকল লোকের মধ্যে জ্ঞান ও শিক্ষাবিস্তার,—জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের সেবা,—এই সব ভাব খ্রীস্টান সম্প্রদায়েও মিশে গেছে। এ বিষয়ে বৌদ্ধধর্মের কাছে খ্রীস্টান ধর্ম গভীর ঋণী। একথা আজ পাশ্চাত্ত্য দেশের বহু পণ্ডিতও তাঁদের বইয়ে প্রমাণ করে দেখিয়ে গেছেন। ভগবান বুদ্ধই তাঁর শিষ্যদের অবলম্বন করে শিক্ষা দিলেন যে সন্ন্যাসীর জীবন "বহুজনহিতায়, বহুজন সুখায়,"—সকলের কল্যাণের জন্যই সন্ন্যাসীর জীবন।

এই বাংলা দেশেই ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র। এই বাংলা থেকেই দীপঙ্কর প্রভৃতি মহা মহা জ্ঞানী বৌদ্ধপ্রচারক জন্মেছিলেন,

—প্রত্যেকে এক একটা দিকপাল—এঁদের জ্ঞান, বিদ্যার ধারণা সাধারণ মানুষ করতে পারে না। এই সব বড় বড় মহাপণ্ডিত বাঙালী বৌদ্ধপ্রচারকেরা ভারতবর্ষের বাইরে একদিকে বার্মা, জাভা, সুমাত্রা, শ্যাম, সিংহল আবার অন্যদিকে তিব্বত, চীন, জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রচারের দ্বারা বাঙালী জাতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। সেইজন্য বাংলাদেশের সাধুদের ত্যাগ, তপস্যা, সংযম, জ্ঞান বিদ্যার, কথা উল্লেখ করে তিব্বতী বৌদ্ধরা তাই বলে "দেবভূমি বাঙ্গলা।" এই তিব্বতীরা এক অদ্ভুত জাত,—নিজেদের জাতির সংস্কার ভাব কিছুতেই ছাড়বে না। যতই প্রলোভন দেখান হোক এরা কিছুতেই নিজেদের আচার-ব্যবহার, ধর্মকে কিছুতেই ছাড়বে না, —এমন কি প্রাণ গেলেও।

বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম, উভয়ের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে,—একেবারে মণিকাঞ্চন সংযোগ। বাইরে থেকে অনেকেই এই দুই ধর্মকে আলাদা মনে করে,—কিন্তু আসলে হিন্দু ও বৌদ্ধ এক। উভয় ধর্মের একই শিক্ষা,—উভয় ধর্মই বলে, জগতের নশ্বরতার কথা। উভয় ধর্মেরই সিদ্ধান্ত—অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানতাই আমাদের সমস্ত দুঃখ ও বন্ধনের কারণ।

যতই আমরা বিষয় ধন ঐশ্বর্য লাভ করি, যতই মান সম্মান পাই, আমরা কিছুতেই শান্তি পাব না। সংসারের এই সব দ্বেষ-হিংসা—রাজ্যলিপ্সা, যুদ্ধবিগ্রহ, এসব আমাদের মোটেই শান্তি দেবে না—বরং নানাভাবে আমাদের আরও দুঃখ বাড়িয়ে তুলবে।

আমাদের দেশের একটি বিশেষ ধারা আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে, যিনি সত্যকে উপলব্ধি করেছেন তাঁর বাণী নানাভাবে জনসমাজে প্রবেশ করে গেছে। ভগবান বুদ্ধের বাণী ও জীবনের আদর্শ আমাদের হিন্দুধর্মের নানা অনুষ্ঠানে নানা সাধনায় আশ্চর্যভাবে মিলে গেছে। আগে আফগানিস্থান, কুর্দিস্থানে সবাই বৌদ্ধ ছিল। হিঊয়েন্থসাং-এর account (বিবরণে) এসবের উল্লেখ আছে।

কিছুদিন আগে সেখানে Archaeological Department Excavation-এর (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খননকার্য) দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গেছে। বৌদ্ধধর্মের অনেক সব মন্দির, বিহার, স্তম্ভ এশিয়া মাইনার, মেসোপটিমিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি জায়গায় ছিল। ১০১০ খ্রীস্টাব্দে Turks-রা (তুর্কীরা) সেসব ভেঙেচুরে দিয়েছে।—শুধু তার কিছু কিছু remnant (ধ্বংসাবশেষ) মাত্র এখন পাওয়া যায়। কিন্তু তরোয়ালের দ্বারা মানুষের অন্তরকে জয় করা যায় না। মানুষকে যথার্থ জয় করবার উপায় বিশ্বপ্রেম। চরিত্রের মাহাত্ম্য. ভালবাসা, সহানুভূতিতেই অপরকে জয় করা যায়—প্রেমই জগতে স্থায়ী প্রভাব রেখে যায়। মানুষ এই দেবভাবেরই বশীভূত, পশুভাব বা জোর-জবরদস্তির নয়। সেইজন্য বৌদ্ধধর্ম যে আজও জগতের লক্ষ লক্ষ লোককে মুগ্ধ করে রেখেছে তার কারণ এই বিশ্বপ্রেম, সকল জীবকে আপনার বলে ভালবাসা। বোধিসত্ত্বের আদর্শ অথবা প্রেরণা শুধু নিজের মুক্তির জন্য নয়, পরন্তু জগতের সকল লোক, সকল জীবের দুঃখ দূর করতে হবে—সকলকে আপনার মধ্যে দেখতে হবে। সকলের মুক্তির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে প্রাণপণ তপস্যা করতে হবে।

মানুষ মানুষকে ভালবাসতে পারে না কেন? সকল জীব, সকল মানুষকে আপনার করে তোলবার অন্তরায় কোথায়? অহঙ্কারই barrier (অন্তরায়)। এই অহঙ্কারের পাঁচিল আছে বলেই মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে ভেদ, ঘৃণার ভাব। এই অহঙ্কারের পাঁচিল ভেঙে দিলে সব জাতিই এক। মানুষে মানুষে এই ভেদ, এই বৈষম্য ভেঙে দিতেই বুদ্ধদেব এসেছিলেন। ব্রাহ্মণ-শূদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র এসব প্রভেদ তাঁর কাছে ছিল না—মানুষ তাঁর কাছে একমাত্র ছিল শুধু মানুষ। সেই কারণে তখনকার কালে ভগবান বুদ্ধদেবের প্রতি ব্রাহ্মণ জাতি এক দারুণ অভিযোগ এনেছিলেন। সে অভিযোগ হচ্ছে বুদ্ধদেব সকল জাতির কাছেই

ধর্মকে, সত্যকে প্রচার করেছেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বরূপতঃ কোনই ভেদ নেই, সকলেই সমান—এই ছিল বুদ্ধদেবের শিক্ষা। নিজে যদিও ক্ষত্রিয় রাজার ছেলে, তবু তাঁর মনে একটুও ভেদভাব ছিল না—মন কত উদার—কত democratic (গণতান্ত্রিক)। নিজের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিদ্বান শিষ্যদের সঙ্গে নাপিতবংশের উপালী প্রভৃতিকেও শিষ্যত্বের সমান অধিকার দিয়েছিলেন। কারণ তাঁর ভাবই ছিল সন্ন্যাসী সঙ্ঘের মধ্যে জাতিভেদ, বর্ণভেদের কোন স্থান নেই। বেদান্তের মতে শরীরটারই জাত আছে। জাতিভেদ শরীরের ধর্ম। আত্মার কোনই জাতি নেই। এ-ই হচ্ছে real democracy (প্রকৃত গণতান্ত্রিকতা)। এখনকার মত apparent democracy (লোকদেখানো গণতন্ত্র) নয়।

বৌদ্ধধর্মের অবনতি ও ভারতবর্ষ থেকে তার expulsion-এর (বিতাড়নের) পর ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভ্যুদয় হলো। সেই সময় থেকে ব্রাহ্মণদের দ্বারা বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রচারেব ফলে জাতিভেদ ভয়ানক ভাবে আবার দেখা দিলে। Conservatism (রক্ষণশীলতা) প্রবল হওয়ায় হিন্দুসমাজে মানুষে মানুষে ভেদ, ঘৃণার সৃষ্টি হলো। তাতে বহুলোক হিন্দু সমাজের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দলে দলে অন্য দলের আশ্রয় নিচ্ছিল। এই ঘৃণ্য জাতিতে—untouchability (অস্পৃশ্যতা) অনেক শ' বছর ধরে হিন্দুসমাজে চলছিল। বর্তমান যুগে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবে এই জাতিভেদ বর্ণভেদ শিথিল হয়ে যাচ্ছে—মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসার ভাব আবার দেখা দিয়েছে। ভগবান বুদ্ধের বিশ্বপ্রেম, সর্বত্যাগ, সেবাধর্ম, এইসব ভাব রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনা ও শক্তিতে আবার revived (পুনরুজ্জীবিত) হয়ে দেখা দিয়েছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন থেকেই আমরা শিক্ষা পেয়েছি যে মূলতঃ হিন্দু ও বৌদ্ধতে কোন প্রভেদ নেই—সামাজিক ব্যাপারেই জাতিভেদ—আসলে হিন্দু ও বৌদ্ধ সবই এক।

সেইজন্য এখন যে হিন্দুসভার দেওয়া "হিন্দু" নামের definition (সংজ্ঞা), তাতে কোন জবরদস্তি নেই। একথা আমার বিশেষ ভাবে দেখেছি তিব্বতী বৌদ্ধদের সঙ্গে মিশে। তাদের ধর্মের সঙ্গে আমাদের ধর্মের আসলে কোনই তফাৎ নেই। এই সত্যই তখন প্রমাণ হবে, যখন আমরা অহঙ্কারের পাঁচিল ভেঙে দেবো, যখন হিন্দুরা জগতের অন্য সব জাতির সঙ্গে প্রেমের দ্বারা এক হয়ে যাবে। যেদিন এই অহঙ্কারের পাঁচিল ভেঙে যাবে সেদিন আর দেশগত, জাতিগত ভেদ থাকবে না। ভারতবর্ষের অধিবাসী আমরা আবার নূতন করে বৃহত্তর ভারত রচনা আরম্ভ করবো। আর এই বিশ্বপ্রেম, এই মানুষ মাত্রেরই সঙ্গে একাত্মতা জীবনে পরিণত করতে পারলেই ভগবান বুদ্ধদেবের প্রতি আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধা করা হবে।*

---

* শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের উদ্যোগে কলিকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত অনুষ্ঠিত ডঃ শ্রীযুত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ।

ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু

ওঁ অসতো মা সদগময় ।

তমসো মা জ্যোতির্গময় ॥

মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় ।।।

যেমন শুনিয়াছি (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ)

—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

প্রকাশক : শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়

বেলানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম,

পোঃ অভয়নগর, জিলা—হাওড়া

সমালোচনা

(১)

···গুরুদেবকে (শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ) যেমন তিনি (স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ) দেখেছেন, বিশেষ করে তাঁর মুখনিঃসৃত কথা যেমন শুনেছেন, সে সবই নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখে রাখেন। বইখানা যাঁরা পড়বেন, তাঁরা তাঁদের সামনে যেন রামকৃষ্ণদেবের কৃপাধন্য ওই মহাসাধকের (বিবেকানন্দ যাঁকে বলতেন "কালী তপস্বী") উপস্থিতি অনুভব করবেন।···অনেক কথাই আমাদের জানা, শোনা। তবু, গুরু-শিষ্যের সহজ আলাপে সে-সব নতুন করে এখানে শুনতে ভাল লাগে। গিরিশচন্দ্রের জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ এই গ্রন্থে আছে, যা ইতিপূর্বে সম্ভবত আর কোথাও বর্ণিত হয়নি।

কথার রেখা ও রঙে অভেদানন্দের একটি অকৃত্রিম চিত্র এখানে উপস্থাপিত। লেখকের আশ্রয় প্রধানত তাঁর গুরুদেবেরই ভাষা। বলা যায়, এ গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। আর সেই গঙ্গা যে অন্তহীন মহাসাগরে লীন, তাঁর নাম রামকৃষ্ণ

(২)

…স্বামী অভেদানন্দের মুখ-নিঃসৃত উপদেশাবলী "যেমন শুনিয়াছি" গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। এক অর্থে এই গ্রন্থের মূল্য অনেক বেশী।……স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ষোল বৎসর কাল সেই মহান্ পুরুষের নিবিড় সঙ্গ লাভ করেছিলেন, সেই সময় তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী ও উপদেশগুলি সযত্নে সংরক্ষণ করেছিলেন—…

এই গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্পর্কেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা শোনা যাবে; এ ছাড়া ভগবদ্-তত্ত্ব জিজ্ঞাসু বা ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তিদের পক্ষে গ্রন্থখানি পরম মূল্যবানই হবে। এর বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

(৩)

…১৯২৩-২৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত স্বামীজি মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি স্থাপন করে এবং ১৯২৯-৩৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উক্ত স্থানসমূহে যে সব আলোচনা ও উপদেশাদি দান করেছিলেন সেবক-শিষ্যরূপে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ স্বামীজি মহারাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থাকার সুযোগ লাভ করে যে-সব আলোচনাদি এবং ব্যক্তিগত প্রশ্নের কিছু কিছু উত্তর যা লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন আলোচ্য "যেমন শুনিয়াছি" তাহাই বর্তমানে পুস্তকাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত।…‥"যেমন শুনিয়াছি" পাঠকালে স্বামীজি মহারাজের বলার সেই অপূর্ব ভঙ্গিটি স্বতঃই প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। বহু গ্রন্থ সংকলনের সময় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লেখকদের স্বকীয়ভাব ও চিন্তাধারার সহিত সংকলিত বিষয় বস্তুর সংমিশ্রণ ঘটার ফলে প্রকৃত বক্তার বক্তব্য, ভাষার ছন্দ ও রূপ যায় পরিবর্তিত হয়ে।

আলোচ্য "যেমন শুনিয়াছি" গ্রন্থের সংকলক সে দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত থাকায় পুস্তকখানি স্বামী অভেদানন্দজীর বাণী ও উপদেশের যথার্থ প্রতিফলনরূপেই আমরা পেয়েছি।

কেমন করে ভগবৎ চেতনা লাভ করা যায়, কী তপস্যায় প্রসন্ন হন তিনি এবং কী সম্পদের অধিকারী হয় মানুষ তাঁকে লাভ করে, এসব ইঙ্গিত পুনঃ পুনঃ তিনি যা প্রশ্নোত্তর ছলে ও আলোচনা প্রসঙ্গে দিয়ে গেছেন সেগুলি যথাযথ লিপিবদ্ধ করে লেখক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ সকলের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন।...... উত্তম প্রচ্ছদে শোভিত "যেমন শুনিয়াছি" বহুল প্রচার ও সমাদর লাভ করবে সন্দেহ নাই।......

(৪)

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ তাঁহার গুরুদেব স্বামী অভেদানন্দ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া সুন্দরভাবে "যেমন শুনিয়াছি" পুস্তকে সঙ্কলন করিয়াছেন তাহা পাঠকমাত্রেরই আনন্দবর্দ্ধক এবং অধ্যাত্মজ্ঞানদায়ক।...আশৈশব কালী তপস্বী কি ভাবে ঘটনাপ্রবাহে সৎসঙ্গ লাভ করিয়া ও অবতার পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপাধন্য হইয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত অধ্যাত্ম প্রতিভার স্ফুরণে অভেদানন্দে পরিণত হইয়াছিলেন তাহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং অভিব্যক্তি সুনিপুণভাবে ত্যাগী ব্রহ্মচারী গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।... স্বামী অভেদানন্দ সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রাথমিক তথ্য তাহা এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে এবং পাঠকের উপলব্ধি হইবে যে, তিনি পাশ্চাত্ত্য জাতির হৃদয় কতটা অধিকার করিয়াছিলেন ও তাঁহার অবদান কত শ্রেষ্ঠ।

(৫)

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় পরিকর শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ। ...স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় সুহৃৎ, দেশবিদেশে বেদান্ত প্রচারে স্বামীজীর প্রধান সহায়।...তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী। গুরুবাক্য পরম ভাবভক্তি দিয়ে সংকলন করেছেন। সাধন সাগরের অনেকগুলি রত্ন তুলেছেন ডুবুরী।...এই রত্নরাজির কান্তিতে আকৃষ্ট হয়ে সেই সাগরে দুটি একটি ডুব দেবার আকুতিও যদি আমাদের জাগে, তাহলে আমরা ধন্য হয়ে যেতে পারি। সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণেব সমন্বয়ের মহাবাণী সাক্ষাৎ শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে নতুন রূপ নিয়ে এই গ্রন্থে ঘুরে ঘুবে এসেছে। বেদান্তীর কণ্ঠে ভক্তির সুর মধুর হয়ে বেজেছে।...

(৬)

"যেমন শুনিয়াছি"—সংকলক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, বইখানা খুব সুন্দর হয়েছে। এরূপ বই পড়ে সবাই আনন্দ পাবে। আশ্রমের বহু লোকই বইখানা পড়েছে। সকলেই বলে,—এরূপ বই খুবই কম দেখা যায়।

(৭)

শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ সঙ্কলিত "যেমন শুনিয়াছি" বইখানি পড়িলাম। খুব ভাল হইয়াছে। অতি চমৎকার! চমৎকার! চমৎকার হইয়াছে—অপূর্ব।

(৮)

…আপনার (স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ) লেখা "যেমন শুনিয়াছি" বইখানি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। আমি সকলকেই বলিতেছি।…

(৯)

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের "যেমন শুনিয়াছি" পড়লাম। খুব ভাল বই হয়েছে।

(১০)

…আপনার (স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ) "যেমন শুনিয়াছি" গ্রন্থ পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত মানবাত্মাকে যুগে যুগে পথের নিশানা দেখিয়ে দেবে—শুধু ধর্মজীবনে নয়, ব্যক্তিজীবনে এবং সমাজ জীবনেও। —এর মূল্যের পরিমাপ করা যায় না, প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায় না।…

আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে আপনার গুরুদেবের বাণী লিপিবদ্ধ করার বিশ্বস্ততা। তাঁর কথাগুলি এমন যথাযথভাবে আপনি আমাদের শুনিয়েছেন যে, গ্রন্থের রচনার মধ্যে সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর পরম সুন্দর মহাযোগীর স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি আমি দেখতে পাই। সার্থক আপনার গ্রন্থের নাম। জীবন সম্পর্কে অসংখ্য প্রশ্নের অসংখ্য উত্তর আমি আপনার গ্রন্থে খুঁজে পেয়েছি। আপনি যেন গণ্ডুষের মধ্যে মহাসমুদ্রকে ধরে রেখেছেন। এই বইখানি আমার নিত্যসঙ্গী হয়ে রইল।

(১১)

…ঠিক এই বইটিরই (স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ সংকলিত "যেমন শুনিয়াছি") একান্ত প্রয়োজন ছিল আমাদের। সেইজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার শ্রীহস্তে এমনভাবে জীবন্ত প্রকট হইয়া রহিলেন। বড় আনন্দ পাইয়াছি মনের ব্যথিত, বেদনাতুর অবস্থায়। শ্রীশ্রীঠাকুরে কথা কত ভাবে লেখা হইয়াছে এবং হইতেছে, আরও হইবে। স্বামীজী মহারাজের কথাগুলি একান্ত স্বতন্ত্র, সুন্দর, মৌলিকতা সুস্পষ্ট। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীগুলি যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—তাহাও স্বতন্ত্র। এত উদার মহান্ ব্যাখ্যা আর যেন হইতে পারে না।

অত্রেয়ী মজুমদার
কলিকাতা।

(১২)

"যেমন শুনিয়াছি" নামক বইটি পড়ে প্রভূত আনন্দ পেয়েছি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে রিরাংসাপূর্ণ কাহিনীর ধারাপ্রবাহ চলেছে, আপনার বইটি তার অতি সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে আজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাণী একমাত্র আমাদের ভরসা। বইটিতে আপনি এমন অনেক বিষয়ে আলোকপাত করেছেন যা আমি ইতিপূর্বে ভালোভাবে বুঝতে পারিনি। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে আবার নতুন করে ফিরে পেলাম আপনার বইটিতে। ´কি ভালোই না লেগেছে আপনার বইটি—তা কি বলবো! এক কথায় অপূর্ব! জ্ঞান ও বিশ্বাস, যুক্তি ও ভক্তি, সাধনা ও করুণা—এ সবের অভেদজ্ঞান লাভ করবার একমাত্র উপায় হোল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী এবং তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদের বাণী ও ব্যাখ্যা। সেইদিক থেকে আপনার বইটি একটি অমূল্য সংযোজন। ইতি—

অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
দয়ানন্দ বেদিক কলেজ, ওরাই।
(ইউ. পি.)

পাঠশুদ্ধি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হইবে
৪৩	১৬	সর্ব	রত্ন
৬০	২৭	সিংগুণে	সিংহগণে
৮৬	১১	সম্বুচৈন্যকে	সম্বুদ্ধচৈতন্যকে
১২৮	১৬	একট	একটি
১৩৮	৩	সঞ্চাবিত	সঞ্চারিত
১৫৪	৬	দেবাদেবী	দেবদেবী
১৬৮	২৭	স্বর্ণসিংহাস	স্বর্ণসিংহাসন
১৬৮	১০	Polonunua	Polonurua
১৬৮	১৯	”	”
১৬৯	১৫	Polonarua	”
১৯৪	১৪	জলশূন্য	জনশূন্য
২৩৪	২	তৎপাতিষ্ঠিত	তৎপ্রতিষ্ঠিত
২৮৫	১৫	যায	আয
২৯৭	১৩	কর্মাগু	কর্মান্ত
২৯৭	২১	কর্মাগু	”
২৯৮	৬	কর্মাগু	”
৩০১	১২	মায়ের	মারের
৩১২	১৭	চান্দমায়	চন্দ্রিমায়
৩২৭	১৭	পাপমবন্দ্যাসি	পাপমবাঙ্গ্যাসি
৩২৪	২৪	Frym	From
৩৪০	২৩	কিম	কিমু
VI	৯	অত্রেয়ী	আত্রেয়ী